আমাদের জাতীয় শিক্ষা

শ্রীচারুচন্দ্র ভাণ্ডারী

আমাদের জাতীয় শিক্ষা

শ্রীচারুচন্দ্র ভাণ্ডারী

সর্বসেবা সংঘ প্রকাশন
॥ সর্বোদয় প্রকাশন সমিতি ॥
কলিকাতা

প্রকাশক ঃ
পরমেশ বসু
সর্বোদয় প্রকাশন সমিতি
সি-৫২ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা ১২

प्रकाशक :
परमेश वसु
सर्वोदय प्रकाशन समिति
सि-५२ कलेज स्ट्रीट मार्केट
कलिकाता १२

প্রথম সংস্করণ ঃ
এপ্রিল, ১৯৬২—৩,৩০০

प्रथम संस्करण :
अप्रैल, १९६२-३३००

মূল্য ঃ
চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

मूल्य :
चार रुपये पचास नये पैसे

মুদ্রক ঃ
শ্রীঅজিতকুমার বসু
শক্তি প্রেস
২৭-৩বি হরি ঘোষ ষ্ট্রীট
কলিকাতা ৬

आमादेर जातीय शिक्षा
श्रीचारुचन्द्र भंडारी

ভূমিকা

পরিচিত বন্ধুগণের হাতে এই পুস্তকখানি পড়িলে তাঁহাদের মনে এই প্রশ্ন জাগিতে পারে যে আমার এই পুস্তক লিখিবার কি অধিকার আছে। শিক্ষা-বিচার সম্বন্ধে কোন শাস্ত্রীয় পুস্তক রচনা করিতে অধিকারী অনধিকারীর প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক। আমার সম্পর্কে এই প্রশ্ন তো উঠিবেই, কারণ আমি শিক্ষক নহি অথবা যাহাকে শিক্ষাবিদ বলা হয় তাহাও নহি।

শিক্ষক বা শিক্ষাবিদ না হইলেও আমি একজন শিক্ষা অনুরাগী এবং নয়ী তালীমের প্রতি তো আমি বিশেষ অনুরাগী। রচনাত্মক কর্মীরূপে আমি গোড়া হইতেই নয়ী তালীমের উদ্ভব ও বিকাশ আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। নয়ী তালীম সম্পর্কে যে কোন সাহিত্য সহজভাবে পাইয়াছি তাহা আমি আগ্রহের সহিত অধ্যয়ন করিয়া আসিয়াছি। বাংলার দুর্ভিক্ষের পূর্বে বাংলায় নয়ী তালীমের কাজ আরম্ভ হয় নাই। দুর্ভিক্ষের পরিণাম স্বরূপ যখন হাজার হাজার অনাথ অসহায় শিশুদের লালন-পালন করিবার সমস্যা দেখা দিল, তখন ঐ সব শিশুদের রাখিবার জন্য যে সব শিশু-সদন নিখিল ভারত মহিলা সমিতি কর্তৃক প্রতিষ্ঠা করা হয়, সেগুলিকে নয়ী তালীমের ভিত্তিতে পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত করা হয়। ঐ জন্য ঐ সময়ে (১৯৪৪) ঝাড়গ্রামে নয়ী তালীম শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। আমাদের 'খাদি মন্দিরে'র বিভিন্ন আশ্রমে ও উহার আশপাশে খাদি মন্দিরের পরিচালনায় কয়েকটি হরিজন বিদ্যালয় চলিতেছে। একটি বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষককে ঝাড়গ্রামে পাঠাইয়া শিক্ষণ দেওয়া হয়। এবং আমাদের একটি হরিজন বিদ্যালয়ে বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তন করা হয়। অতঃপর ১৯৪৬ সালে আমাদের ঐ সব হরিজন বিদ্যালয়ের আরও তিনজন শিক্ষককে শিক্ষণ লইবার জন্য সেবাগ্রামে পাঠানো হয়। দুইটি হরিজন বিদ্যালয়কে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পরিণত করা হয়। তখন আমার পা দুই নৌকায় ছিল অর্থাৎ আমি গঠন কাজের সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতিতেও অংশ গ্রহণ করিতাম। ফলে অনন্যনিষ্ঠা না থাকিলে যাহা হয় তাহাই হইল। বুনিয়াদী স্কুল দুইটি ভালভাবে চালানো হইল না। বর্তমানের বিকট পরিস্থিতিতে ছেলেমেয়েরা নয়ী

তালীমের শিক্ষা না পাইলে তাহাদের কি অবস্থা হইতে পারে তাহা সন্তানের জনক হিসাবে আমি তিক্তভাবে অনুভব করিতেছি।

প্রায় দুই বৎসর পূর্বে এক বন্ধু নয়ী তালীম সম্পর্কে সব বিষয় ভালভাবে জানিতে ও বুঝিতে পারা যায় এমন একখানি পুস্তক আমার কাছে চাহিয়াছিলেন। সব বিষয় একই পুস্তকে সংক্ষেপে পাওয়া যায় এরূপ কোন পুস্তক বাংলা বা ইংরেজী ভাষায় আছে কিনা আমার জানা না থাকায় আমি তখন তাঁহাকে কোন সাহায্য করিতে পারি নাই। তখন হইতে ঐরূপ একখানি পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা আমি অনুভব করিতে থাকি। কিন্তু এরূপ পুস্তক কে লিখিবেন? মনে দুঃসাহস আসিল। ভাবিলাম, আমিই লিখিবার চেষ্টা করি না কেন? ঠিক ঐ সময়ে অখিল ভারত সর্ব-সেবা সংঘ প্রকাশনের সুযোগ্য পরিচালক শ্রীরাধাকৃষ্ণ বাজাজ এইরূপ একটি পুস্তকের কথা তুলেন ও আমাকে উহা লিখিতে অনুরোধ করেন।

এরূপে আমার দ্বারা এই পুস্তক লেখা আরম্ভ হয়। কিন্তু পুস্তক লিখিবার জন্য যেরূপ ব্যাপক ও গভীর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন তাহা আমার ছিল না। ভাবিলাম, পড়াশুনা করি ও সঙ্গে সঙ্গে লিখি। তাহাতে শেখাও হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে লেখাও হইবে। আর সঠিকভাবে শিখিতে হইলে লেখারও প্রয়োজন। বেকন্ বলিয়াছেন, 'রিডিং মেক্স্ এ ফুল ম্যান্ এণ্ড রাইটিং মেকস্ হিম্ একৃজ্যাক্ট' অর্থাৎ অধ্যয়ন মানুষকে পূর্ণ মানুষ করে এবং লিখন তাহাকে সঠিক করিয়া তোলে। ইহাতে আরও একটা কাজ হইয়াছে। নয়ী তালীমের পদ্ধতি 'সমবায় পদ্ধতি'। উহাতে কর্মের প্রক্রিয়া ও জ্ঞানের প্রক্রিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলে। আমার এই পুস্তক প্রণয়নের ব্যাপারও 'সমবায়' পদ্ধতিতে চলিয়াছে। শেখা ও লেখা, অধ্যয়ন ও পুস্তক লিখন অঙ্গাঙ্গীভাবে চলিয়াছে। আমার অধ্যয়ন পুস্তক প্রণয়নের অঙ্গস্বরূপ ও পুস্তক লিখন স্বাধ্যায়ের অঙ্গ স্বরূপ হইয়া চলিয়াছে।

পুস্তকখানিতে যাহা আছে তাহার অধিকাংশ আহরণ করা জ্ঞান। উহার মধ্যে যেটুকু আমি হজম করিয়া লিখিয়াছি তাহা হয়ত পাঠকবর্গের ভাল লাগিতে পারে। কতটুকু হজম আর কতটুকু বদহজম তাহা পাঠক-বর্গের বিচার্য।

পুস্তকখানি শিক্ষা-পণ্ডিতগণের হাতে দিবার জন্য লেখা হয় নাই। যাঁহারা নূতন জানিতে ও বুঝিতে চাহেন তাঁহাদের জন্য লেখা হইয়াছে। ইহা তাঁহাদের কিছু কাজে আসিলে আমার শ্রম সার্থক হইবে।

শিক্ষা ও নয়ী তালীম সম্পর্কে যাহা কিছু গ্রন্থ, কার্য বিবরণী, অধ্যয়ন-মণ্ডলীর কার্যবিবরণী ইত্যাদি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তৎসমস্ত হইতে আমি যথাসাধ্য লইবার চেষ্টা করিয়াছি। ঐ সব গ্রন্থ ও কার্যবিবরণী ইত্যাদির গ্রন্থকার ও প্রকাশকগণের নিকট এজন্য আমি ঋণী।

শ্রীযুক্তা আশাদেবী আর্যনায়কম পুস্তকের পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত পাঠ করেন ও পুস্তকের উন্নতি সাধনের জন্য কতিপয় প্রয়োজনীয় সঙ্কেত দেন। তদনুসারে ৪টি নূতন অধ্যায় যোগ করা হইয়াছে এবং উহার কয়েকটি স্থানে সংশোধন করা হইয়াছে। সর্বোদয় প্রকাশন সমিতির সভাপতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুধীর চন্দ্র লাহা পুস্তকের পাণ্ডুলিপি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করিয়া উহার কয়েকস্থানে ভাষার যে ভুল ছিল তাহা সংশোধন করিয়া দেন এবং যে যে স্থানে কিছু অস্পষ্টতা বা অসঙ্গতি লক্ষ্য করেন তাহা দেখাইয়া দেন। এজন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। আমার প্রিয় সহকর্মী দীনেশ ভাই (শ্রীদীনেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়) অত্যন্ত নিষ্ঠা ও প্রেমের সহিত অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

খাদি মন্দির
ডায়মণ্ড হারবার
২৪ পরগণা

চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী

প্রকাশকের নিবেদন

'আমাদের জাতীয় শিক্ষা' লেখা হইয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সর্বসেবা সংঘ প্রকাশন (রাজঘাট, কাশী) উহার মূল বাংলা পাণ্ডুলিপি হইতে হিন্দী অনুবাদ প্রস্তুত করাইয়া তাহা ১৯৬০ সালের ডিসেম্বর মাসে পুস্তকরূপে প্রকাশ করেন। পূজ্য বিনোবাজী উহার একটি ভূমিকা লিখিয়া দেন।

'হমারা রাষ্ট্রীয় শিক্ষণ' (আমাদের জাতীয় শিক্ষার হিঃ সঃ) প্রথম মুদ্রণে ৩-হাজার কপি ছাপা হয়। পুস্তকখানি হিন্দী পাঠকগণের কাছে বিশেষভাবে সমাদৃত হয় এবং ৪-৫ মাসের মধ্যেই উহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণে ১০-হাজার কপি ছাপা হয়।

'হমারা রাষ্ট্রীয় শিক্ষণ' পুস্তকখানি বাংলাদেশের বাহিরে হিন্দীভাষাভাষী অঞ্চলে কিভাবে গৃহীত হইয়াছে তাহা মধ্যপ্রদেশের খান্দোয়া এস. এন. কলেজের হিন্দী সাহিত্য বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীকান্ত জোশী ইন্দোর আকাশবাণী কেন্দ্রে এই পুস্তক সম্পর্কে যে আলোচনা করিয়াছেন (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) তাহা হইতে কিছু বুঝা যাইতে পারে।

মূল (বাংলা) গ্রন্থখানি একাধিক কারণে এযাবৎ প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। যে সামর্থ্য থাকিলে পুস্তক প্রকাশনের মতো গুরুদায়ীত্ব যথাযথভাবে পালন করা যায়, আমাদের মধ্যে তাহার একান্ত অভাব রহিয়াছে। যাহা হউক, এইরূপ নানা বাধা থাকা সত্ত্বেও উহা এক্ষণে প্রকাশিত হইল।

এই পুস্তকের দ্বারা বাংলাদেশেও যে 'নয়ী তালীম' তথা 'জাতীয় শিক্ষা' বিষয়ক সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক বিশেষ অভাব দূর হইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইহা ছাড়া এই পুস্তক হইতে একদিকে যেমন 'নয়ী তালীম' তথা 'জাতীয় শিক্ষা' সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যাইবে, অন্যদিকে তেমন একই পুস্তকের দ্বারা পূজ্য বিনোবাজীর কথায় 'বহু গ্রন্থ পাঠের লাভ হইবে'।

সর্বশেষে, বাংলাদেশের পাঠকদের কাছেও যদি 'আমাদের জাতীয় শিক্ষা' যোগ্য সমাদর লাভ করে এবং জাতীয় শিক্ষার মূল প্রশ্নের দিকে তাঁহাদের গঠনমূলক দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, তবেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে করিব।

পরমেশ বসু

সূচীপত্র

বিহার যাত্রা
২৮-১২-'৬০

'ভূদানযজ্ঞ কি ও কেন' পুস্তকের সুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীচারুবাবুর জাতীয় শিক্ষা বিষয়ে রচিত এই পুস্তক (আমাদের জাতীয় শিক্ষা) অত্যুত্তম বিষয়বস্তুতে পরিপূর্ণ। সর্বাঙ্গীণ অভ্যাস ও সমগ্র দর্শন চারুবাবুর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। ভূদানযজ্ঞ বিষয়ক পুস্তকটির মত জাতীয় শিক্ষার এই গ্রন্থটিতেও সেই বৈশিষ্ট্যের ঝলক দেখিতে পাওয়া যায়। 'নামূলং লিখ্যতে কিঞ্চিৎ'—এরূপ গুণসম্পন্ন বর্ণন-শৈলী অবলম্বনে লিখিত বলিয়া পাঠকগণ সহজেই এই একটি-মাত্র গ্রন্থে বহু গ্রন্থপাঠের সুফল লাভ করিবেন। আশা করি, সর্বোদয়-সেবকগণ এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিবেন।

(বিনোবার জয় জগৎ)

শিক্ষার অর্থ কি ?

॥ মহাত্মা গান্ধী ॥

শিক্ষার অর্থ কি ? যদি উহার অর্থ কেবলমাত্র অক্ষর-জ্ঞান হয় তবে উহা এক অস্ত্রস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। উহার সদ্ব্যবহার করা যাইতে পারে অথবা উহার অপব্যবহারও করা যাইতে পারে। যে অস্ত্রের দ্বারা অস্ত্রোপচার করিয়া রোগীর আরোগ্য সাধন করা যায় সেই অস্ত্রের দ্বারাই অন্যের প্রাণনাশও করা যায়। অক্ষর-জ্ঞান সম্পর্কেও এই কথা খাটে। বহু লোক অক্ষর-জ্ঞানের অপব্যবহার করিয়া থাকে। এই কথা সত্য হইলে ইহা প্রমাণিত হয় যে অক্ষর-জ্ঞানের দ্বারা জগতের লাভের পরিবর্তে ক্ষতিই হইতেছে।

শিক্ষা অর্থে সাধারণত অক্ষর-জ্ঞান বুঝায়। লেখা, পড়া ও হিসাব রাখা শিক্ষা দেওয়াকে মৌলিক বা প্রাথমিক শিক্ষা বলা হয়।

এক কৃষক সততার সহিত চাষ করিয়া জীবিকা উপার্জন করিতেছে। সংসারের সাধারণ জ্ঞান তাহার আছে : মাতাপিতার সহিত কিরূপ আচরণ করা কর্তব্য, নিজের পত্নীর সহিত কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, পুত্র কন্যাদের সহিত কিভাবে থাকিতে হইবে, সে যে-গ্রামের অধিবাসী সেই গ্রামে তাহার কিভাবে থাকিতে হইবে—এই সব বিষয় সে খুব ভালভাবে জানে। সে নীতি অর্থাৎ সদাচারের নিয়ম কি তাহাও ভালভাবে বুঝে এবং তাহা পালন করিয়া থাকে। কিন্তু সে নিজের নামটি সহি করিতে পারে না।

এরূপ ব্যক্তিকে আপনারা অক্ষর-জ্ঞান শিক্ষা দিতে কেন চাহিতেছেন ? তাহাকে অক্ষরজ্ঞান শিক্ষা দিয়া তাহার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কতটুকু বৃদ্ধি সাধন করিবেন ? তাহার পর্ণকুটীরের প্রতি অথবা তাহার অবস্থার প্রতি তাহার অন্তরে অসন্তোষ সৃষ্টি করিতে চাহেন কি ? যদি তাহা করিতে হয় তবে তজ্জন্য তাহাকে লেখা-পড়া শেখানর প্রয়োজন নাই। পাশ্চাত্যের চাক-চিক্যে আমরা হতবুদ্ধি হইয়া ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছি যে লোককে

শিক্ষা দেওয়া উচিত। কিন্তু এ বিষয়ে আমরা অগ্র-পশ্চাৎ বিচার করিয়া দেখিতেছি না।

এখন উচ্চ শিক্ষার কথা ধরা যাউক। আমি ভূগোল শিক্ষা করিয়াছি। বীজগণিতও আমি শিখিয়াছি। ভূমিতির জ্ঞানও আমার হইয়াছে। ভূতত্ত্ব-বিজ্ঞানও আমি বহুবার পড়িয়াছি। কিন্তু উহাতে কি হইয়াছে? আমার কি উপকার হইয়াছে? আমার আশেপাশে যাহারা থাকে তাহাদেরই বা কি কল্যাণ উহার দ্বারা আমি করিতে পারিয়াছি? আমার নিজেরই বা কি লাভ হইয়াছে?

ইংরেজ পণ্ডিত হাক্সলে শিক্ষা সম্বন্ধে বলিয়াছেন:

"যে ব্যক্তি দেহের অনুশীলন এমনভাবে করিয়া রাখিয়াছেন যাহাতে উহা তাঁহার আয়ত্তে থাকে, এবং তাঁহাকে যে কাজ দেওয়া হয় তাহা তিনি অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পারেন, সেই ব্যক্তি প্রকৃত শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। যে ব্যক্তির বুদ্ধি শুদ্ধ, শান্ত ও ন্যায়দর্শী হইয়াছে সেই ব্যক্তিই প্রকৃত শিক্ষা পাইয়াছেন। নিয়মের বোধ যে ব্যক্তির অন্তরে ভরা, ইন্দ্রিয়সমূহ তাঁহার বশে আছে। যাঁহার অন্তরবৃত্তি পরিশুদ্ধ হইয়াছে ও যিনি নীচ আচরণকে ঘৃণা করিয়া থাকেন এবং অন্যকে আত্মবৎ জ্ঞান করেন সেই ব্যক্তিরই প্রকৃত শিক্ষা লাভ হইয়াছে। এরূপ ব্যক্তিই প্রকৃত শিক্ষা লাভ করিয়াছেন বলা যায়, কারণ তিনি প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে চলিয়া থাকেন। প্রকৃতি তাঁহার সদ্ব্যবহার করিবেন ও তিনিও প্রকৃতির সদ্ব্যবহার করিবেন।"

যদি ইহা প্রকৃত শিক্ষা হয় তবে আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি যে উপরে যে সব শাস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছি, আমার শরীর ও ইন্দ্রিয়কে বশে আনিবার জন্য আমাকে উহা ব্যবহার করিতে হয় নাই। এরূপে প্রাথমিক শিক্ষা হউক বা উচ্চ শিক্ষা হউক যদি জীবনের মুখ্য ব্যাপারে উহাদের ব্যবহার করা না হয় তবে তাহার দ্বারা আমরা প্রকৃত মনুষ্যরূপে গড়িয়া উঠিতে পারি না।

ইহাতে এরূপ মনে করা উচিত হইবে না যে, আমি সকল অবস্থায় অক্ষর-জ্ঞানের বিরোধিতা করিতে চাহিতেছি। আমি এই পর্যন্ত বলিতে চাহি যে, অক্ষর-জ্ঞানকে যেন আমরা দেবতা জ্ঞানে পূজা না করি এবং

উহা আমাদের পক্ষে কামধেনুও নহে। উহা নিজের স্থানে শোভা পাইতে পারে। অক্ষর-জ্ঞানের নিজের স্থান হইতেছে এই : যখন আমরা ইন্দ্রিয়-সমূহকে বশে আনিতে পারিব, যখন আমরা নৈতিকতার ভিত্তি দৃঢ় করিতে সক্ষম হইব তখন যদি আমাদের লেখাপড়া শিখিবার ইচ্ছা হয় তবে লেখাপড়া শিখিয়া আমরা উহার সদ্ব্যবহার করিতে সমর্থ হইব। উহা অলঙ্কারের ন্যায় ভাল লাগিতে পারে কিন্তু যদি অক্ষর-জ্ঞানের ব্যবহার অলঙ্কার স্বরূপ করা হয় তবে ঐরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা কর্তব্য মনে করিয়া করা ঠিক হইবে না। উহার জন্য আমাদের পুরাতন পাঠশালাই যথেষ্ট। তাহাতে সদাচার শিক্ষাকে প্রথম স্থান দেওয়া হইয়া থাকে। উহা প্রারম্ভিক শিক্ষা। এই বুনিয়াদের উপর যে ইমারত গড়িয়া তোলা হইবে তাহা স্থায়ী হইবে।

(হিন্দ স্বরাজ)

"আপনারা জানেন, বাপু বলিতেন যে নয়ী তালীমই এই দেশের জন্য আমার সর্বোত্তম ও সর্বশেষ দান। কোন কথার অতিশয়োক্তি করা বাপুর অভ্যাস ছিল না। যে শব্দ উচ্চারণ করা হইবে তাহা সম্পূর্ণ ওজন করিয়া বলার মানুষ বাপু ছাড়া আর কাহাকেও স্মরণ হয় না। এজন্য তিনি যেকথা বলিয়াছিলেন তাহা তাঁহার দৃষ্টিতে পরিপূর্ণ অর্থে যথার্থ ছিল।"

—বিনোবা

জাতীয় শিক্ষার ঐতিহাসিক পটভূমিকা

আদি বৈদিক যুগ

ভারতের জাতীয় শিক্ষার স্বরূপ কি হওয়া উচিত তাহা বিচার করিতে হইলে প্রাচীন ভারতে শিক্ষা কিরূপ ছিল তাহা জানা ও বুঝা একান্ত প্রয়োজন। প্রাচীন ভারতের শিক্ষার বিষয় সঠিকভাবে জানিতে ও বুঝিতে হইলে ভারতের প্রাচীন কালকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া ঐ বিষয় আলোচনা করিলে সুবিধা হয়। ঐ চারি ভাগ হইতেছে :—

(১) আদি বৈদিক যুগ (খ্রীঃ পূঃ ২০০০ বৎসরের পূর্বে),
(২) শেষ বৈদিক যুগ (খ্রীঃ পূঃ ২০০০ বৎসর হইতে খ্রীঃ পূঃ ১০০০ বৎসর পর্যন্ত),
(৩) উপনিষদ যুগ, বৌদ্ধযুগ বা সূত্রযুগ (খ্রীঃ পূঃ ১০০০ বৎসর হইতে খ্রীষ্টীয় ১ম শতাব্দী পর্যন্ত),
(৪) পুরাণের যুগ বা ভাষ্যের যুগ (খ্রীষ্টীয় ২য় শতাব্দী হইতে ১২শ শতাব্দী অর্থাৎ হিন্দু রাজত্বের শেষ পর্যন্ত)।

আদি বৈদিক যুগে কোন লিপি ছিল না। লিখন পদ্ধতি তখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রচলনও তেমন ছিল না। এজন্য হিসাব গণিতের বিশেষ প্রয়োজনও ছিল না। এই অবস্থায় বেদ কণ্ঠস্থ রাখা একমাত্র শিক্ষণীয় বিষয় ছিল। মানুষের জীবনের প্রত্যেক খুঁটিনাটি ব্যাপারে কোন-না-কোন ধর্ম আচরণের অনুষ্ঠান করিতে হইত। ধর্ম অনুষ্ঠান হিন্দুর জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল ও তাঁহাদের জীবনের সহিত উহা ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল।

উপনয়ন অনুষ্ঠানের দ্বারা ছাত্রের শিক্ষা আরম্ভ করা হইত। আজকাল উপনয়ন বলিতে মাত্র 'উপবীত' ধারণ অনুষ্ঠান বুঝায়। কিন্তু উপনয়নের এ অর্থ বা উদ্দেশ্য ছিল না। উপনয়নের মূল ও ব্যুৎপত্তি-গত অর্থ হইতেছে গুরুর নিকট উপনীত হওয়া বা উপস্থিত হওয়া

(য়্যাপ্রোচ টু দি গুরু)। তখন অনেক ক্ষেত্রে পিতাই গুরু হইতেন। উপনয়ন অনুষ্ঠানে বালক একটি 'যজ্ঞ' কাষ্ঠ লইয়া গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া নিজেকে গুরুর নিকট সমর্পণ করিত এবং গুরু আনুষ্ঠানিকভাবে তাহাকে গ্রহণ করিতেন। উহার অর্থ এই যে বালক গুরুর যজ্ঞাগ্নিকে এবং গুরুকে সেবা করিতে আগ্রহশীল। উপনয়ন যখন এই অর্থে অনুষ্ঠিত ও গৃহীত হইত তখন গুরু পরিবর্তন করিলে নূতন ভাবে উপনয়ন অনুষ্ঠান করিতে হইত। এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে বেদের নূতন ভাগের পাঠ আরম্ভ করার পূর্বে নূতন করিয়া উপনয়ন অনুষ্ঠান করা হইত। তখন উপনয়নে স্ত্রীলোকদিগেরও সমান অধিকার ছিল। সুতরাং বালিকারাও বালকদের ন্যায় উপনয়ন অনুষ্ঠানের পর বেদ শিক্ষা আরম্ভ করিত।

শেষ বৈদিক যুগ

শেষ বৈদিক যুগে বর্ণমালা ও লিখন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু লিখন প্রথমে খুব জনপ্রিয় হয় নাই। উপরন্তু আদি বৈদিক যুগে বৈদিক সংস্কৃতই কথিত ভাষা ছিল। ঐ ভাষাতেই লোকে কথা বলিত। কিন্তু কালক্রমে প্রাকৃত ভাষা সমূহের সৃষ্টি হইল এবং বৈদিক ভাষার সহিত প্রাকৃত বা কথিত ভাষার পার্থক্য ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। এইজন্য এই আশঙ্কা ছিল যে বেদ লিপিবদ্ধ করা হইলে তাহা ঠিকমত করা হইবে না এবং তাহার ফলে বেদ বিকৃত হইয়া পড়িবে। সুতরাং বেদের প্রচার ও ভাবী বংশধরগণের জন্য বেদকে অবিকৃত রূপে রক্ষা করার উপায় স্বরূপ বেদ কণ্ঠস্থ রাখার উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হইতে লাগিল।

আদি বৈদিক যুগে উপনয়ন বাধ্যতামূলক ছিল না। কিন্তু এই যুগে উপনয়ন বাধ্যতামূলক করা হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সকলেরই পক্ষে উহা 'শরীর সংস্কার' স্বরূপ গণ্য করা হইল। তাহার ফলে শিক্ষা অর্থাৎ বেদ শিক্ষা সার্বজনীন হইয়া উঠিবার পক্ষে সুবিধা হইল। ক্রমশ বর্ণমালা ও লিখন-পদ্ধতির প্রচলন হইল। তখন বেদ শিক্ষার পূর্বে লিখন, পঠন ও সরল হিসাব শিক্ষা, যাহাকে সাধারণ কথায় প্রাথমিক শিক্ষা বলা হয়, তাহার প্রচলন হইল। প্রাকৃত ভাষাসমূহেরও বিকাশ হইতে আরম্ভ হইল। উপনয়নের পর বেদ শিক্ষা আরম্ভ হইত।

যদিও প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা এমত বিভাগ তখন ছিল না বা তখনও উহা স্পষ্ট হয় নাই, তথাপি বুঝিবার সুবিধার জন্য বলা যাইতে পারে যে তখন হইতে উপনয়ন মাধ্যমিক শিক্ষা অর্থাৎ বেদ শিক্ষা আরম্ভের অনুষ্ঠান হইল। সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভের জন্য অন্য একটি অনুষ্ঠান করা হইত। তাহা হইল 'বিদ্যারম্ভ বা অক্ষর স্বীকরণ' অনুষ্ঠান। উহা এখনকার 'হাতে খড়ি' অনুষ্ঠানের মত। এইভাবে প্রাথমিক শিক্ষার আরম্ভ হইল। উপরন্তু ঐ সময়ে জ্ঞানের বিভিন্ন দিকের সৃষ্টি ও প্রসার হইতে থাকে। শিক্ষণীয় ও পঠণীয় বিষয় বাড়িতে লাগিল। জ্যোতিষ, ফলিত জ্যোতিষ, জ্যামিতি, ছন্দ-শাস্ত্র প্রভৃতি পঠণীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হইল।

যখন হইতে উপনয়নকে বাধ্যতামূলক করা হইল তখন হইতে উহাকে শরীর সংস্কার রূপে গণ্য করা হইল। একথা উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহাতে মনে করা হইত যে যাহার উপনয়ন সংস্কার হয় নাই সে আর্যজাতি হইতে চ্যুত হইল। উহার ফলে শিক্ষা বা বেদ শিক্ষা সার্বজনীন হওয়ার সুযোগ হইল বটে কিন্তু কার্যত তাহা হয় নাই। ফলে উপনয়নের মূল উদ্দেশ্যের কথা লোকে ক্রমে ক্রমে ভুলিয়া যাইতে লাগিল।

যাহা হউক, উপনয়ন সংস্কারের পশ্চাতে মূলত যে উদ্দেশ্য ও ভাবধারা. ছিল তাহা বৈদিক যুগের ও তৎপরবর্তী কালের ছাত্রকে পবিত্র অনুপ্রেরণা দান করিয়া আসিয়াছে ও তাহার জীবনকে মহিমামণ্ডিত করিতে প্রভূত সাহায্য করিয়াছে।

আর্যগণ জীবনকে চারি আশ্রমে বিভক্ত করেন। তন্মধ্যে **ব্রহ্মচর্যাশ্রম** হইতেছে অধ্যয়ন কাল। ছাত্রকে ব্রহ্মচারী বলা হইত এবং ছাত্রও নিজেকে ব্রহ্মচারী বলিয়া মনে করিত ও সেইরূপ ভাবে জীবন যাপন করিত। ব্রহ্মচারী বা ছাত্রের পালনীয় অনুশাসন ও ব্রত নিয়মাদি প্রাচীনকালের ছাত্রগণের জীবনের যে কিরূপ পবিত্রতা সম্পাদন করিত বর্তমান যুগে তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। উপরন্তু সেই যুগে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী অর্থাৎ সারা জীবন ব্রহ্মচারী থাকিয়া অধ্যয়ন ও জ্ঞানচর্চায় জীবন উৎসর্গ করিবার আদর্শ গ্রহণ করার দৃষ্টান্তও বিরল ছিল না।

বাৎসরিক অধ্যয়নকাল (টার্ম) আরম্ভের সময় যে অনুষ্ঠান করা হইত তাহাকে 'উপকর্ম' (শ্রাবণী) ও উহার সমাপ্তিতে যে অনুষ্ঠান করা হইত

তাহাকে 'উৎসর্জন' বলা হইত। ছাত্র জীবনের সমাপ্তির যে অনুষ্ঠান করা হইত তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উহাকে 'সমাবর্তন' বলা হইত। উহা আধুনিক যুগের 'কনভোকেশন'এর পর্যায়ভুক্ত। গোড়ার দিকে যে সব ব্রহ্মচারী তাহাদের সমস্ত শিক্ষণীয় বিষয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিত, যাহারা বেদ কেবল মুখস্থ করিত এমন নয় পরন্তু উহার সম্যক ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হইত, একমাত্র তাহাদের জন্য 'সমাবর্তন' অনুষ্ঠান করা হইত।

কিন্তু কালক্রমে উপনয়নের ন্যায় এই অনুষ্ঠানকেও 'শরীর সংস্কার'রূপে গণ্য করা হইল এবং উহার মূল অর্থ ও উদ্দেশ্য বিস্মৃতির গর্ভে চলিয়া গেল। ব্রহ্মচারী অধ্যয়ন সমাপ্তির পর এক শুভ দিবসে প্রাতে গৃহের মধ্যে লুক্কায়িত থাকিতেন এবং মধ্যাহ্নে বাহির হইয়া আসিয়া মস্তক মুণ্ডনপূর্বক নব-বস্ত্র পরিধান করিতেন। তখন তাহাকে রথে বা হস্তী পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া পণ্ডিতগণের সভায় লইয়া যাওয়া হইত। অনুষ্ঠানের দিন প্রাতে গৃহের মধ্যে লুক্কায়িত থাকার অর্থ এই ছিল যে, এরূপ মনে করা হইত যে, স্নাতকের তেজের কাছে প্রাত সূর্যের তেজ মলিন বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। এজন্য সূর্যের সম্মান রক্ষার জন্য স্নাতক নিজেকে লুক্কায়িত রাখিতেন। ইহা এক হাস্যকর ব্যাপার সন্দেহ নাই। কিন্তু এই অনুষ্ঠান হইতে ধারণা করা যায় যে তখন স্নাতক সম্বন্ধে সমাজে কিরূপ উচ্চ ধারণা পোষণ করা হইত। তখনকার স্নাতক নিশ্চয় এরূপ সম্মানের যোগ্য ছিল। নচেৎ এরূপ আচার-যুক্ত উৎসবের প্রচলন হইত না। ইহা হইতে প্রাচীনকালের শিক্ষিতের যোগ্যতা ও মহত্ত্ব কিরূপ ছিল তাহা অনুমান করা যায়।

উপনিষদ যুগ

বৈদিক যুগের পর বৌদ্ধযুগে একদিকে যেমন উপনিষদ, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মগ্রন্থসমূহ, বেদান্ত, যোগশাস্ত্র, মীমাংসা, ন্যায়, পুরাণ ও ভাষ্যসমূহের সৃষ্টি হইল এবং ব্যাকরণ, ইতিহাস, কাব্য প্রভৃতিরও বিকাশ হইতে থাকিল, তেমনই অন্যদিকে স্মৃতি, চিকিৎসাশাস্ত্র, যুদ্ধবিদ্যা (ধনুর্বিদ্যা), জ্যোতিষ, ফলিত জ্যোতিষ, গণিত, হিসাব বিজ্ঞান, কৃষি, গো-প্রজনন প্রভৃতি বিবিধ বৃত্তিমূলক জ্ঞান-বিজ্ঞানেরও সৃষ্টি হইল। এজন্য উচ্চ শিক্ষার গুরুত্ব কেবলমাত্র

বেদ শিক্ষার উপর নিবদ্ধ রহিল না। তখন ব্রাহ্মণ আচার্যগণও বেদ শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তিমূলক বিদ্যাসমূহ শিক্ষা দিতেন, কারণ তখন পর্যন্ত বিভিন্ন কারিগরী বৃত্তি-গ্রহণ ও শিক্ষাদান ব্রাহ্মণগণের পক্ষে নিষিদ্ধ হয় নাই।

ঋগ্বেদের একজন ঋষির উক্তি হইতে জানা যায় যে, তিনি নিজে কবি ছিলেন। তাঁহার পিতা চিকিৎসক ছিলেন এবং তাঁহার মাতামহ রাজমিস্ত্রি ছিলেন। তখন যে সব ব্রাহ্মণ ছাত্র বিশেষভাবে বেদ শিক্ষা করিতেন তাঁহারা উহার সঙ্গে সঙ্গে এক বা একাধিক বৃত্তিমূলক বিদ্যাও শিক্ষা করিতেন। উপরন্তু যাঁহারা বিশেষভাবে বৃত্তিমূলক বিদ্যা শিক্ষা করিতে চাহিতেন তাঁহারাও বেদে এবং অন্যান্য সাধারণ বিদ্যায় একেবারে অজ্ঞ থাকিতেন না। ঐ সব বিষয়ে বুনিয়াদী জ্ঞান অর্জন করিতেন। আধ্যাত্মিক জ্ঞানকে তখন শিক্ষার বুনিয়াদ এবং অপরিহার্য অঙ্গ স্বরূপ গণ্য করা হইত।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে উপনিষদ ও বৌদ্ধযুগের শেষভাগে জাতিভেদের কঠোরতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় ব্রাহ্মণগণের পক্ষে কারিগরী বৃত্তিসমূহ নিষিদ্ধ হইল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দেখা যায় যে অনেক ব্রাহ্মণ এই নিষেধ মানিয়া চলিতেন না। এতটা ত্যাগ বরণ করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, অথবা তাঁহারা মনে করিতেন যে বেদে তাঁহাদের শিক্ষকতা বৃত্তি গ্রহণ করিবার নির্দেশ আছে। শিক্ষক বৃত্তি কেবলমাত্র বেদ শিক্ষণ কার্যে নিবদ্ধ থাকিবে এমন কোন নির্দেশ বেদে নাই। যাহা হউক এরূপ ভাবে কিছু সংখ্যক ব্রাহ্মণও বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণ ও প্রদান করিতে থাকেন।

কোন কোন ঐতিহাসিক অনুমান করেন যে তাঁহাদের সংখ্যা খুব কম ছিল না। কারণ তাঁহাদের সংখ্যা নিতান্ত কম থাকিলে তাঁহাদের সম্পর্কে স্মৃতিতে এই বিশেষ নিষেধাত্মক বিধান সন্নিবেশিত করিবার প্রয়োজন হইত না যে, যে-সব ব্রাহ্মণ বণিক, চিকিৎসক, নাবিক, অশ্ব-ও হস্তী-শিক্ষক, এবং কুকুর ও উষ্ট্র ব্যবসায়ী তাঁহাদিগকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করা যাইবে না। যাহা হউক, এরূপে একদিকে যেমন ব্রাহ্মণগণ বৃত্তিমূলক ও কারিগরী শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইলেন তেমনই অন্যদিকে অব্রাহ্মণ শ্রেণীর লোকদের বৈদিক জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ হ্রাস প্রাপ্ত হইতে লাগিল। সাধারণ শিক্ষার সহিত বৃত্তিমূলক

ও কারিগরী শিক্ষার এই বিচ্ছেদের ফলে দেশে জ্ঞান বিস্তার ও জাতীয় উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হইতে লাগিল।

যখন জাতিভেদের কঠোরতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল তখন হইতে বিভিন্ন জাতির বৃত্তি নির্দিষ্ট হইল ও ঐসব বৃত্তি পুরুষানুক্রমিক করা হইল। সেই সব ক্ষেত্রে পুত্র পিতার নিকট ঐসব বৃত্তি শিক্ষা করিত। কিন্তু কিছু কিছু বৃত্তি সম্পূর্ণভাবে বা খুব বাঁধাবাঁধি করিয়া পুরুষানুক্রমিক করা হয় নাই। সেই সব বৃত্তি শিক্ষানবীশ প্রথায় (এপ্রেন্‌টিস্ সিষ্টেম) শিক্ষা দেওয়া হইত। শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শিক্ষকের গৃহে থাকিবে এরূপ চুক্তি করা হইত। সেই সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থী শিক্ষকের গৃহ ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিত না। কারণ শিক্ষক শিক্ষার্থীর আহার ও বাসস্থানের দায়িত্ব গ্রহণ করিতেন ও নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে শিক্ষার্থী চলিয়া গেলে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর কাজের আয় হইতে বঞ্চিত হওয়াতে তাঁহার ক্ষতি হইত। পক্ষান্তরে শিক্ষক যাহা কিছু জানেন তৎসমুদয়ই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থীকে সম্পূর্ণরূপে শিখাইয়া দেওয়া তাঁহার কর্তব্য ছিল। এই বিধি ধর্মবিধি স্বরূপ গণ্য করা হইত। সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে ও গুরুর পক্ষে ইহাকে ধার্মিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করা হইত। গুরু যাহা কিছু জানেন তৎসমুদয়ই ছাত্রকে শিখাইতে হইত। কিছুই তিনি গোপন রাখিতে পারিতেন না। গুরুর প্রাধান্য বজায় রাখার জন্যও কিছু শিখাইতে বাকি রাখা পাপ কার্য বলিয়া পরিগণিত হইত।

পৌরাণিক যুগ

উপনিষদ যুগের শেষভাগ হইতে পৌরাণিক যুগের অর্ধাংশ পর্যন্ত (খ্রীঃ পূঃ ২৫০ বৎসর হইতে ৮ম খ্রীষ্টাব্দ) কিঞ্চদধিক এক হাজার বৎসর কাল ভারতে শিল্পের অভ্যুদয়ের যুগ বলা যায়। কারণ ভারতে শিল্প বিজ্ঞানের যাহা কিছু চরম উন্নতি হইয়াছিল তাহা এই সময়েই হইয়াছিল। চিকিৎসা, ভাস্কর্য, স্থপতি বিদ্যা, জাহাজ নির্মাণ, খনি বিদ্যা, ধাতুবিদ্যা প্রভৃতির প্রভূত উন্নতি এই যুগেই সাধিত হইয়াছিল। এই সব বিদ্যাও শিক্ষানবিশী প্রথায় কুশলতার সহিত শিক্ষা দেওয়া হইত। কিন্তু পরবর্তী যুগে উহার আর অধিক উন্নতি সাধিত হয় নাই। বরং উহাদের অবনতির লক্ষণ দেখা

যাইতে থাকে। একমাত্র ধাতু বিদ্যার ক্ষেত্রে উন্নতি অব্যাহত ছিল বলিয়া মনে হয়। নচেৎ ঐ সময়ে (গুপ্তরাজাদের আমলে) দিল্লীর লৌহস্তম্ভের নির্মাণ সম্ভব হইত না। ঐ সময়ে ঐসব বৃত্তি-শিক্ষার মান যে অবনত হইতে থাকে তাহার দুইটি কারণ ছিল বলিয়া মনে হয়। প্রথম হইতেছে ঐ সময়ে প্রাথমিক শিক্ষা কেবলমাত্র সমাজের উচ্চ স্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। কারণ প্রাথমিক শিক্ষায় কেবলমাত্র সংস্কৃত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রচলন করা হয়। দ্বিতীয় হইতেছে জাতিভেদের জন্য সমাজের উচ্চ স্তরের লোকেরা কারিগরী বৃত্তিকে ক্রমশ হীনচক্ষে দেখিতে থাকে। এজন্য উহাদের উন্নতি অবহেলিত হইতে থাকে।

গুরুর উপরে ছাত্রের দায়িত্ব

প্রাচীন ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থার সংগঠন কিরূপ ছিল তাহা জানা আবশ্যক। আধুনিক কালে জনসাধারণের বা সরকারের প্রতিষ্ঠিত স্কুল-কলেজ যেরূপ চলিয়া থাকে সেরূপ কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রাচীন কালে ছিল কি? যতদূর জানা যায় খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দী পর্যন্ত এরূপ কোন সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ছিল না। শিক্ষক ব্যক্তিগতভাবে নিজে বিদ্যালয় চালাইতেন এবং যত জনের শিক্ষার ভার তাঁহার পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব তত জন ছাত্র তিনি গ্রহণ করিতেন। সাধারণত একজন শিক্ষকের পক্ষে ২০ জনের অধিক ছাত্র গ্রহণ করা সম্ভব হইত না। ছাত্রেরা সাধারণত গুরুগৃহে বাস করিত। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার ছাত্রদের গুরুগৃহে বাস করিতে হইত না। তাহারা নিজ নিজ গৃহ হইতে উপাধ্যায়ের বিদ্যালয়ে পড়িতে যাইত। গুরুর পরিবারের মধ্যে ছাত্রদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা থাকিত। তক্ষশীলায়ও এই ব্যবস্থা চলিত। সেখানে 'বিশ্ববিশ্রুত' আচার্যগণ নিজ নিজ বিদ্যালয় চালাইতেন এবং নিজ নিজ গৃহে ছাত্রগণের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতেন। এজন্য তখন ছাত্রের এক নাম ছিল 'অন্তেবাসী'।

তবে তক্ষশীলায় কিছু কিছু ছাত্র ছাত্রাবাসে বাস করিত এরূপ প্রমাণও পাওয়া যায়। মাসিক বেতন বা খরচ দিয়া ছাত্রেরা পড়িবে এরূপ কোন নিয়ম তখন ছিল না। বরং কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ বেতন বা

খরচ দিবার সর্তে ছাত্র গ্রহণ করা অন্যায় বলিয়া গণ্য করা হইত। কারণ ব্রাহ্মণগণ প্রাচীন সংস্কৃতি ও সাহিত্যের রক্ষক ছিলেন। সকল যোগ্য ছাত্রকে শিক্ষা দেওয়া তাঁহারা তাঁহাদের পবিত্র কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। এজন্য কোনরূপ খরচ দিতে অসমর্থ এরূপ দরিদ্র ছাত্রকেও শিক্ষক প্রত্যাখ্যান করিতে পারিতেন না। তবে ছাত্রকে আচার্যের ঘর-সংসার ও ক্ষেতের কাজ করিতে হইত। কিন্তু এইভাবে যাহারা গুরুর গৃহস্থালী বা মাঠের কাজ করিত তাহাদের শিক্ষা তৎকারণে যাহাতে ব্যাহত না হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা হইত। ঐসব ছাত্রকে রাত্রে পড়ানো হইত।

স্থতরাং প্রাচীন এবং মধ্যযুগে দরিদ্র ছাত্র উচ্চ শিক্ষালাভের স্থযোগ হইতে বঞ্চিত হইত না। যাহারা গুরুগৃহে আহার-বাসস্থানের জন্য খরচ দিতে ও শিক্ষার জন্য দক্ষিণা দিতে পারিত তাহাদের পক্ষে গুরুগৃহে কাজ করা বাধ্যতামূলক ছিল না। তবে এরূপ প্রত্যাশা করা হইত যে ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকল ছাত্র গুরুগৃহে কিছু-না-কিছু কাজ করিবে। যতদূর জানা যায় তাহাতে বুঝা যায় যে প্রায় সকলেই কিছু-না-কিছু কাজ করিত ও কেহই কাজ করিতে হীনতা বোধ করিত না। উহাতে ধনী ও দরিদ্র ছাত্রদের মধ্যে ব্যবধানের মনোভাব স্বষ্ট হইত না। ছাত্রগণের, বিশেষত বেদ ও ধর্মশিক্ষার ছাত্রগণের পক্ষে খাদ্য ভিক্ষা করার নিয়ম ছিল। সপ্তাহে অন্তত একদিন ছাত্রগণ ভিক্ষা করিবে এরূপ প্রত্যাশা করা হইত। অনেক ক্ষেত্রে ছাত্রেরা তাহা পালন করিত। খরচ দিতে অসমর্থ দরিদ্র ছাত্রেরা অনেক ক্ষেত্রে খাদ্য ভিক্ষা করিত।

ছাত্রগণের পক্ষে এরূপ **ভিক্ষা করা গৌরবের কাজ** বলিয়া পরিগণিত হইত। ইহা ছাত্রগণের বিনয় ও নম্রতা শিক্ষার একটি প্রধান উপায় ছিল। ইহাতে ভিক্ষা দাতা ও ভিক্ষা গ্রহীতা উভয়েই গৌরব বোধ করিতেন।

ধনী দরিদ্রে অভেদ

তখন ধনীর ছেলেকে অন্যদের হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া গড়িয়া তুলিবার বিকৃত মনোভাব সমাজে ছিল না। তাই দেখা যায় যে বারাণসীতে বিশ্ববিখ্যাত আচার্যগণ থাকা সত্ত্বেও বারাণসীর রাজারা তাঁহাদের

ছেলেদিগকে তক্ষশীলায় শিক্ষার জন্য পাঠাইতেন কারণ তাঁহারা মনে করিতেন যে এইভাবে রাজপ্রাসাদের আবহাওয়া হইতে দূরে সাধারণ ছাত্রদের সঙ্গে থাকিয়া শিক্ষা লাভ করিলে তরুণ রাজপুত্রগণের অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্য বিদূরিত হইবে এবং তাহারা সংসারের রীতিনীতি ও বাস্তব অবস্থার সহিত সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হইতে পারিবে।

শিক্ষা সমাপ্ত হইবার পর এককালীন খরচ ও গুরুদক্ষিণা দেওয়া হইত। দক্ষিণার কোন পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকিত না। তবে মনে করা হইত যাহার যেরূপ সামর্থ্য তদপেক্ষা যেন কেহ কম না দেন। ধনীর নিকট হইতে বেশী আশা করা হইত এবং তদ্রূপ পাওয়াও যাইত। আবার দরিদ্রের নিকট হইতে অতি সামান্য পাওয়া যাইত। কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু মাত্র পাওয়া যাইত না। মোটের উপর এই রীতি ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের শিক্ষালাভের পক্ষে খুব হিতকর ছিল। শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রাখা ধনবানগণ তাঁহাদের নৈতিক দায়িত্ব বলিয়া মনে করিতেন। তাহার ফলে দরিদ্র ছাত্র অর্থাভাবে শিক্ষা লাভ হইতে বঞ্চিত থাকিত না। এ দেশে ব্রাহ্মণ ভোজন করান ও ব্রাহ্মণকে দান দেওয়ার যে রীতি ছিল এবং এখনও কিছু আছে তাহার মূলে ছিল সমাজের দ্বারা শিক্ষককে পোষণ করার মনোবৃত্তি। এইভাবে প্রাচীনকালের শিক্ষা অনেকাংশে জন আধারিত ছিল।

প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়

উপরে বলা হইয়াছে বহু প্রাচীনকালে ভারতে কোন সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। আচার্যগণ ছাত্র গ্রহণ করিয়া নিজে নিজে পৃথক পৃথক ভাবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতেন। তক্ষশীলা ও বারাণসীর ন্যায় বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষা কেন্দ্র সমূহেও কোন সাধারণের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষালয় ছিল না। কোন কোন স্থানে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ মিলিত হইয়া পরিষদ গঠন করিয়াছিলেন। স্নাতকত্ব লাভ করিবার পর ছাত্র তাহার পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি লাভের জন্য ঐ সব পরিষদে যাইত। কিন্তু ঐ সব পরিষদ যৌথভাবে কোন সাধারণ শিক্ষালয় স্থাপন বা পরিচালনা করিত না। পণ্ডিতগণের দ্বারা শিক্ষাদান কার্য যাহাতে ভালভাবে চলিতে পারে এজন্য

রাজারা কোন কোন স্থলে এক একটি সমগ্র গ্রাম বা অঞ্চল তাঁহাদিগকে দান করিতেন। সেখানে তাঁহারা উপনিবেশ স্থাপন করিয়া বাস করিতেন এবং পৃথক পৃথক ভাবে শিক্ষাকার্য চালাইতেন। কিন্তু সেখানেও তাঁহারা যৌথভাবে কোন সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালাইতেন না।

বৌদ্ধমঠই ভারতে প্রথম (খ্রীঃ ৪র্থ-৫ম শতাব্দীতে) সাধারণ (পাবলিক) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানরূপে গড়িয়া উঠে। অশোকের সময় হইতে বৌদ্ধ বিহারসমূহের শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে। উহারা ক্রমে ক্রমে শিক্ষা বিস্তারের কাজ গ্রহণ করে। উহাতে যে কেবল ভিক্ষু ও ধর্মাবলম্বীগণের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকিত তাহা নহে। উহারা সর্বসাধারণের শিক্ষাদানের কাজও গ্রহণ করিয়াছিল। এরূপে ক্রমশ নালন্দা, বল্লভী, বিক্রমশীলা প্রভৃতি বৌদ্ধমঠ বিশালকায় বিশ্ববিদ্যালয় রূপে গড়িয়া উঠে। নালন্দা প্রভৃতি বৌদ্ধমঠসমূহের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া ক্রমশ কোন কোন হিন্দু মন্দিরও শিক্ষার কার্য গ্রহণ করে এবং ক্রমশ ঐরূপ বহু হিন্দু মন্দিরে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। দাক্ষিণাত্যে এরূপ বহু হিন্দু মন্দির ছিল।

গুরু শিষ্যের সহজীবন

প্রাচীনকালে ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে গভীর স্নেহ ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক ছিল। শিক্ষক ছাত্রকে পুত্রবৎ মনে করিতেন এবং ছাত্র গুরুকে পিতার মত দেখিত। ছাত্র গুরুর নিকট হইতে যে কেবল জ্ঞান অর্জন করিত তাহা নহে। তাঁহার সাহচর্যে থাকিয়া ছাত্র গুরুর আদর্শে নিজের জীবন গঠন করিবার সুযোগ পাইত। তখন গুরু ছিলেন আচার্য। হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষক ও ছাত্রগণের সম্পর্ক অনুরূপ ছিল। ভগবান বুদ্ধ এই উপদেশ দিয়াছিলেন যে শিক্ষকের পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে ছাত্রের সর্বপ্রকার যত্ন লওয়া উচিত। তিনি শিক্ষকগণকে ছাত্রদের কাপড়-চোপড় গুছাইয়া দেওয়ার কথা পর্যন্ত বলিতেন। দেখা যায় যে তাঁহার এইসব উপদেশ কার্যত প্রতিপালিত হইত। এজন্য প্রত্যক্ষ অধ্যাপনার কাজ ব্যতীত ছাত্রদের সম্বন্ধে শিক্ষকের অন্য অনেক কর্তব্য থাকিত।

গুরুগৃহে বাসের প্রথা প্রচলিত থাকায় শিক্ষক ও ছাত্রের সম্পর্ক পিতাপুত্রের সম্পর্কের মত গড়িয়া উঠিবার বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল। যাহাতে ছাত্রদের

ভাল অভ্যাস গড়িয়া উঠে ও তাহাদের চরিত্র সুদৃঢ়ভাবে গঠিত হয় সেদিকে শিক্ষক বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতেন। ছাত্রদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় কোন্ জিনিষ অনুশীলন করা উচিত এবং কোন্ জিনিষ হইতে দূরে থাকা উচিত, কোন্ কোন্ বিষয় তাহাদের আগ্রহশীল হওয়া উচিত এবং কোন্ বিষয়গুলি তাহাদের অবজ্ঞা করা প্রয়োজন, তাহা শিক্ষক বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতেন এবং সেই মত ছাত্রগণকে পরিচালিত করিতেন। ছাত্রগণও শিক্ষকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিয়া, শিক্ষকের সেবা করিয়া, গৃহকার্য ও ক্ষেতের কাজ করিতে করিতে জীবনের প্রয়োজনীয় অনেক শিক্ষা লাভ করিত। বৃক্ষলতাদি হইতে ছাত্র শিক্ষালাভ করিত, কখনও বা গরু চরাইতে চরাইতেও শিক্ষালাভ করিত। এরূপ বর্ণনা উপনিষদে আছে।

প্রাচীন কালে শিক্ষার কার্যক্রমে শরীর শ্রমের বিশেষ স্থান ছিল। তাহার মধ্য দিয়া ছাত্র প্রভূত জ্ঞানলাভ করিত, তাহার স্বাস্থ্য অটুট থাকিত এবং চরিত্রও গঠিত হইত। আয়ুধ ধৌম্য উপাধ্যায়ের শিষ্য ছিলেন আরুণি। গুরু তাহাকে ক্ষেতের আল বাঁধিতে বলিলেন। কিন্তু আরুণি বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়াও আল বাঁধিতে পারিলেন না। অগত্যা তিনি তথায় শয়ন করিয়া জল-নির্গম বন্ধ করিলেন। এরূপ শ্রমের মাধ্যমেও প্রভূত শিক্ষালাভ হইত। উপরন্তু আরুণি জল নির্গম পথে শয়ন করিয়া যে কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দেন তাহা তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ, সুদামা প্রভৃতি সন্দীপন মুনির শিষ্য ছিলেন। গুরুপত্নীর আদেশে তাঁহারা কুশ ও কাষ্ঠ সংগ্রহের জন্য বনের মধ্যে যান। তখন খুব ঝড়বৃষ্টি হইতে থাকে। তাঁহারা দুইজন ঝড়বৃষ্টি সহ্য করিয়াও কুশকাষ্ঠ অন্বেষণ করিতে থাকেন। ইতিমধ্যে অন্ধকার হইয়া পড়ে। তাঁহারা ফিরিতে না পারিয়া বনের মধ্যেই থাকিতে বাধ্য হন। অধিক রাত্রিতে গুরু তাঁহাদের খোঁজ করিতে সেখানে যান এবং তাঁহাদের কর্তব্যনিষ্ঠার জন্য তাঁহারা গুরুর আশীর্বাদ লাভ করেন। এরূপ বহু দৃষ্টান্ত পুরাণাদিতে আছে।

সেকালে শিক্ষা-বিজ্ঞানের চর্চা হইত না বটে কিন্তু স্বাভাবিকভাবে শিক্ষার কিরূপ উন্নত প্রণালী গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়। এরূপে কাজের মধ্য দিয়া ছাত্র প্রানপণে জীবন শিক্ষা লাভ করিত। ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে এরূপ ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়িয়া

উঠিত বলিয়াই ছাত্র শিক্ষককে নম্রতার সহিত নানা বিষয়ে প্রশ্নাদি করিয়া বহু বিষয় জানিয়া লইতে সাহসী ও আগ্রহশীল হইত। যে সেবা করে তাহার নিকট মানুষের মন ও হৃদয় খুলিয়া যায়। এজন্য সেবা শিক্ষালাভের এক প্রকৃষ্ট উপায়। প্রাচীনকালে এইভাবে শিক্ষকের নিকট হইতে ছাত্রগণ জীবনের বহু গভীর শিক্ষা লাভ করিত। গীতায় শিক্ষা লাভ করিবার যে উপায় বর্ণিত হইয়াছে প্রাচীন ভারতের ছাত্রগণ সেই উপায়ে বহু শিক্ষা লাভ করিত। গীতায় বর্ণিত উপায় এই :—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৪।৩৪

"আচার্যগণের নিকট যাইয়া প্রণিপাতপূর্বক বিনম্রভাবে প্রশ্নাদি করিয়া ও তাঁহাদের শুশ্রূষা করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে জ্ঞানলাভ করিবে। তাঁহারা তোমার সেবা ও নম্রতায় তুষ্ট হইয়া তোমার জিজ্ঞাসা তৃপ্ত করিবেন।"

জ্ঞান পাইবার এই যে তিনটি সর্ত ইহা বর্তমান সময়ে খুবই ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। মানুষের সহিত মানুষের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক বাড়িয়া উঠিলে তবেই তাহাদের মধ্যে আদান-প্রদান প্রাণবান হইতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা বিধি সংক্রান্ত আলোচনা প্রসঙ্গে ইহা পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"শিক্ষা সম্বন্ধে একটা মহৎ সত্য আমরা শিখিয়াছিলাম। আমরা জানিয়াছিলাম যে মানুষ মানুষের কাছ হইতে শিখিতে পারে : যেমন জলের দ্বারাই জলাশয় পূর্ণ হয়, শিখার দ্বারা শিখা জ্বলিয়া উঠে, সেইরূপ প্রাণের দ্বারা প্রাণ সঞ্চারিত হইয়া থাকে। মানুষকে ছাঁটিয়া ফেলিলে সে তখন আর মানুষ থাকে না, সে তখন আপিস আদালতের বা কল কারখানার প্রয়োজনীয় সামগ্রী হইয়া উঠে; তখনি সে আর প্রাণ দিতে পারে না, কেবল পাঠ দিয়া যায়। গুরু-শিষ্যের পরিপূর্ণ আত্মীয়তার সম্বন্ধের মধ্য দিয়াই শিক্ষাকার্য সজীব দেহের শোণিতস্রোতের মত চলাচল করিতে পারে। কারণ শিশুদের পালন ও শিক্ষণের ভার পিতামাতার উপর, কিন্তু পিতামাতার সে যোগ্যতা বা সুবিধা না থাকাতেই অন্য উপযুক্ত লোকের সহায়তা অত্যাবশ্যক হইয়া উঠে। এমন অবস্থায়

গুরুকে পিতা-মাতা না হইলে চলে না। আমরা জীবনের শ্রেষ্ঠ জিনিষকে টাকা দিয়া কিনিতে বা আংশিকভাবে গ্রহণ করিতে পারি না, তাহা স্নেহ-প্রেম-ভক্তির দ্বারাই আমরা আত্মসাৎ করিতে পারি; তাহাই মনুষ্যত্বের পাকযন্ত্রের জারক রস, তাহাই জৈব সামগ্রীকে জীবনের সঙ্গে সম্মিলিত করিতে পারে। বর্তমানকালে আমাদের দেশের শিক্ষায় সেই গুরুর জীবনই সকলের চেয়ে অত্যাবশ্যক হইয়াছে।"

মুখোদ্গত পদ্ধতির গুরুত্ব

পূর্বে বলা হইয়াছে যে যখন লিখন পদ্ধতি অজ্ঞাত ছিল তখন বেদ বহুকাল যাবৎ মুখে মুখে চলিত এবং মুখে মুখে উহা শিক্ষা দেওয়া হইত। লিপি ও লিখন প্রণালী আবিষ্কৃত হওয়ার পরও বহুদিন যাবৎ বেদ লিখিত হয় নাই। খ্রীষ্টীয় ৮ম বা ৯ম শতাব্দীতে জনৈক কাশ্মীরী পণ্ডিত বেদ লিপিবদ্ধ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। বেদ গ্রন্থবদ্ধ হইবার পরও বেদ মুখে মুখে শিক্ষা দেওয়ার প্রথা পরিত্যক্ত হয় নাই। কারণ বেদ আবৃত্তিতে ঠিকমত উচ্চারণ ও স্বরের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইত। এরূপ বিশ্বাস করা হইত যে বেদ ঠিকমত উচ্চারণ ও স্বর করিয়া পাঠ না করিলে পাপ হইবে। বৌদ্ধ গ্রন্থ সমূহও এইভাবে মুখে মুখে চলিত এবং তাহা মুখে মুখে শিক্ষা দেওয়া হইত।

এজন্য প্রাচীন ভারতের বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান করার জন্য প্রথমত যে পদ্ধতি গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা হইতেছে মুখে মুখে শিক্ষা দেওয়া। আচার্য একবারে দুইটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করিতেন ও শিষ্য ঠিক সেইভাবে তাহা উচ্চারণ করিত। এরূপে এক জনের একটি স্তোত্র বা শ্লোক শেখা সমাপ্ত হইলে অন্য ছাত্রকেও তাহা ঐভাবে শিখানো হইত। এই ভাবে প্রত্যেক ছাত্রের প্রতি শিক্ষক ব্যক্তিগত মনোযোগ দিতেন। অবশ্য যখন বেদান্ত, সূত্র, ভাষ্য, ষড়দর্শন ইত্যাদির সৃষ্টি হইল এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক প্রসারিত হইল তখন কেবল এই ভাবে মুখস্থ করাইলে চলিত না। ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেওয়ার পদ্ধতি তখন গ্রহণ করা হইল।

কিন্তু শিক্ষা পদ্ধতির যতই বিস্তার হউক না কেন প্রাচীন ভারতের শিক্ষা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য বরাবর রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। সেই বৈশিষ্ট্য

এই যে, প্রত্যেক ছাত্রের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে মনোযোগ প্রদান করা ও প্রত্যেক ছাত্রের প্রয়োজন অনুসারে তাহার জন্য সময় ও শক্তি দেওয়া এবং যতক্ষণ না ছাত্র ঠিকমত শিখিতে পারে ততক্ষণ ধৈর্য ও যত্নের সহিত তাহাকে শিখাইবার চেষ্টা করা। এজন্য তখন ছাত্রদের পক্ষে অলসতার সুযোগ কম ছিল। বর্তমান যুগে ইহা খুবই প্রণিধান করিবার যোগ্য। অনেক ক্ষেত্রে উন্নত ছাত্রেরা শিক্ষকের পর্যবেক্ষণাধীনে নিম্নের ছাত্রগণকে পড়াইত এবং এই ভাবে অধ্যাপনার কাজে আচার্যকে সাহায্য করিত। ঐ সব ছাত্রের পক্ষে ইহা খুবই শিক্ষাপ্রদ হইত। ইহার দ্বারা বুদ্ধিমান ছাত্রগণ শিক্ষাদান প্রণালী শিখিবার সুযোগ পাইত এবং তাহাদের পক্ষে ইহাতে কতকটা শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজের কাজ হইত। বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমেও শিক্ষাদান চলিত। কুশল আচার্য এই পদ্ধতিতে স্বল্পমেধাবী ছাত্রদের বুদ্ধির বিকাশ করিতেন ও জ্ঞান-লাভের প্রতি তাহাদের আগ্রহ জাগ্রত করিতেন। ছাত্রদের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনায়ও উৎসাহ দেওয়া হইত। ইহাতে তাহাদের জ্ঞানের ন্যূনতার পূরণ হইত ও তাহাদের বিচার করার শক্তি বৃদ্ধি পাইত।

প্রাচীন পরীক্ষা পদ্ধতি

প্রাচীন ভারতে কোন সাময়িক বা বার্ষিক পরীক্ষা ছিল না। ছাত্র পুরাতন পাঠ ঠিকমত শিখিয়া লইয়াছে — ইহা বুঝিয়া লইয়া তবে শিক্ষক ছাত্রকে নূতন পাঠ দিতেন। সমাবর্তনের পূর্বেও কোন অন্তিম পরীক্ষা ছিল না। শিক্ষকের অভিমতের উপর ছাত্রের স্নাতকত্ব লাভ নির্ভর করিত। যদিও প্রাচীন ভারতে ছাত্রগণের পরীক্ষার ঝঞ্ঝাট ছিল না তথাপি তাহাদের ভাগ্য খুব সুখপ্রদ ছিল না। আজকাল কোন রকমে পরীক্ষায় পাশ করিয়া ডিপ্লোমা পাইলে তাহার পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠানো চলে না। তাহারা যাহা অধ্যয়ন করিয়াছে তাহা ভুলিয়া যাইলেও তাহাদিগকে উচ্চশিক্ষিত বলিয়া গণ্য করিতে কোন বাধা হয় না।

কিন্তু পুরাকালে সেরূপ হইত না। স্নাতকের পাণ্ডিত্য তাহার জীবনে যে কোন সময়ে যাচাই করিয়া লইতে পারা যাইত। আজকাল পরীক্ষায় পাশ করার পর বিদ্যা ভুলিয়া যাইলেও চলে। কিন্তু তখন বিদ্যা আজীবন

মুখাগ্রে রাখিতে হইত। কারণ যে কোন সময়ে তাহাকে বিদ্যার লড়াইয়ে আহ্বান করা যাইত। উহাকে 'শাস্ত্রার্থ' বলা হইত। তাহার ফলাফল দেখিয়া তাহার পাণ্ডিত্য কতদূর তাহা সমাজ বিচার করিত। এরূপ পাণ্ডিত্যের লড়াইয়ে যে পণ্ডিত পরাজিত হইতেন তিনি নম্রতার সহিত মানিয়া লইতেন যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাঁহার পাণ্ডিত্য কম আছে।

ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও শিক্ষার মূল উৎস ছিল সহর ও গ্রামের কোলাহলের বাহিরে নিভৃত বনাঞ্চল বা তপোবন। বেদমন্ত্র প্রথমে তপোবনেই উচ্চারিত হইয়াছিল। উপনিষদের ঋষিগণ অরণ্যে পরম তত্ত্বের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন।

ভগবান বুদ্ধ সহর ও গ্রামের বহির্দেশে পরম সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন। প্রাচীন ঋষিগণ ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণ বনাঞ্চলে বসিয়া শিষ্যগণকে শিক্ষাদান করিতেন ও ধর্মোপদেশ দিতেন। বাল্মিকী, কণ্ব, সন্দীপন প্রভৃতি প্রখ্যাত মহান আচার্যগণ বনে বাস করিতেন ও তাঁহাদের আশ্রমে প্রধানত দর্শন ও ধর্ম এবং উপরন্তু ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব, জ্যোতিষ ইত্যাদি সাধারণ বিষয়েও শিক্ষাদান করা হইত। বহু বৌদ্ধ শিক্ষক বনাঞ্চলে বাস করিয়া তথায় শিক্ষাদান করিতেন।

তথাপি দেখা যায় যে প্রাচীন ভারতে যে সব বিশাল শিক্ষাকেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছিল সে সকল কেন্দ্র অরণ্যে অবস্থিত ছিল না। তক্ষশীলা গান্ধার প্রদেশের রাজধানী ছিল। বারাণসীও সহর ছিল। নালন্দা, বিক্রমশীলা, প্রভৃতি বৌদ্ধমঠ বিশাল বিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছিল। ঐ সকল স্থানে সহর ও বন উভয়ের পরিবেশের সংমিশ্রণ ছিল। ঐগুলি ছিল শিক্ষা-উপনিবেশ।

ইহা ছাড়া যাহারা সাধারণ বা বৃত্তিমূলক শিক্ষালাভ করিত তাহারা গ্রাম বা সহরে শিক্ষকের গৃহে থাকিয়া শিক্ষালাভ করিত। শিক্ষক ও ছাত্র এবং জনসাধারণ সকলে এরূপ মনে করিতেন যে লোকালয় হইতে দূরে শিক্ষাব্যবস্থা করিতে পারিলে তবে শিক্ষার সর্বোত্তম ব্যবস্থা করা হয়। অর্থাৎ শিক্ষাদানের ক্ষেত্র সম্বন্ধে মানুষের চিত্তের টান তপোবন বা আশ্রমের দিকে ছিল। এজন্য যখন সুযোগ হইত তখনই প্রাচীন ভারতের শিক্ষকগণ ছাত্রগণকে লইয়া নিকটবর্তী বনাঞ্চলে গিয়া শিক্ষাদান

করিতেন। সপ্তদশ শতাব্দীতেও বারাণসীর শিক্ষকবর্গ এরূপ করিতেন দেখা যায়।

শিক্ষার ক্ষেত্র সম্বন্ধে ভারতীয় চিত্তের টান লোকালয় হইতে দূরে বনাঞ্চলে প্রকৃতির ক্রোড়ের দিকে যায় কেন ? রবীন্দ্রনাথের অনুপম ভাষায়—

"তপোবনই ছিল ভারতবর্ষের সভ্যতার পরম নিদর্শন ; এই বনের মধ্যে মানুষ নিখিল প্রকৃতির সঙ্গে আত্মার মিলনকেই শান্ত সমাহিতভাবে উপলব্ধি করিয়াছে। কারণ ভারতীয় মন এমন এক আশ্রম চাহে, যেখানে বিশ্বপ্রকৃতির নির্মল সৌন্দর্য এবং মানুষের চিত্তের পবিত্র সাধনা একত্র মিলিত হইয়া একটি যোগাসন রচনা করিবে। তপোবনের শিক্ষার মধ্যে ভারতীয় মন ইহা উপলব্ধি করিয়াছে যে যেখানে প্রকৃত সাধনা চলে সেখানেই প্রকৃত শিক্ষাদান সহজ হইতে পারে।" রবীন্দ্রনাথ আরও বলেন—

"এদেশে একদিন তপোবনের এইরূপ ব্যবহার ছিল। সেখানে সাধনা ও শিক্ষা একত্র মিলিত হইয়াছিল বলিয়া, পাওয়া ও দেওয়ার কাজ অতি সহজে নিয়ত অনুষ্ঠিত হইতেছিল বলিয়াই তপোবন হৃৎপিণ্ডের মত সমস্ত সমাজের মর্মস্থান অধিকার করিয়া তাহার প্রাণকে শোধন, পরিচালন ও রক্ষা করিয়াছে। বৌদ্ধ বিহারেরও এই কাজ ছিল। সেখানে পাওয়া ও দেওয়া অবিছিন্ন হইয়া বিরাজ করিয়াছিল।"

রাজাশ্রিত কিন্তু রাজনিয়ন্ত্রিত নহে

প্রাচীনকালে সরকার বিবিধ প্রকারে শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন এবং শিক্ষা বিস্তারের জন্য সাহায্য করিতেন। তাঁহারা পণ্ডিতগণের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করিতেন। যে সব স্নাতক কাজ পাইতেন না সরকার তাঁহাদের কাজের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। সরকার পণ্ডিতমণ্ডলীর জন্য এক এক সমগ্র অঞ্চল দান করিতেন ও তথায় 'অগ্রাহার' গ্রাম গড়িয়া উঠিত। নালন্দা প্রভৃতি মঠ বিশ্ববিদ্যালয় হিন্দু গুপ্ত রাজগণের অর্থানুকুল্যে গড়িয়া উঠা সম্ভব হইয়াছিল। এইভাবে সরকার তথা রাজন্যবর্গ শিক্ষা সম্বন্ধে বহুপ্রকারে সাহায্য করিলেও তাঁহারা কখনো শিক্ষা ব্যবস্থা বা শিক্ষা প্রণালী বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন না। রাজপুত্রগণ গুরুগৃহে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেন।

কিন্তু সরকার তাহাদের জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা করাইতেন না বা তাহাদের জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা হউক এরূপ প্রত্যাশাও রাখিতেন না।

প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার আর একটি উৎকর্ষ এই ছিল যে উহাতে ছাত্রের চরিত্র গঠন ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপর সমধিক গুরুত্ব অর্পণ করা হইত। ছাত্রগণের ব্রহ্মচারীর জীবন যাপন করা, গুরু গৃহে বাস, গুরু গৃহে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে শরীর শ্রমের কাজ করার অভ্যাস এবং প্রাসাদ বা কুটীরবাসী সর্বশ্রেণীর ছাত্রের একই গুরুগৃহে থাকা ও চলা ফেরার মধ্য দিয়া ছাত্রদের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব সুদৃঢ় ভিত্তিতে গড়িয়া উঠার সুযোগ হইত।

মনুর ন্যায় রক্ষনশীল স্মৃতিকারও বেদের পাণ্ডিত্য অপেক্ষা চরিত্রকে অধিকতর মর্যাদা দান করিতেন। রবীন্দ্রনাথ মানুষ হইয়া গড়িয়া উঠার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়াছেন। তিনি বলেন—

"সংসারে কেহ বণিক, কেহ বা উকীল, কেহ বা ধনী জমিদার, কেহ আর কিছু। ইঁহাদের প্রত্যেকের ঘরের রকম সকম, আবহাওয়া স্বতন্ত্র, ইঁহাদের ঘরের ছেলেরা শিশুকাল হইতে বিশেষ একটা ছাপ পাইতে থাকে।

"জীবনযাত্রার বৈচিত্র্যে মানুষের আপনি যে একটা বিশেষত্ব ঘটে তাহা অনিবার্য এবং এইরূপে এক একটা ব্যবসায়ের বিশেষ আকার প্রকার লইয়া মানুষ এক একটি কোঠায় বিভক্ত হইয়া যায়, কিন্তু বালকেরা সংসার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্বে অজ্ঞাতসারে তাহাদের অভিভাবকদের ছাঁচে তৈরী হইতে থাকা তাহাদের পক্ষে কল্যাণকর নহে।

"উদাহরণ স্বরূপ দেখা যাক ধনীর ছেলে। ধনীর ঘরে ছেলে জন্মগ্রহণ করে বটে, কিন্তু ধনীর ছেলে বলিয়া বিশেষ একটা কিছু হইয়া কেহ জন্মায় না। ধনীর ছেলে ও দরিদ্রের ছেলে কোন প্রভেদ লইয়া আসে না। জন্মের পরদিন হইতে মানুষ সেই প্রভেদ নিজের হাতে তৈয়ারী করিয়া তুলিতে থাকে।

"এমন অবস্থায় বাপ মায়ের উচিত গোড়ায় সাধারণ মনুষ্যত্ব পাকা করিয়া তাহার পরে আবশ্যক মতে ছেলেকে ধনীর সন্তান করিয়া তোলা। কিন্তু তাহা ঘটে না; সে সম্পূর্ণরূপ মানব সন্তান হইতে শিখিবার পূর্বেই ধনীর সন্তান হইয়া উঠে। ইহাতে দুর্লভ মানব জন্মের অনেকটাই তাহার

অদৃষ্টে বাদ পড়িয়া যায়, জীবন ধারণের অনেক রসাস্বাদের ক্ষমতাই তাহার বিলুপ্ত হয়।"

এই অবস্থায় প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা যে কতদূর কল্যাণকর ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়।

প্রাচীন কালে স্ত্রীশিক্ষা

অতি প্রাচীনকালে ভারতে স্ত্রীলোকগণ পুরুষদের সহিত সমানভাবে উচ্চ শিক্ষা পাইতেন। তখন বেদ অধ্যয়ন, বৈদিক যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান ও উপনয়নে তাঁহাদের পুরুষদের সহিত সমান অধিকার ছিল। কেবল নামে মাত্র অধিকার ছিল তাহা নহে। স্ত্রীলোকগণ পুরুষদের সহিত কার্যত সমানভাবে যজ্ঞাদি সম্পাদনে অংশ গ্রহণ করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই পাণ্ডিত্যের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদ সংহিতার রচয়িতাদের (মন্ত্রদৃক্) মধ্যে দুইজন মহীয়সী মহিলার নাম পাওয়া যায়।

বৈদিক যুগের পর উপনিষদ যুগেও স্ত্রীলোকগণ বৈদিক যজ্ঞাদিতে অংশ গ্রহণ করিতেন। তাঁহাদের কেবল বৈদিক শাস্ত্রের জ্ঞান ছিল এমন নহে, তাঁহারা অনেকেই গভীর দার্শনিক জ্ঞানের অধিকারিণী ছিলেন। এ সম্পর্কে যাজ্ঞ্যবল্কের পত্নী মৈত্রেয়ী, গার্গী, বচক্নবী, আত্রেয়ী, প্রভৃতির নাম উল্লেখ-যোগ্য। এমন কি পূর্ব মীমাংসার ন্যায় শুষ্ক দর্শনশাস্ত্রেও তাঁহারা প্রভূত পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন।

ভগবান বুদ্ধ স্ত্রীলোকদিগকে সন্ন্যাস ও মঠে প্রবেশের অধিকার প্রদান করায় সমাজের উচ্চশ্রেণীর মহিলাদের মধ্যে জ্ঞান ও দর্শন প্রচারের সুবিধা হয়। বহু মহিলা চিরজীবন ব্রহ্মচারিণী থাকিয়া ধর্ম ও দর্শনের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিতেন।

কিন্তু উপনিষদ যুগের শেষ ভাগ হইতে ভারতের স্ত্রীলোকদের মধ্যে শিক্ষার অবনতি আরম্ভ হয়। কারণ এই সময়ে স্ত্রীলোকদিগের উপনয়নের অধিকার সঙ্কুচিত করা হয় ও যজ্ঞে তাঁহাদের অংশ গ্রহণ আনুষ্ঠানিক মাত্র করা হয়। কালক্রমে তাঁহাদিগকে উপনয়ন ও বেদ অধ্যয়নের অধিকার হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করা হয় ও তাঁহাদিগকে শূদ্র বলিয়া গণ্য করা হয়। ইহার ফলে স্ত্রীলোকের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ক্রমশ হ্রাস পাইতে থাকে।

স্ত্রীলোকদিগের বেদ শিক্ষা ও উপনয়নের অধিকার কেন হরণ করা হয় তাহা জানা আবশ্যক। পাঞ্জাবে অনার্যগণকে নিঃশেষে নির্মূল করা হইয়াছিল বটে কিন্তু গাঙ্গেয় সমতলভূমিতে (উত্তর প্রদেশ, বিদেহ, মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ প্রভৃতি) অনার্যগণ শক্তিশালী ছিলেন। তাহাদিগকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত ও ধ্বংস করা সম্ভব হয় নাই। ফলে ঐ সব স্থানে আর্যগণকে অনার্যগণের সহিত পাশাপাশি বাস করিতে হইত। তখন আর্যগণের বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল না। ঐ সব স্থানে আর্যগণ ক্রমশ অনার্য স্ত্রীলোকগণকেও বিবাহ করিতে লাগিলেন। এই ভাবে আর্য পরিবারের অন্তঃপুরে অনার্য ভাষা চলিতে থাকিল। যজ্ঞ-কর্মাদিতে ঐসব স্ত্রীলোকের পক্ষে বেদের মন্ত্র, স্তোত্রসমূহ ঠিকমত উচ্চারণ করা সম্ভব হইত না। এজন্য বেদ ও বৈদিক কর্মাদির পবিত্রতা রক্ষা কল্পে স্ত্রীলোকদের অধিকার সঙ্কুচিত করা হইল। কিন্তু বেদ ও বৈদিক কর্মে তাঁহাদের অধিকার যত সঙ্কুচিত হইল তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার তত হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। ফলে অজ্ঞতা বৃদ্ধিহেতু তাঁহারা বৈদিক অধিকারের অধিক অযোগ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিলেন। তপাপি তখনও কিছু কিছু অভিজাত পরিবারের স্ত্রীলোকদিগকে বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া উচ্চ শিক্ষা দেওয়া হইত। কিন্তু ক্রমশ তাহাও বন্ধ হইতে লাগিল।

মুসলমান রাজত্বের পরিস্থিতিতে হিন্দু সমাজের মধ্যে সাধারণ শিক্ষা বিশেষভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়। উপরন্তু পর্দা প্রথা আরম্ভ হওয়ায় স্ত্রীলোকদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার আরও সঙ্কুচিত হয়। ইহার ফলে ১২শ শতাব্দীর শেষভাগে যে স্থলে পুরুষদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা ৩০ ছিল সেস্থলে স্ত্রীলোকদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা দাঁড়ায় শতকরা ১০ মাত্র। ইহার পরে স্ত্রীশিক্ষার আরও অবনতি হয়। দেখা গেল যে, ১৯শ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতে শতকরা ৯৯ জন স্ত্রীলোক নিরক্ষর।

ভারতের স্ত্রীশিক্ষার এই পরিণতি এক অদ্ভুত ব্যাপার। জগতের অন্যান্য সভ্যতার ইতিহাসে যত প্রাচীন কালের দিকে লক্ষ্য করা যায় স্ত্রীলোকদিগের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা তত হীন দেখা যায়। অর্থাৎ অতি প্রাচীন কালে তাহাদের অবস্থা হীনতম ছিল। আধুনিক কালেই তাঁহাদের উত্থান আরম্ভ হয়। কিন্তু ভারতে গতি উহার বিপরীত। ভারতে অতি প্রাচীনকালে

স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা সর্বদিক হইতে সমুন্নত ছিল। তৎপরে যত অর্বাচীন যুগের দিকে আসা যায় তাঁহাদের অবস্থার উত্তরোত্তর অবনতি ঘটিতেছে দেখা যায়। অবশ্য বিগত শতাব্দী হইতে এই নিম্নগতি বন্ধ হইয়াছে মনে হয়।

শিক্ষার অবনতির কারণ

প্রাচীন ও মধ্যযুগে প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা পর্যালোচনা করিলে ভারতের শিক্ষার ক্রমাবনতির প্রকৃত কারণ কি তাহা বুঝিতে পারা যায়। যখন উপনয়ন সকল দ্বিজ জাতির মধ্যে সার্বজনীনভাবে প্রচলিত ছিল তখন যাহাদের অক্ষরজ্ঞান ছিল তাহাদের সংখ্যা ছিল শতকরা ৭০ জন। তৎপরে যখন বৈশ্যগণ ও শূদ্রগণের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ চলিতে থাকার ফলে বৈশ্যগণকে শূদ্র শ্রেণীভুক্তরূপে গণ্য করা হইল এবং তাহাদিগকে উপনয়ন ও বেদশিক্ষার অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইল এবং তৎপরে যখন বহু ক্ষত্রিয় উপনয়ন ত্যাগ করিল তখন অক্ষরজ্ঞানসম্পন্নের সংখ্যা শতকরা ৫০-এ নামিয়া যায়। ইহার পর হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের যুগে যখন সংস্কৃত শিক্ষার উপর প্রভূত গুরুত্ব অর্পণ করা হইল এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাকৃত ভাষার পরিবর্তে সংস্কৃত শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইতে লাগিল, তখন তাহার ফলেও প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার কমিতে লাগিল। দ্বাদশ-শতাব্দীতে হিন্দু রাজত্বের শেষভাগে এই সংখ্যা শতকরা ৩০-এ নামিয়া যায়।

মুসলমান রাজত্বকালে মক্তব ও মাদ্রাসার মাধ্যমে মুসলমানগণের শিক্ষার সুব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু মুসলমান শাসকগণ হিন্দুদের শিক্ষার ব্যবস্থার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতেন না। তথাপি দেখা যায় উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দেশের অধিকাংশ স্থানে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। ঐতিহাসিকগণ বলেন যে সে সময়ে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে প্রতি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। বাংলা দেশেও সাধারণ লিখন, পঠন ও সরল গণিত শিক্ষার জন্য প্রতি গ্রামে বিদ্যালয় ছিল। কিন্তু গ্রামে গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিলেও সমাজের সকল শ্রেণীর লোক উহার সুযোগ গ্রহণ করিত না। ব্রাহ্মণগণ ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোকেরাই প্রধানত ঐ সুযোগ গ্রহণ করিতেন। তাহার ফলে বিদ্যালয়ে যাইবার যোগ্য বয়সের বালক-বালিকাদের মধ্যে মাত্র শতকরা ১৫ জন তখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিত।

ইহার কারণ কি? শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও লোকে কেন শিক্ষা গ্রহণ করিতে চাহিত না? যে দেশে এক সময়ে শতকরা ৭০ জন লোক শিক্ষিত ছিল এবং যে দেশে অতি প্রাচীনকালেও স্ত্রীলোকগণ জ্ঞানের উচ্চতম শিখরে আরূঢ় ছিলেন সেই দেশে এই মনোভাবের উদ্ভব কিরূপে ও কেন হইয়াছিল তাহা গভীরভাবে ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। এই দেশে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা ও উহার মান উচ্চাঙ্গের ছিল। এক সময়ে যাহারা বৃত্তিমূলক ও কারিগরী শিক্ষা গ্রহণ করিত তাহারাও বৈদিক স্তোত্রাদির বিষয়ে প্রয়োজনমত শিক্ষা লাভ করিত। আধ্যাত্মিক জ্ঞানকে শিক্ষার বুনিয়াদ বলিয়া মনে করিত।

উপরন্তু কর্মশালায় কেবল ব্যবহারিক শিক্ষা দেওয়া হইত এমন নহে। প্রত্যেক শিল্প বা বৃত্তিমূলক কাজের তাত্ত্বিক বিষয়ও ভালভাবে শিক্ষা দেওয়া হইত। ভাস্কর্য ও চিত্রাঙ্কনের ছাত্রগণকে মূর্তিবিদ্যা ও সুকুমার শিল্পাদি বিষয়ের সংস্কৃত ম্যানুয়াল গ্রন্থাদি যত্নের সহিত বিশদভাবে অধ্যয়ন করিতে হইত। কারিগরী শিক্ষা যন্ত্রবৎ ভাসাভাসা দেওয়া হইত না, বৈজ্ঞানিকভাবেই দেওয়া হইত।

যাহারা কারিগরী শিক্ষালাভ করিত তাহারা সাধারণ শিক্ষায়ও ব্যুৎপন্ন ছিল। অথচ কালক্রমে অবস্থা এরূপ দাঁড়াইল যে যাহারা কারিগরী শিক্ষা গ্রহণ করিত তাহারা অধিকাংশই নিরক্ষর থাকিয়া যাইত। সাধারণ শিক্ষার প্রতি তাহাদের কোনরূপ আগ্রহ রহিল না।

ইহার কারণ কি তাহা চিন্তা করা আবশ্যক। সমাজে মানুষের মধ্যে যে সব ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিয়া থাকে তাহার মূল কারণ অনুসন্ধান করিলে বুঝা যায় যে অনেক ক্ষেত্রে সমাজের ধর্ম সম্পর্কীয় বিচারের সহিত উহার কার্যকারণ সম্বন্ধ থাকে। বিশেষত ভারতবর্ষের ন্যায় দেশে যেখানে মানুষের জীবনের প্রত্যেক কার্যের সহিত ধর্ম কোন-না-কোনরূপে সংশ্লিষ্ট হইয়াছিল সেখানে সমাজের ধর্ম সম্পর্কীয় ধারণার মধ্যে উহার কারণ অবশ্য থাকিয়া যায়।

ভারতে শিক্ষার সূত্রপাত ধর্ম শিক্ষা অর্থাৎ বেদ শিক্ষা হইতে হইয়াছিল। সেই ধর্ম শিক্ষার অধিকার হইতে স্ত্রীলোকদিগকে অর্থাৎ সমাজের অর্ধাংশকে বঞ্চিত করা হইল। বৈশ্যগণ শূদ্রগণের সহিত বিবাহ

আদি সম্বন্ধের দ্বারা মিলিত হইয়াছিল বলিয়া তাহাদের ভাষা বিকৃত হয়। এজন্য উপনয়নের কর্তব্য কর্ম ও বৈদেশিক শিক্ষা তাহাদের দ্বারা আয়ত্ত করা সম্ভব হইত না। বেদকে অক্ষুণ্ণ রাখার দৃষ্টিতে সঙ্গত মনে হইলেও মানুষকে তাহার ধর্মের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইল। ক্ষত্রিয়গণও নানা কারণে উপনয়ন তথা বেদ অধ্যয়ন ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। অবশ্য বেদের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইলেও পুরাণাদির অধ্যয়নের অধিকার সকলের ছিল। কিন্তু তখন এরূপ সংস্কার ছিল যে বেদ শিক্ষাই শিক্ষার মূল।

সুতরাং যেখানে শিক্ষার মূলস্বরূপ বেদ শিক্ষা করা যাইত না, সেখানে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ নষ্ট হওয়া কিছুই অস্বাভাবিক ছিল না। হিন্দুধর্ম পুনরুত্থানের আগ্রহাতিশয্যে যখন প্রাথমিক বিদ্যালয়েও প্রাকৃত ভাষা শিক্ষা অপেক্ষা সংস্কৃত শিক্ষার প্রাধান্য দেওয়া হয় তখন তাহার ফলে জনসাধারণের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করা হইল। উপরন্তু কৃষি ও কারিগরী সমস্ত বৃত্তি ব্রাহ্মণগণের পক্ষে নিষিদ্ধ করা হইল। নিষেধের পশ্চাতে সঙ্গত যে কোন কারণই থাকুক, উহার ফলে সমাজে ছোটবড় ভেদজ্ঞানের ও জাতিভেদের সৃষ্টি হইল। ব্রাহ্মণের বৃত্তি শ্রেষ্ঠ বৃত্তি এবং কৃষি ও কারিগরী বৃত্তি হীন বৃত্তি এরূপ ধারণা কালক্রমে সৃষ্টি করা হইল। সমাজের উচ্চতম স্তরে এই মনোভাবের উদ্ভব হওয়ায় উহা সমাজের সকল স্তরে সংক্রামিত হইল। ফলে যাহারা ঐ সব বৃত্তি অনুসরণ করিত তাহারাও নিজেদের বৃত্তিকে হীন বলিয়া ভাবিতে শিখিল। ইহা এক অদ্ভুত ব্যাপার।

দেশের অধিকাংশ লোক নিজেদের অনুসৃত বৃত্তিকে নিজেরাই হেয় বলিয়া গণ্য করে এরূপ দুর্ভাগ্যের দৃষ্টান্ত জগতের আর কোথাও দেখা যায় না। সেইসব বৃত্তির মান উন্নীত করিবার পক্ষে আর কোন প্রেরণা তাহাদের মধ্যে থাকিল না এবং কারিগরী শিক্ষার জন্য যে সাধারণ শিক্ষা অত্যাবশ্যক সেই বোধও তাহাদের নষ্ট হইয়া গেল। কারিগরী শিক্ষার মান অবনত হইতে থাকিল। ঐ শিক্ষা কোন রকমে জড়বৎ চলিতে থাকিল। কৃষক ও কারিগর শ্রেণীর প্রায় সকলেই নিরক্ষর থাকিয়া গেল।

এরূপে সমাজে যাহারা সাধারণ উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতেন তাঁহাদের শিক্ষার সহিত কারিগরী শিক্ষার কোন সম্পর্ক রহিল না। উপরন্তু তাঁহারা

উহাকে হেয় বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলেন। আবার কারিগরী শিক্ষা সাধারণ শিক্ষা হইতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হইল। এইরূপে ভারতের শিক্ষা ক্ষেত্রে অন্ধকার যুগ চলিতে লাগিল।

ইংরাজ শাসনের পরিণাম

শিক্ষার এই শোচনীয় অবস্থায় এ দেশে ইংরাজ রাজত্ব আরম্ভ হইল। বৈদেশিক শাসকগণ দেশের উপর এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থা চাপাইয়া দিলেন যাহার পশ্চাতে দেশের জনগণের প্রকৃত কল্যাণমূলক কোন পরিকল্পনা ছিল না। ইহা কাহারও অবিদিত নাই যে, ইংরাজী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্য ছিল ভারতে কেবল ব্রিটিশ রাজ্যশাসন ও বাণিজ্য পরিচালনের জন্য ইংরাজী জানা দেশী কর্মচারী গড়িয়া তোলা। ঐ শিক্ষার ফলে শিক্ষিত ব্যক্তিদের সহিত দেশের সাধারণ জনগণের বিচ্ছেদ আরও গভীর ও সুদূর-প্রসারী হইয়া উঠিল। দেশীয় শিক্ষা অবহেলিত হওয়ার ফলে দেশে লিখনপঠনক্ষম লোকের সংখ্যা আরও হ্রাস পাইল। ইংরাজ প্রবর্তিত শিক্ষার ত্রুটি কোথায় তাহার বিশদ আলোচনা পরের অধ্যায়ে করা হইবে।

জাতীয় শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা ও রবীন্দ্রনাথের ভাবধারা

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন আরম্ভ হয়। উহাকে উপলক্ষ করিয়া দেশের মধ্যে জাতীয়তা ও স্বদেশীর মনোভাব জাগ্রত হয় এবং ব্যাপক জাতীয় আন্দোলন আরম্ভ হয়। ইংরাজ শাসকগণ যে শিক্ষাপ্রণালী ও শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন তাহা যে জাতীয়তা ও স্বাদেশিকতার বিরোধী এই বোধ বিশেষভাবে জাগ্রত হয়।

জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য বাংলার নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে 'ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ্ এডুকেশন' নামক এক পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। সকলেই জানেন যে উহা ক্রমে যাদবপুর টেকনিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও পরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। পরিষদ কর্তৃক সাধারণ শিক্ষার জন্য যে শিক্ষালয় পরিচালিত হইত তাহাতে বিদেশী শিক্ষাপ্রণালীই অনুসৃত হইত।

সেই সময়ে হরিদ্বারে গুরুকুল প্রতিষ্ঠিত হয়। গুরুকুলে প্রাচীন বৈদিক শিক্ষা পদ্ধতির সহিত আধুনিক জাতীয় ভাবনাযুক্ত করিয়া জাতীয় শিক্ষার প্রবর্তন করা হয়।

ইংরাজ প্রবর্তিত শিক্ষা প্রণালীর ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সবিশেষ সজাগ ছিলেন। এই শিক্ষা সম্পর্কে তিনি ক্ষোভের সহিত বলিতেন—

"বস্তুর সহিত বহির সহিত আমরা মিলাইয়া শিখিবার অবকাশ পাই না। আমাদের অধিকাংশ শিক্ষা যে সকল দৃষ্টান্ত আশ্রয় করে তাহা আমাদের দৃষ্টিগোচর নহে। আমরা ইতিহাস পড়ি; কিন্তু যে ইতিহাস আমাদের দেশের জনপ্রবাহকে অবলম্বন করিয়া প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে, যাহার নানা লক্ষণ, নানা স্মৃতি আমাদের ঘরে-বাহিরে নানাস্থানে প্রত্যক্ষ হইয়া আছে, তাহা আমরা আলোচনা করি না বলিয়া ইতিহাস যে কি জিনিস তাহার উজ্জ্বল ধারণা আমাদের হইতেই পারে না। আমরা ভাষাতত্ত্ব মুখস্থ করিয়া পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করি; কিন্তু আমাদের নিজের মাতৃভাষা কালে কালে, প্রদেশে প্রদেশে কেমন করিয়া যে নানা রূপান্তরের মধ্যে নিজের ইতিহাস প্রত্যক্ষ নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা তেমন করিয়া দেখি না বলিয়াই ভাষা-রহস্য আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে না। এক ভারতবর্ষে সমাজ ও ধর্মের যেমন বহুতর অবস্থা বৈচিত্র্য আছে এমন বোধহয় আর কোন দেশে নাই। অনুসন্ধানপূর্বক, অভিনিবেশপূর্বক সেই বৈচিত্র্য আলোচনা করিয়া দেখিলে সমাজ ও ধর্মের বিজ্ঞান আমাদের কাছে যেমন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে এমন দূরদেশের ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় বই পড়িয়া-মাত্র কখন হইতেই পারে না।

"নিজে চিন্তা করিবে, নিজে সন্ধান করিবে, নিজে কাজ করিবে এমন তরো মানুষ তৈরী করিবার প্রণালী এক; আর পরের হুকুম মানিয়া চলিবে, পরের মতের প্রতিবাদ করিবে না ও পরের কাজের যোগানদার হইয়া থাকিবে মাত্র, এমন মানুষ তৈরীর বিধান অন্যরূপ।"

তিনি আরও বলেন—

"দশটা হইতে চারটে পর্যন্ত যাহা মুখস্থ করি, জীবনের সঙ্গে চারিদিকের মানুষের সঙ্গে, ঘরের সঙ্গে তাহার মিল দেখতে পাই না। বাড়ীতে বাপ মা ভাই বন্ধুরা যাহা আলোচনা করেন বিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে তাহার যোগ নাই, বরঞ্চ অনেক সময়ে বিরোধ আছে। এমন অবস্থায় বিদ্যালয় একটা এঞ্জিন মাত্র হইয়া থাকে; তাহা বস্তু যোগায়, প্রাণ যোগায় না।"

যে তপোবন একদিন ভারতের সভ্যতা ও শিক্ষার মূল উৎস ছিল সেরূপ একটি আশ্রম শিক্ষালয় গড়িয়া তুলিবার জন্য রবীন্দ্রনাথের একান্ত আগ্রহ হয়। ভারতের আরণ্যক সাধনার স্বরূপ যে কি ছিল তাহা তিনি অনুপম ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা হইতে বুঝা যায় কেন তিনি তপোবন বিদ্যালয়ের দিকে এত আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি বলেন—

"যে ঔষধি বনস্পতির মধ্যে প্রকৃতির প্রাণের ক্রিয়া দিনে রাত্রে ও ঋতুতে ঋতুতে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠে এবং প্রাণের লীলা নানা অপরূপ ভঙ্গীতে ধ্বনিতে ও রূপ-বৈচিত্র্যে নিরন্তর নূতন নূতন ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে, তারই মাঝখানে ধ্যানপরায়ণ চিত্ত নিয়ে যাঁরা ছিলেন তাঁরা নিজের চারিদিকেই একটি আনন্দময় রহস্যকে সুস্পষ্ট উপলব্ধি করেছিলেন। সেইজন্য তাঁরা এত সহজে বলতে পেরেছিলেন—

'যদিদং কিঞ্চ সর্ব প্রাণ এজতি নিঃসৃতং।'

—এই যা কিছু তা পরম প্রাণ হতে নিঃসৃত হয়ে প্রাণের মধ্যেই কম্পিত হচ্ছে। তাঁরা স্বরচিত ইঁট, কাঠ লোহার কঠিন খাঁচার মধ্যে ছিলেন না, তাঁরা যেখানে বাস করতেন সেখানে বিশ্বব্যাপী বিরাট জীবনের সঙ্গে তাঁদের জীবনের অবারিত যোগ ছিল। এই বন তাঁদের ছায়া দিয়েছে, ফল-ফুল দিয়েছে, কুশ সমিধ যুগিয়েছে, তাঁদের প্রতিদিনের সমস্ত কর্ম অবকাশ ও প্রয়োজনের সঙ্গে এই বনের আদান-প্রদানের জীবনময় সম্বন্ধ ছিল। এই উপায়েই নিজের জীবনকে তাঁরা চারিদিকের একটি বড় জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে জানতে পেরেছিলেন। চতুর্দিকে তাঁরা শূন্য বলে, নির্জীব বলে, পৃথক বলে জানতেন না। বিশ্ব-প্রকৃতির ভিতর দিয়ে আলোক, বাতাস, অন্ন, জল প্রভৃতি যে সমস্ত দান তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন সেই দানগুলি যে মাটির নয়, গাছের নয়, শূন্য আকাশের নয়, একটি চেতনাময় অনন্ত আনন্দের মধ্যেই তার মূল প্রস্রবন, এইটি তাঁরা একটি সহজ অনুভবের দ্বারা জানতে পেরেছিলেন; সেই জন্যেই নিশ্বাস, আলো, অন্ন, জল, সমস্তই তাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে, ভক্তির সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। এইজন্যেই নিখিল চরাচরকে নিজের প্রাণের দ্বারা, চেতনার দ্বারা, হৃদয়ের দ্বারা, বোধের দ্বারা, নিজের আত্মার সঙ্গে আত্মীয়রূপে একবারে পাওয়াই ভারতবর্ষের পাওয়া।"

এই আরণ্যক সাধনা হইতে ভারতবর্ষ যে পরম সত্য লাভ করিয়াছিল তাহা কী সে সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন :—

"যে সত্য প্রধানতঃ বণিক বৃত্তি নয়, স্বরাজ্য নয়, স্বাদেশিকতা নয়, সে সত্য বিশ্ব জাগতিকতা। সেই সত্য ভারতবর্ষের তপোবনে সাধিত হয়েছে, উপনিষদে উচ্চারিত হয়েছে, গীতায় ব্যাখ্যাত হয়েছে। বুদ্ধদেব সেই সত্যকে পৃথিবীতে সর্বমানবের নিত্য ব্যবহারে সফল করে তোলবার জন্যে তপস্যা করেছেন এবং কালক্রমে নানাবিধ দুর্গতি ও বিকৃতির মধ্যেও কবীর, নানক প্রভৃতি ভারতবর্ষের পরবর্তী মহাপুরুষগণ সেই সত্যকেই প্রকাশ করে গেছেন। ভারতবর্ষের সত্য হচ্ছে জ্ঞানে অদ্বৈত তত্ত্ব, ভাবে বিশ্বমৈত্রী ও কর্মে যোগ সাধনা। ভারতবর্ষের অন্তরের মধ্যে যে উদার তপস্যা গভীরভাবে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে, সেই তপস্যা আজ হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও ইংরেজকে আপনার মধ্যে এক করে নেবে বলে প্রতীক্ষা করছে—দাস ভাবে নয়, জড়ভাবে নয়, সাত্বিকভাবে, সাধকভাবে।"

জাতীয় শিক্ষার আদর্শ কিরূপ হওয়া উচিত এ সম্বন্ধে তাঁহার যে উচ্চতম ভাবনা ছিল তাহা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি বলেন—

"জাতীয় বিদ্যা শিক্ষা বলতে য়ুরোপ যা বুঝে আমরা যদি তাই বুঝি তবে তা নিতান্তই বোঝার ভুল হবে। আমাদের কতকগুলি বিশেষ সংস্কার, আমাদের জাতের কতকগুলি লোকাচার, এইগুলির দ্বারা সীমাবদ্ধ করে আমাদের স্বাজাত্যের অভিমানকে অত্যুগ্র করে তোলবার উপায়কে আমি কোনমতে জাতীয় শিক্ষা বলে গণ্য করতে পারিনে, জাতীয়তাকে আমরা পরম পদার্থ বলে মনে করিনে, এইটেই হচ্ছে আমাদের জাতীয়তা।

'ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি, ভূমাত্বৈব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ'—

এইটিই হচ্ছে আমাদের জাতীয়তার মন্ত্র। প্রাচীন ভারতের তপোবনে এই যে মহা সাধনার বনস্পতি একদিন মাথা তুলে উঠেছিল এবং সর্বত্র যার শাখা প্রশাখা বিস্তার করে সমাজের নানাদিককে অধিকার করে নিয়েছিল সেই ছিল আমাদের জাতীয় সাধনা।"

এই সব উদাত্ত ভাবনা ও আদর্শ লইয়া তিনি শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার কল্পনার শিক্ষালয় লোকালয় হইতে দূরে, নির্জনে মুক্ত আকাশ ও উদার প্রান্তরে গাছপালার মধ্যে প্রতিষ্ঠা করিয়া-

ছিলেন। তিনি চাহিয়াছিলেন যে সেখানে অধ্যাপকগণ নিভৃতে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকিবেন এবং ছাত্রগণ সেই জ্ঞানচর্চার যজ্ঞক্ষেত্রের মধ্যেই বাড়িয়া উঠিবে।

মহাত্মা গান্ধীর অবদান

অতঃপর ভারতের রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব হয়। অহিংস অসহযোগ আন্দোলন চলিতে থাকে। সরকারী শিক্ষালয় বর্জন উহার এক মুখ্য কার্যক্রম ছিল। দলে দলে ছাত্রছাত্রীগণ সরকারী শিক্ষালয় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিতে থাকে। ঐ আন্দোলনের গঠনমূলক অঙ্গ স্বরূপ দেশের স্থানে স্থানে জাতীয় বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠা করা হয়। যথা গুজরাত বিদ্যাপীঠ, বিহার বিদ্যাপীঠ, কাশী বিদ্যাপীঠ, দিল্লীর জামিয়া মিলীয়া ইসলামিয়া ইত্যাদি। এই সব বিদ্যাপীঠে শিক্ষায় জাতীয়ভাবকে রূপ দিবার চেষ্টা করা হয়। উহাতে সুতাকাটা, বস্ত্রবয়ন ইত্যাদি জীবন ধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদির উৎপাদক হস্তশিল্পের প্রবর্তন করা হয়।

কিন্তু সমগ্রভাবে আমাদের জাতীয় শিক্ষার স্বরূপ কি হওয়া উচিত ও সেই শিক্ষার সর্বোত্তম পদ্ধতিই বা কিরূপ হওয়া উচিত তাহার ধারণা তখন পর্যন্ত স্পষ্ট হয় নাই। বিশ্বজনীনতা ও বিশ্বমৈত্রী যে ভারতীয় জাতীয়তা ও শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ তাহা দেশ ও বিশ্বের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল। পরে উহাকে বিশ্বভারতীতে পরিণত করা হয়। ভারতীয় সংস্কৃতি যে সকলকে নিজের মধ্যে এক করিয়া লইবার সংস্কৃতি, তাহা তিনি সুস্পষ্ট ভাবে জগতের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতেছিলেন। এজন্য জগতের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সংস্কৃতির মনীষী ও শিক্ষার্থীগণকে সেখানে আকর্ষণ করিয়া আনিয়া উহাকে বিশ্ব সংস্কৃতির কেন্দ্র স্বরূপ গড়িয়া তোলা হইয়াছিল। ভাবনা ও আদর্শের দিক হইতে ইহা ঠিকই ছিল। তবে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এবং শিক্ষার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় সেই ভাবনা ও আদর্শকে কিভাবে রূপায়িত করিতে হইবে তাহার ধারণা তখনও স্পষ্টভাবে ধরা দিতেছিল না।

পাশ্চাত্যে শিল্পবিপ্লব হওয়ায় তাহার প্রচণ্ড আঘাতে ভারতের অর্থ ব্যবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থা ভীষণ ওলট-পালট হইয়া গিয়াছিল। বিজ্ঞানের

অভাবনীয় উন্নতির সম্মুখীন হইয়া আমাদের অনেক পুরাতন ধারণা ও সংস্কার ভ্রান্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নূতন ও পুরাতনের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান বা পুরাতনকে চিরতরে পরিত্যাগ অথবা পুরাতনকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া থাকা, ইহাদের কোনটি গ্রহনীয় তাহা তখনও আমাদের কাছে স্পষ্ট হয় নাই। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক আদর্শ ভারতের দ্বারে করাঘাত করিতেছিল। জাতীয়তার দৃষ্টিতে ভারতবর্ষে তাহাদিগকে কি ভাবে গ্রহণ বা বর্জন করা উচিত তাহাও তখন স্পষ্ট হয় নাই।

এই সময় মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অহিংসার পরীক্ষা চলিতেছিল। এই পরীক্ষা যদি সফল হয় অর্থাৎ ভারত যদি বিনা অস্ত্রে স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে তবে আর্থিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অহিংসার প্রয়োগ কি ভাবে করা হইবে অর্থাৎ অহিংস সমাজ গঠনের স্বরূপ ও উপায় কিরূপ হইবে তাহার ধারণা তখনও সুস্পষ্ট হয় নাই।

আমরা কি হইব বা কি হইতে চাই তাহার স্পষ্ট ধারণা থাকা চাই। তবেই কী শিখিতে হইবে তাহার ধারণা স্পষ্ট হইবে। কারণ 'কি হইব' ও 'কি শিখিব' এই দুইটি ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট।

আধুনিক কালে শিক্ষা বিজ্ঞান সম্পর্কে পাশ্চাত্যে বহু আলোচনা ও গবেষণা চলিয়াছে। এদেশেও তাহার প্রবাহ আসিয়াছে। নূতন নূতন শিক্ষা পদ্ধতির প্রয়োগ ও পরীক্ষা হইয়াছে। ঐ সব শিক্ষা পদ্ধতির যাহা ভাল তাহা আমাদের জাতীয় শিক্ষায় নিশ্চয় গ্রহণ করা উচিত। শিক্ষা-বিজ্ঞানীগণ আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে বলিতেছেন যে শিক্ষার সহিত কোন উপযোগী কাজ সংযুক্ত থাকা উচিত। কিন্তু সেই কাজ কি প্রকারের হওয়া উচিত ও শিক্ষার সহিত সেই কাজের সংযোগ কি প্রকার হইলে উহা প্রকৃষ্ট শিক্ষা পদ্ধতি হইতে পারে তাহা তখনও স্থির হয় নাই। কাজ ও শিক্ষা যে এক ও অবিভাজ্য হওয়া উচিত এই কল্পনা এতাবৎ কাহারও মনে উদিত হয় নাই। উপরন্তু হাতের কাজের মাধ্যমে শিক্ষার দ্বারাই যে এদেশে নব সমাজ গড়িয়া তোলা সম্ভব এই ধারণা তখনও জন্মলাভ করে নাই।

উপরে প্রাচীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে।

আমরা দেখিয়াছি যে শিক্ষা-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে প্রাচীন ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থায় এমন উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছিল যাহা শিক্ষা-বিচারের ক্ষেত্রে পরম মূল্যবান এবং যাহাকে আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় যথাযোগ্য স্থান দিতে হইবে। পুরাতনকে একেবারে বর্জন করিলে চলিবে না। পুরাতনের যাহা কিছু মহান্ তাহার ভিত্তিতে নূতন সৌধ নির্মাণ করিতে হইবে। প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার সম্পদগুলি এই :—

(১) ছাত্রের চরিত্র গঠন, ব্রহ্মচর্য-আশ্রম পালন ও ছাত্রের ব্যক্তিত্বের বিকাশের উপর সমধিক গুরুত্বদান অর্থাৎ সদাচার শিক্ষাকে প্রাধান্য দেওয়া ;

(২) শিক্ষক ও ছাত্রের সহাবস্থান এবং শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও স্নেহের সম্পর্ক স্থাপন ;

(৩) গুরুগৃহে শ্রমসাধ্য কাজকর্ম করিতে করিতে শিক্ষা লাভের সুযোগ দান ;

(৪) দরিদ্রতম ছাত্রকেও শিক্ষা লাভের সুযোগ দান ;

(৫) প্রত্যেক ছাত্রের প্রতি ব্যক্তিগত ভাবে মনোযোগ দেওয়া ;

(৬) শিক্ষা সমাপ্তির পরও সাধারণ জীবনে নিয়মিত অধ্যয়নের নিয়ম অর্থাৎ স্বাধ্যায় ;

(৭) শিক্ষার বুনিয়াদে আধ্যাত্মিকতা ;

(৮) শিক্ষা-ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ না করিয়া সরকারের যথাসাধ্য সহায়তা দান ;

(৯) তপোবনে শিক্ষা ; এবং

(১০) ছাত্রদের পক্ষে গুরুর আদর্শে নিজেদের জীবন গঠন করিবার সুযোগ (কারণ তখন গুরু ছিলেন আচার্য অর্থাৎ তিনি যাহা শিক্ষা দিতেন নিজের জীবনে তিনি তাহা আচরণ করিতেন)।

আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় অহিংস ক্রান্তি সাধন করিয়া এক নব-সমাজ নির্মাণ করিতে হইবে। সমাজ গঠন ও সমাজের শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে সাধ্য-সাধনের সমন্বয় আবশ্যক।

এজন্য নূতন সমাজ গঠনের উপযোগী অথচ শিক্ষা-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে নিখুঁত এক পরিপূর্ণ শিক্ষা-প্রণালী উদ্ভাবনের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। এই

প্রণালীর মধ্যে পুরাতন ও নূতনের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ সবই থাকিবে। কিন্তু উহাকে ক্রান্তিকারী নব-মূর্তিতে আবির্ভূত হইতে হইবে।

কে এই বিপ্লবাত্মক শিক্ষা-প্রণালীর আবিষ্কর্তা হইবেন? যিনি অহিংস সমাজ নির্মাণের মন্ত্র দান করিয়াছিলেন, সেই মহাত্মাই তাঁহার সর্বশেষ ও সর্বোত্তম দান স্বরূপ উহার সাধনোপযোগী শিক্ষারও মন্ত্র দান করিলেন। সেই মন্ত্র কি এবং কি প্রকারে সেই মন্ত্রের সাধন করা যায় তাহা উপলব্ধি করিলে আমাদের বর্তমান শিক্ষার গতি কোন্ পথে হওয়া বাঞ্ছনীয় তাহার স্পষ্ট ইঙ্গিত আমরা পাইতে পারি।

নয়ী তালীমের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

প্রচলিত শিক্ষার প্রতি অসন্তোষ

কিছুদিন পূর্বে প্রত্যুষের গাড়ীতে কলিকাতা হইতে ডায়মণ্ডহারবারে আসিতেছিলাম। কামরাতে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক ছিলেন। মাঝে এক স্টেশনে দেখিলাম, কিছুক্ষণ পূর্বে কলিকাতাগামী যে ট্রেণটি চলিয়া গিয়াছে তাহাতে বিনা টিকিটে ভ্রমণকারী যাত্রী জনকয়েককে ধরিয়া পুলিশের হেফাজতে আটক রাখা হইয়াছে। ইহা দেখিয়া ভদ্রলোক কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"আজকাল ট্রেণে বিনা টিকিটে যাতায়াত যে এত বাড়িয়া গিয়াছে, তাহার কারণ কি জানেন? আজকালকার শিক্ষার অব্যবস্থা। তা ছাড়া ছাত্রদের দেখাদেখি এই সব দুর্নীতি আরও বাড়িয়া চলিতেছে। ছাত্রেরা দল বাঁধিয়া ট্রেণে যাতায়াত করিবে। টিকিট তো কাটিবেই না, আবার সুযোগ পাইলে ফাষ্ট ক্লাসের কামরায়ও চড়িবে। কেহ আপত্তি করিলে মারমুখো হইবে।"

আমি বই হইতে চোখ তুলিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া নির্বাক হইয়া তাঁহার কথা শুনিতেছিলাম। ভদ্রলোক তাহাতে উৎসাহিত হইয়া বলিয়া চলিলেন,—"শিক্ষা হইতেছে, না ছাই হইতেছে! দেখুন না! ছেলেদের

সিগারেট ফুঁকিবার ঠেলায় সিগারেটের দাম চড়িয়া যাইতেছে। ছেলে-মেয়েদের ভীড়ে সিনেমায় গা গলাইবার জো নাই।"

আমি ধীরভাবে একটু নিম্নস্বরে বলিলাম, "কিন্তু এই দুইটি বিষয়ে কি বড়রা ছোটদের পথ দেখাইতেছেন না?" ভদ্রলোক দমিয়া গেলেন না। "না, তাহা নহে। আজকালকার ছেলেমেয়েদের কি পথ দেখাইতে হয়? আমার বয়সী লোকেরা শতকরা কয় জন ধূমপান করে ও স্কুলকলেজের ছেলেরা শতকরা কত জন ধূমপান করে তাহা দেখুন? আর আমার বয়সের লোকেদের মধ্যে শতকরা কয় জন সিনেমা দেখে তাহাও দেখুন?"

সাধারণ লোকের মধ্যেও বর্তমান শিক্ষা সম্বন্ধে এরূপ মন্তব্য প্রকাশের দৃষ্টান্ত আজকাল বিরল নহে। সমাজে যে সব দোষ-ত্রুটি, বিশৃঙ্খলা বা অনৈতিকতা দেখা যাইতেছে তাহার জন্য বর্তমান শিক্ষাই যে একমাত্র দায়ী তাহা না হইতে পারে অথবা ছাত্র-যুবকদের সম্বন্ধে উপরোক্ত প্রকার বা অন্য যে সব বিরূপ মন্তব্য করা হয় তাহা সর্বৈব সত্য না হইতে পারে, কিন্তু একথা সত্য যে বর্তমান শিক্ষা সম্বন্ধে বহুলোকের মধ্যে একটা বিরূপ মনোভাব গড়িয়া উঠিতেছে, যদিও তাঁহাদের এ সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান নাই যে বর্তমান শিক্ষার ত্রুটি ঠিক কোথায় এবং তাহার কু-পরিণাম জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কি ভাবে প্রকাশ পাইতেছে।

১৯৫৬ সালের জানুয়ারী মাসে সেবাগ্রামে যে অখিল ভারত উত্তর বুনিয়াদী শিক্ষা-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে মহারাষ্ট্রের সুপ্রসিদ্ধ তুকড়োজী মহারাজ এ সম্পর্কে যাহা বলেন তাহা এখানে উল্লেখ করার যোগ্য। তিনি বলেন,—

> "আমি তো দেখিতেছি যে এখন সহরের লোকদেরও মন স্কুল কলেজের দিক হইতে সরিয়া আসিতেছে। আমার কাছে এরূপ শত শত পত্র আসিতেছে। মাতা-পিতা অনেকে এরূপ অভিযোগ করিতেছেন যে তাঁহাদের ছেলেরা যখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়িত তখন তাহারা ঘরের কাজ করিত, গরুর গোবর তুলিত ও মা-বাপের কথা মানিয়া চলিত। কিন্তু তাহারা যখন হাইস্কুল বা কলেজে পড়িতে গিয়াছে তখন হইতেই তাহাদের পরিবর্তন হইয়াছে। তাহারা জনসাধারণের সমস্যার কথা চিন্তা করে না, নিজেরা কেমন করিয়া

বড় বড় বাড়ী ও ভাল ভাল পোষাক পাইবে তাহাই চিন্তা করে। কেমন করিয়া লোক দুইমুঠা খাইতে পাইবে ইহা যে আজ দেশের সর্বাপেক্ষা বড় সমস্যা একথা তাহারা ভাবে না।”

পশ্চিমবঙ্গে বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রতি আকর্ষণ

কয় বৎসর যাবৎ ভূদানযজ্ঞের কাজে বাংলার গ্রামে গ্রামে পাদ-পরিক্রমা করিবার সময় লক্ষ্য করা গিয়াছে যে সচ্ছল অবস্থাপন্ন বহু গ্রামের লোক তাহাদের গ্রামের উন্নতির জন্য দুইটি জিনিস কামনা করিয়া থাকে :—

(১) তাঁহাদের গ্রামে একটি হাসপাতাল (ইউনিয়ন বা থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্র) স্থাপন করা হউক ; এবং

(২) একটি বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হউক।

বহু অর্ধদরিদ্র গ্রামের লোকের মনেও বুনিয়াদী বিদ্যালয় সম্পর্কে অনুরূপ আগ্রহ দেখা যায়। শুনা যায় ভারতের অন্যত্র যেখানে নয়ী তালীম তথা বুনিয়াদী শিক্ষার অস্বাভাবিক প্রসার ও বিকাশ হইয়াছে সেখানে লোকের মনে নয়ী তালীমের জন্য বিশেষ কোনরূপ আকর্ষণ জন্মে নাই। কিন্তু বাংলা দেশে নয়ী তালীমের বিশেষ কাজ না হইলেও সাধারণ লোকের মনে উহার প্রতি আকর্ষণ আছে দেখা যায়। বহু লোক মনে করে— ইহা উত্তম শিক্ষা। ইহার কারণ কি? সমাজের বর্তমান অবস্থায় হাস-পাতাল প্রতিষ্ঠা করার অভিলাষ লোকের মনে জাগ্রত হওয়া কিছুই অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের জন্য লোকের মনে এরূপ আগ্রহ হওয়ার কারণ কি?

বাংলা দেশে কি বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতির ব্যাপক বা গভীর প্রয়োগ করা হইয়াছে আর জনগণ কি উহার সফলতা দেখিবার সুযোগ লাভ করিয়াছে? তাহা নহে। বুনিয়াদী শিক্ষার বিচার ভালভাবে বুঝিয়া কি তাঁহারা উহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে? তাহাও নহে। তবে বুনিয়াদী বিদ্যালয় সম্পর্কে জনমনে এরূপ আগ্রহ সৃষ্টির মূল কোথায়? যদি গ্রামের লোককে বুঝাইয়া দেওয়া যায় যে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ইংরাজী শিক্ষার স্থান নাই এবং বুনিয়াদী তথা উত্তর বুনিয়াদী শিক্ষা সমাপ্ত করিলেও উহা

চাকুরী লাভের যোগ্যতা স্বরূপ মান্য করা হয় না, তবে তাঁহারা হয়তো নিরুৎসাহিত হইবে। তথাপি অস্পষ্ট বা অহেতুক হইলেও তাঁহাদের এই ধারণা থাকিয়া যাইবে যে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে তাঁহাদের ছেলেমেয়েরা অপেক্ষাকৃত ভাল শিক্ষা লাভ করিবার সুযোগ পাইবে। গ্রামের লোকের মনে বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে এই স্বতঃজাগ্রত আকর্ষণ কোথা হইতে আসিল ?

বিনোবাজী বলেন যে, যে সব গঠন কর্মসূচীর দ্বারা নব সমাজ রচিত হইবে সেগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধসৃষ্টিকারী আকর্ষণশক্তি হইতেছে নয়ী তালীম। নয়ী তালীম হইতেছে নব সমাজ নির্মাণের কার্যক্রম সমূহের আধার স্বরূপ। ভবিষ্যৎ ঘটনার ছায়া বর্তমানকালে পতিত হইয়া থাকে (কামিং ইভেণ্টস্ কাষ্ট দেয়ার শ্যাডোস্ বিফোর)। যাহা আসিতেছে তাহার আভাস আজই পাওয়া যাইতেছে। বিচারের আভাস পূর্ব হইতেই জনমনে প্রতিভাত হইয়া থাকে। অদূর ভবিষ্যতে শিক্ষায় যে ক্রান্তি অবশ্যম্ভাবী তাহার আভাস তাই আজ অবিকৃত জনমনে প্রতিভাত হইতেছে।

শিক্ষার যে নব বিচারকে বুনিয়াদী শিক্ষা বলা হয় তাহার নাম 'নয়ী তালীম'। উহাকে 'বুনিয়াদী শিক্ষা বা ওয়ার্ধা পরিকল্পনা' বলা হয়। আর উহাকে 'বুনিয়াদী জাতীয় শিক্ষা' বলা হয় এবং 'শিক্ষার অহিংসক ক্রান্তি' বলা হয়। নয়ী তালীমের প্রকৃত স্বরূপ কি তাহা সম্যক উপলব্ধি করিতে হইলে কোন্ পটভূমিকায় ও কি ভাবে উহার উদ্ভব হইয়াছে আর উহার বিকাশই বা কি ভাবে হইতেছে তাহা জানা ও বুঝা প্রয়োজন।

অহিংস সমাজ গঠনের উপযোগী শিক্ষা

মহাত্মা গান্ধী একদিকে যেমন অহিংসার পথে অসহযোগ, আইন অমান্য ও সত্যাগ্রহের দ্বারা ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য আন্দোলন চালাইতেছিলেন তেমনই অন্যদিকে স্বাধীন ভারতে শোষণহীন শ্রম-আধারিত অহিংস সমাজ গড়িয়া তুলিবার কল্পনাও তিনি করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং উহার সাধন স্বরূপ তিনি খাদি, পল্লীশিল্প, অস্পৃশ্যতা পরিহার, সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠা, মাদকতা দূরীকরণ, অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্রভাষা প্রচার, মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা ইত্যাদি বিবিধ প্রকারের রচনাত্মক কার্যক্রমের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সব গঠনমূলক কার্যক্রমও যতদূর সম্ভব দেশের বিভিন্ন স্থানে চালানো হইতেছিল। কারণ উহা একদিকে স্বাধীনতা সংগ্রামের সহায়ক হইতেছিল এবং অন্যদিকে স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গেই অহিংস সমাজ রচনা করার পক্ষে অনুকূল ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছিল। তাঁহার প্রতিভা যে কিরূপ প্রখর, তাঁহার অন্তদৃষ্টি যে কিরূপ গভীর ও তাঁহার দূরদৃষ্টি যে কতদূর প্রসারিত ছিল তাহা তাঁহার নির্দেশিত কার্যক্রমগুলি অনুধাবন করিলে সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

ক্রান্তদর্শী মহাত্মা গান্ধী তাঁহার প্রদর্শিত কার্যক্রমে এক ন্যূনতা লক্ষ্য করিলেন এবং অচিরে তাহা পূর্ণ করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। ঐ ন্যূনতা হইতেছে এই যে গঠনমূলক কার্যক্রমের মধ্যে অহিংস সমাজ গঠনের পক্ষে উপযোগী শিক্ষা-ব্যবস্থার কার্যক্রম ছিল না। স্বরাজ্যের জন্য নূতন শিক্ষা-পদ্ধতির প্রয়োজন। যে শিক্ষা কেবলমাত্র 'পররাজ্যের' পক্ষে উপযোগী তাহা লইয়া স্বরাজ্যের কাজ চলিতে পারে না। এই কথাই বিনোবাজী তাঁহার অনুপম ভঙ্গীতে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—

> "নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে পুরাতন রাজ্যের পতাকা চলিতে পারে না; উহার জন্য নূতন পতাকা চাই। সেইরূপ নূতন রাজ্যে শিক্ষাও নূতন হওয়া চাই।"

প্রচলিত শিক্ষার ত্রুটি

ইংরাজ এদেশে যে শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছিলেন স্বাধীন ভারতে আশা আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের পক্ষে উহা কেবল যে অনুপযোগী ছিল তাহা নহে, উহা তৎপক্ষে নিশ্চিত অনিষ্টকর ছিল। কারণ,—

(১) ঐ শিক্ষা-ব্যবস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ইংরাজ শাসকের গোলামী করিবার জন্য কেরাণী ও কার্য পরিচালক (এড্‌মিনিষ্ট্রেটর) নামধেয় গৌরবান্বিত কেরাণী (গ্লোরিফায়েড্‌ ক্লার্ক) সৃষ্টি করা এবং কার্যত ঐ শিক্ষার ফলও তাহাই হইয়াছে।

(২) ঐ শিক্ষা ভারতের নাগরিককে তাহার নিজ দেশের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রতি উদাসীন ও বিমুখ করিয়া দেয়।

(৩) ঐ শিক্ষায় শরীরশ্রমের কোন ব্যবস্থা না থাকায় উহা ভারতের পক্ষে বিশেষভাবে অনিষ্টকর হইয়াছে। ভারতে সাধারণভাবে শ্রমবিমুখতা রহিয়াছে, তাহার উপর ঐ শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ আরও শ্রমবিমুখ হইয়া পড়ে। শ্রমজীবিদের প্রতি তাহাদের মনে ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের ভাব সৃষ্টি হইয়া থাকে।

(৪) বৈদেশিক ভাষা ইংরাজী শিক্ষাদানের মাধ্যম হওয়ায় অধিকাংশ সময়, শক্তি ও বুদ্ধি ঐ ভাষা আয়ত্ত করিতেই ব্যয়িত হয়। তাহাতে জ্ঞানার্জনের জন্য যে সময়, শক্তি ও বুদ্ধি প্রয়োগ করা আবশ্যক তাহা সম্ভব হয় না। এই অবস্থায় শিক্ষার মান আশানুরূপ উন্নীত হওয়া সম্ভব নহে। উপরন্তু বৈদেশিক ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাকে সার্বজনীন করাও সম্ভব নহে।

(৫) ঐ শিক্ষা-পদ্ধতির দ্বারা দেশের দরিদ্রতম ও ক্ষুদ্রতম ব্যক্তি পর্যন্ত সকলকে শিক্ষিত করিয়া তোলা সম্ভব নহে।

বিনোবাজী প্রচলিত শিক্ষাকে শিক্ষা বলিতেই রাজী নহেন। তিনি বলেন,—

"এদেশে ইংরাজ রাজত্ব আরম্ভ হওয়ার পর যে শিক্ষা প্রচলন করা হয় তাহাতে কিছু ছোট দোষ ছিল আর কিছু বড় দোষও ছিল। আমি তাহা এখানে বর্ণনা করিব না। কিন্তু আমি এইটুকু বলিতে চাহি যে প্রকৃতপক্ষে উহা শিক্ষাই ছিল না। কারণ কোন প্রকার সমাজের কল্পনাকে সম্মুখে রাখিয়া ঐ শিক্ষা-ব্যবস্থা রচিত হয় নাই। যে শিক্ষা-ব্যবস্থা সমাজকে দৃষ্টিপথে রাখিয়া রচিত হয় না, উহার অন্য কোন বিশেষ প্রয়োজন থাকিতে পারে কিন্তু উহা শিক্ষা নামের যোগ্য হইতে পারে না। ইংরাজ এদেশে আসিবার সময় যে অবস্থা ছিল তাহার পরিবর্তন সাধন করিয়া তাঁহারা নূতন অবস্থা সৃষ্টি করেন। সেই পরিবর্তিত অবস্থায় ভারতে সমাজই ছিল না।"

শ্রী জে. বি. কৃপালনী তাঁহার "দি লেটেষ্ট ফ্যাড্—বেসিক এডুকেশন" নামক পুস্তিকায় ভারতের প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির প্রধান ত্রুটিগুলি কয়েকটি বাক্যের দ্বারা নিখুঁতভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন ঃ—

"ভারতের প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতি আনুষ্ঠানিক ধরণের (ফর্মাল)। জীবন ও বাস্তবের সহিত উহার বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই। যদিও

উহাকে কেবলমাত্র বৌদ্ধিক শিক্ষা বলা যায় তথাপি উহা পুরাপুরি বৌদ্ধিক শিক্ষাও নহে। সঙ্কীর্ণ অর্থেই উহাকে বৌদ্ধিক শিক্ষা বলা চলে। এই শিক্ষা-ব্যবস্থায় সংকেতেরই (সিম্‌বল) প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং সংকেত নির্দেশিত বস্তুকে অবহেলা করা হয়। ইহাতে মৌখিক বর্ণনা মাত্র করা হয় কিন্তু দৃষ্টান্ত স্বরূপ কোন স্থূল বস্তুকে (কনক্রীট অবজেক্‌ট্‌স্) উপস্থিত করা হয় না। ইহাতে লিখিত শব্দের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয় বলিয়া স্মৃতিশক্তিই ইহার প্রধান অবলম্বন। বাস্তবিক ঘটনাবলী ও ব্যবহারিক জ্ঞানের স্থান ইহাতে নগণ্য। এই শিক্ষা-পদ্ধতিতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও পরীক্ষাগারের কাজ নাই বলিলে হয়। এই শিক্ষা-পদ্ধতি নিষ্ক্রিয়, বর্ণনাত্মক ও ভাবাত্মক (প্যাসিভ্, ডেস্‌ক্রিপটিভ্ এণ্ড এব্‌স্ট্রাক্ট)। পর্যবেক্ষণ বা বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত হইতে সাধারণ সিদ্ধান্তে (ইন্‌ডাকশন) উপনীত হওয়ার পদ্ধতি প্রয়োগের অবকাশ এই শিক্ষা-পদ্ধতিতে নাই। ভৌতিক দিক হইতে ইহা প্রাণহীন। বর্ধিষ্ণু বালক-বালিকাদের উপযোগী কোন সতেজ কর্মোদ্যোগ ইহাতে নাই। ইহাতে শ্রেণী প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ থাকিয়া বালক-বালিকারা মুক্ত বাতাস, সূর্যকিরণ ও আলোক হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকে। এই শিক্ষার দ্বারা বিভিন্ন বিষয়ের যে আংশিক জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায় সেগুলি একীভূত ও সমগ্রীকৃত (ইউনিফায়েড এণ্ড্ ইনটিগ্রেটেড্) নহে। ইহাতে মানুষের সমস্ত বৃত্তির বিশেষত তাহার ইচ্ছাশক্তির বিকাশ সাধিত হয় না বলিয়া তাহার ব্যক্তিত্বেরও বিকাশ কুণ্ঠিত হইয়া থাকে। এই শিক্ষা-পদ্ধতিতে বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ হয় বলিয়া বড়াই করা হয় বটে, কিন্তু ইহাতে গোঁড়ামির প্রশ্রয় দেওয়া হইয়া থাকে।”

এই শিক্ষার পরিণাম এই যে শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকগণ যখন শিক্ষায়তনের বাহিরে আসিয়া জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় তখন তাহারা সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। অন্যদিকে যাহারা বিদ্যালয়ের শিক্ষায় অকৃতকার্য হইয়াছে এবং যাহাদিগকে শিক্ষকগণ অপদার্থ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন তাহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বহির্জীবনে কৃতকার্য হইয়া থাকে। জীবনের সংস্পর্শে তাহাদের মস্তিষ্ক ও অন্যান্য বৃত্তির বিকাশ সাধিত হইয়া থাকে এবং তাহারা উদ্যোগী ও অভিক্রমী হইতে শিখে এবং জীবন সংগ্রামে জয়ী হয়।

অন্যদিকে যাহারা বিদ্যালয়ের মধ্যে জয়ী হয় তাহারা জীবন সংগ্রামে পরাজিত হইয়া থাকে।

এই শিক্ষা পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন। ইহা জাতীয় শিক্ষা বিষয়ে আগ্রহশীল ব্যক্তি মাত্রেই তীব্রভাবে অনুভব করিতেছিলেন। এই অবস্থায় মহাত্মা গান্ধী প্রাথমিক শিক্ষা তথা জাতীয় শিক্ষা সম্পর্কে এক ক্রান্তিকারী বিচার ১৯৩৭ সালের ৩১শে জুলাই তারিখের হরিজন পত্রিকায় প্রকাশ করেন।

বুনিয়াদী শিক্ষার অরুণোদয়

তিনি ঘোষণা করেন—"শিক্ষার অর্থ আমি এই বুঝি যে বালকের শরীর, মন ও আত্মার মধ্যে যাহা কিছু উত্তম নিহিত আছে তাহার বহিঃপ্রকাশ সাধন করা। আক্ষরিক জ্ঞান শিক্ষার লক্ষ্য নহে আর উহা শিক্ষার আরম্ভও নহে। মানুষ যে সকল উপায়ে শিক্ষা লাভ করিতে পারে অক্ষর জ্ঞান তাহাদের মধ্যে অন্যতম। আক্ষরিক জ্ঞান নিজে কোন শিক্ষাই নহে। সুতরাং আমি বালক-বালিকাদিগকে কোন প্রয়োজনীয় হস্তশিল্প শিখাইতে শিখাইতে তাহার মাধ্যমে তাহাদের শিক্ষা আরম্ভ করিতে চাই। উপরন্তু আমি চাই যে, তাহাদের শিক্ষা আরম্ভ হইবার মুহূর্ত হইতেই তাহারা যেন কিছু উৎপাদনও করে। তবে রাষ্ট্রকে স্কুলের উৎপাদিত দ্রব্যাদি খরিদ করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে।

"আমার অভিমত এই যে এরূপ শিক্ষা-প্রণালীর দ্বারা মন ও আত্মার অধিকতর বিকাশ হওয়া সম্ভবপর। কিন্তু হস্তশিল্পকে বর্তমানের ন্যায় যন্ত্রবৎ শিখাইলে চলিবে না। উহা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিখাইতে হইবে। অর্থাৎ বালককে প্রত্যেকটি প্রক্রিয়া 'কেন ও কিজন্য হইতেছে' তাহা জানিতে হইবে।

"প্রাথমিক শিক্ষার উপর আমি সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব দিয়া থাকি। আমার কল্পিত প্রাথমিক শিক্ষা ইংরাজী ছাড়া বর্তমান ম্যাট্রিকুলেশনের সমান হইবে।"

তাঁহার পরিকল্পিত নূতন শিক্ষা-প্রণালীর প্রধান নীতিগুলি এই :—

(১) সমস্ত শিক্ষা কোন একটি প্রয়োজনীয় হস্তশিল্পের (ইউস্‌ফুল হ্যাণ্ডিক্রাফ্‌ট) মাধ্যমে প্রদত্ত হইবে। [এখানে প্রয়োজনীয় হস্তশিল্পের অর্থ হইতেছে এমন হস্তশিল্প যাহার দ্বারা জীবনধারণের পক্ষে আবশ্যকীয় কোন দ্রব্য উৎপাদিত হইয়া থাকে।]

(২) উক্ত শিল্পের উৎপাদিত দ্রব্যাদি হইতে স্কুলের চলতি ব্যয় নির্বাহ হইবে।

(৩) প্রাথমিক শিক্ষা ইংরাজী বাদ দিয়া ম্যাট্রিকুলেশনের সমপর্যায়ভুক্ত হইবে।*

উচ্চশিক্ষা বা কলেজের শিক্ষা সম্বন্ধেও তিনি এক বৈপ্লবিক প্রস্তাব করেন। তাঁহার প্রস্তাব ছিল যে মেকানিক্যাল ও অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রীর জন্য শিক্ষাব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিই করিবেন ও তাহার জন্য আবশ্যকীয় ব্যয়ও তাঁহারা বহন করিবেন। টাটার লৌহ কারখানার জন্য ইঞ্জিনিয়ারের প্রয়োজন হয়। তাহার জন্য তাঁহাদেরই ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ পরিচালনা করা উচিত। অন্য কারখানা সংস্থাগুলিরও তাহাদের প্রয়োজন মত বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে গ্রাজুয়েট শিক্ষণের জন্য কলেজ চালানো উচিত। আর্ট গ্রাজুয়েটের জন্য প্রাইভেট কলেজেই কাজ চলিয়া যাইবে। কৃষি কলেজ স্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়া চাই। কৃষি গ্রাজুয়েটদের জ্ঞান যেন আজকাল-কার মত ভাসা ভাসা না হয়।

গান্ধীজীর পরিকল্পনায় আলোড়ন

গান্ধীজীর এই বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনার প্রতি দেশের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইল। কারণ এই পরিকল্পনা, বিশেষত ইহার প্রথমোক্ত দুইটি নীতি ক্রান্তিকারী। উহা যথাযথ অনুসৃত হইলে প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত হইবে। প্রত্যেক প্রগতিশীল

*এই বর্ণনার দ্বারা বুনিয়াদী শিক্ষার স্বরূপ সম্পূর্ণ ও সঠিকভাবে প্রকাশিত হয় নাই। তখন দৃষ্টান্ত দ্বারা বা অল্প কথায় বুঝাইবার মত আর কিছু ছিল না। এজন্য মহাত্মা গান্ধী মোটামুটিভাবে বুঝাইবার জন্য ম্যাট্রিকুলেশনের দৃষ্টান্ত দিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ঐ শিক্ষা জীবনের শিক্ষা অর্থাৎ উহা শরীর, মন ও আত্মার শিক্ষার সুদৃঢ় বুনিয়াদ স্বরূপ হইবে। উহার স্বরূপ এই অধ্যায়ের শেষের দিকে বর্ণিত হইয়াছে।

আন্দোলনকে প্রথমদিকে বাধা ও বিরোধিতার মধ্য দিয়া যাইতে হয়। বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা সম্বন্ধেও তাহাই হইল। তবে উহার সম্বন্ধে আপত্তি ও বিরোধ উঠিবার একটি বিশেষ হেতু ছিল। সত্যাগ্রহ, অহিংসা, অসহযোগ, খাদি, পল্লীশিল্প ইত্যাদি যে সব ক্রান্তিকারী কল্পনা ও কার্যক্রম মহাত্মা গান্ধী দেশের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন তন্মধ্যে বুনিয়াদী শিক্ষা তাহার সর্বশেষ অবদান। সাধারণত কোন দার্শনিক, চিন্তানায়ক বা সমাজ সংস্কারকের কোন নূতন কল্পনা দেশ বা সমাজের কাছে উপস্থিত করিতে হইলে তিনি প্রথমে বিস্তারিত যুক্তি-তর্ক সম্বলিত বড় বড় প্রবন্ধ, থিসিস বা গ্রন্থাদি লিখিয়া জনমনকে প্রস্তুত করেন। পরে তাঁহার সিদ্ধান্ত তিনি এমনভাবে উপস্থাপিত করেন যাহাতে জনমতের উপর কোন চাপ না পড়ে। ইহার ফলে তাঁহার কল্পনা সহজভাবে গৃহীত হইবার পথ সুগম হয়। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর কার্যপ্রণালী ভিন্নরূপ ছিল।

তিনি তাঁহার কোন বৈপ্লবিক কল্পনা বা কার্যক্রম দেশের সম্মুখে উপস্থিত করিবার পূর্বে উক্ত কল্পনার পটভূমিকা বা উহার কারণ বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যা করিয়া আপত্তি বা বিরোধ খণ্ডন করিবার জন্য থিসিস বা গ্রন্থ লিখিতেন না। তিনি সরাসরি তাঁহার সিদ্ধান্তসমূহ দেশের সম্মুখে উপস্থিত করিতেন। ইহাতে জনসাধারণ প্রথমে ঘাবড়াইয়া যাইত। কোন কোন সময়ে অনর্থক ভুল ধারণার সৃষ্টি হইত ও বিরূপ সমালোচনা হইত। বিরোধিতা, আপত্তি তো উঠিতই। তখন মহাত্মা গান্ধী তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ অপূর্ব নম্রতা ও ধৈর্যের সহিত সমস্ত আপত্তি খণ্ডন করিতেন। তিনি তাঁহার যুক্তিসমূহ অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেন, কিন্তু এমনভাবে করিতেন যে তাহা তীব্র বিরোধীদেরও অন্তস্থল স্পর্শ করিত।

জনগণের সম্মুখে বিস্তৃত বিচার ও ভূমিকা না রাখিয়া তিনি তাঁহার সিদ্ধান্ত কেন উপস্থিত করিতেন? তিনি কি মনে করিতেন যে তিনি যে সিদ্ধান্ত করিবেন তাহাই দেশ নির্বিচারে মানিয়া লইবে? তাহা নহে। এরূপ মনে করিলে তাঁহার প্রতি অবিচারই করা হইবে। তিনি ছিলেন সত্যদ্রষ্টা। তিনি ছিলেন কবি। "কবি ক্রান্তদর্শী।" দেশের পক্ষে পরম কল্যাণপ্রদ ক্রান্তিকারক সিদ্ধান্তসমূহ এই সত্যদ্রষ্টা ঋষির অন্তরে আপনা আপনি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত। প্রতিভাবলে তিনি ঐ সব সিদ্ধান্তে

পৌঁছিতেন। কেবল যুক্তির দ্বারা তিনি ঐ সব সিদ্ধান্ত করিতেন না। কেবল যুক্তির দ্বারা ঐ সব সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব ছিল না।

বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা তাঁহার অন্তরে কিভাবে আসিয়াছিল সে সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন,—

"এই পত্রিকার (হরিজন) স্তম্ভে যাহা আমি অসম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করিবার প্রয়াস করিয়া আসিতেছি তাহা আকস্মিক দীপ্তি-স্বরূপ (ফ্ল্যাস) আমার অন্তরে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। উহার সত্যতা আমি দিন দিন অধিকতর উপলব্ধি করিতেছি।" (হরিজন, ২-১০-৩৭)

তাই তিনি যৎসামান্য ভূমিকা করিয়াই উপরোক্ত পরিকল্পনা দেশের সম্মুখে রাখিলেন। দেশের মধ্যে উহার ব্যাপক সমালোচনা চলিতে লাগিল। রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন শিক্ষাবিদগণের পক্ষ হইতেই অধিকতর বিরূপ সমালোচনা হইতে লাগিল।

গান্ধীজী কর্তৃক স্পষ্টীকরণ

গান্ধীজী অসীম ধৈর্যের সহিত বুঝাইতে লাগিলেন যে বর্তমান শিক্ষার সহিত মাত্র শরীরশ্রম যোগ করিয়া দেওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। তাঁহার উদ্দেশ্য হইতেছে এক প্রয়োজনীয় হস্তশিল্প (হ্যাণ্ডিক্রাফট্) বা উৎপাদক কাজের মাধ্যমে বালক-বালিকাদের সমগ্র ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করা। তিনি বলেন,—

"আমার কল্পনার সার এই যে উহাতে যে হস্তশিল্প শিক্ষা দেওয়া হইবে তাহা কেবলমাত্র উৎপাদন করিবার উদ্দেশ্যেই শিক্ষা দেওয়া হইবে না। শিক্ষার্থীর বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ সাধন করার উদ্দেশ্যে উহা শিখানো হইবে।" (হরিজন, ১১-৯-৩৭)

কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এরূপ আপত্তি উঠে যে উহাতে বিদ্যাবত্তা বা পুস্তকের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনকে (লিটারেসী) অবহেলা করা হইয়াছে। ইহার উত্তরে গান্ধীজী বলেন,—

"আমি যাহা লিখিয়াছি তাহাতে এরূপ ধারণা জন্মিবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। আমি তো বলিয়াছি যে আমার কল্পিত বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ হস্তশিল্প শিক্ষণের মাধ্যমে সর্ববিধ বিদ্যার্জন করিবে। আক্ষরিক

জ্ঞানও তাহার অন্তর্ভুক্ত। এই পরিকল্পনায় বালকদের হাত অক্ষরের ছবি আঁকিবার পূর্বেই হস্তযন্ত্র ব্যবহার করিতে শিখিবে। তাহারা অন্যান্য জিনিস শিখিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের চোখ অক্ষর ও শব্দের ছবি পড়িতে ও বুঝিতে শিখিবে। তাহাদের কান শব্দ ও বাক্যাবলীর অর্থ ধরিয়া লইবে। সমগ্র শিক্ষা ইহার দ্বারা স্বাভাবিক উপায়ে, আশানুরূপভাবে, সর্বাপেক্ষা ত্বরিত গতিতে ও কম খরচে হইবে।" (হরিজন, ২৮-৮-৩৭)।

তাঁহার কাছে নামবিহীন প্রবন্ধ পাঠাইয়াও তাঁহার শিক্ষা-পরিকল্পনার তীব্র সমালোচনা করা হইয়াছিল। এরূপ এক নামবিহীন প্রবন্ধে গান্ধীজীর পরিকল্পিত বিদ্যালয়ের বালক-বালিকাদিগকে সিংহলের চা ও রবার ক্ষেতের অর্ধ-ক্রীতদাসের সহিত তুলনা করা হয়। তাহার উত্তরে গান্ধীজী লিখেন,—

"আমার কল্পিত বিদ্যালয়ের বালকদিগকে সিংহলের উদ্যানের অর্ধ-ক্রীতদাস বালকদের সহিত তুলনা করিয়া প্রবন্ধ লেখক নিজেকেই ধিক্কৃত করিয়াছেন। তিনি ভুলিয়া যাইতেছেন যে সিংহলের রবার ক্ষেতের বালকদিগকে ছাত্র বলিয়া গণ্য করা হয় না। তাহাদের শ্রমকে তাহাদের শিক্ষার অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করা হয় না। আমি যে বিদ্যালয়ের কথা বলিতেছি তাহাতে হাইস্কুলে যে শিক্ষা দেওয়া হয় ইংরাজী বাদে তৎসমস্তই শিক্ষা দেওয়া হইবে। উপরন্তু ছাত্রেরা ড্রিল, সঙ্গীত ও অঙ্কন শিখিবে। আর হস্তশিল্প তো শিখিবেই। এই সব বিদ্যালয়কে কারখানা বলিয়া আখ্যাত করার অর্থ সত্যের অপলাপ করা মাত্র। প্রবন্ধ লেখক সেই ব্যক্তির মত যিনি বানর ব্যতীত আর কোন প্রাণী দেখেন নাই এবং মানুষের আকৃতির সহিত বানরের আকৃতির কিছুটা সাদৃশ্য আছে বলিয়া মানুষের বর্ণনা সঠিকভাবে করিতে অস্বীকার করিয়া মানুষকে বানরের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন।" (হরিজন, ১৮-৯-৩৭)

তাঁহার কল্পনা স্পষ্টতর করিয়া তিনি লিখেন যে তিনি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাকে একীভূত করিতে চাহেন। হাইস্কুলে ইংরাজীর আধা কাঁচা জ্ঞান এবং গণিত, ইতিহাস ও ভূগোলের ভাসা ভাসা জ্ঞান ছাড়া আর কিছুই হয় না। উহা হইতে ইংরাজী বাদ দিলে ৭ বৎসরের মধ্যেই

বুনিয়াদী শিক্ষা সমাপ্ত করা যাইবে। এজন্য ৭ হইতে ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমের পরিকল্পনা করার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

হাতের কাজ শিক্ষা করার মাধ্যমে কিভাবে অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞানলাভ হইতে পারে তাহা তিনি এক পত্রে ব্যাখ্যা করেন। তাহাতে তিনি লিখেন,—

"যদি কোন সূত্রধর আমাকে কাঠের কাজ শিখান তাহা হইলে তাঁহার নিকট হইতে আমি উহা কেবলমাত্র যন্ত্রবৎ (মেকানিক্যালী) শিখিবার সুযোগ পাইব। তাহার বিভিন্ন যন্ত্রের ব্যবহার মাত্র শিখিতে পারিব। কিন্তু তাহাতে আমার বুদ্ধির বিশেষ বিকাশ হইবে না। কিন্তু যে ব্যক্তির কাঠের কাজের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আছে, সে ব্যক্তি যদি আমাকে শিক্ষা দেয় তবে তাহাতে আমার বুদ্ধির বিকাশ হইবে। তাহাতে আমি দক্ষ সূত্রধর হইতে পারিব ; উপরন্তু আমি একজন ইঞ্জিনিয়ার রূপে গড়িয়া উঠিব। কারণ সেই বিশেষজ্ঞ আমাকে গণিতও শিখাইবেন। তিনি বিভিন্ন প্রকারের কাঠের মধ্যে পার্থক্য কি এবং কোথা হইতে তাহা আমদানী হইয়া থাকে তাহাও আমাকে শিক্ষা দিবেন। এরূপে ভূগোল ও কৃষি সম্বন্ধীয় কিছু জ্ঞানও আমার লাভ হইবে। তিনি আমাকে যন্ত্রের মডেল অঙ্কন করিতে শিক্ষা দিবেন এবং প্রাথমিক জ্যামিতি ও পাটিগণিতও শিখাইবেন। সম্ভবত হাতের কাজের সহিত বৌদ্ধিক শিক্ষার অনুবন্ধ (কোরিলেশন) কিরূপে করিতে হয় তাহা আপনি জানেন না। আমি নিশ্চয়ই স্বীকার করিব যে বৌদ্ধিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে হাতের কাজও শিক্ষা দিতে হইবে। একথা আমি বহুদিন যাবৎ বলিয়া আসিয়াছি এবং জাতীয় শিক্ষায় উহার একটি প্রধান স্থান থাকা উচিত—একথাও আমি এতদিন বলিয়া আসিয়াছি। কিন্তু আমি এখন বলিতেছি যে হাতের কাজ শিক্ষা মস্তিষ্ক বিকাশের প্রধান উপায় হওয়া উচিত। আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি তাহার কারণ আমাদের ছেলেদের মস্তিষ্ক নষ্ট হইতেছে। আমাদের ছেলেরা স্কুল হইতে বাহির হইবার পর কিছু করিবার পথ পায় না। যে শিক্ষা ছাত্রগণের আধ্যাত্মিক, বৌদ্ধিক ও দৈহিক শক্তির বিকাশ করে ও তাহাদিগকে বাহিরে প্রকাশ করিবার সুযোগ দেয় তাহাই যথার্থ শিক্ষা। এই শিক্ষা ছাত্রদের পক্ষে বেকার-বীমা সদৃশ হইবে।" (হরিজন, ৯-৯-৩৭)

অনুবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষার উৎকর্ষ কোথায় তাহা আর একটু ভালভাবে বুঝিয়া লওয়া প্রয়োজন। ভাষা, অঙ্ক, ভূগোল, ইতিহাস প্রভৃতি পাঠ্য বিষয় কাজের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হইলে শিক্ষা সজীব হয়। বালক যাহা নিজের হাতে গড়িল বা করিল, সে সম্বন্ধে তাহাকে লিখিত বা মৌখিক বর্ণনা করিতে বলিলে তাহার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে তাহা লেখা বা বলা তাহার পক্ষে অনেক সহজ হইবে। কিন্তু যে বিষয়ে তাহার সাক্ষাৎ বা বাস্তব অভিজ্ঞতা নাই সেই সম্বন্ধে লিখিতে বা বলিতে গেলে সে অন্যের অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি করিতে বাধ্য হয়। সেক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে উহা তাহার শিক্ষা বা জ্ঞান নহে। উহা তাহার স্মরণশক্তির পরীক্ষা ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। তৎপরিবর্তে যদি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর ভাষা, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদির জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয়—তবে ভবিষ্যতে তাহার চিন্তার সুস্পষ্টতা আসিবে এবং ভুল হইবার সম্ভাবনাও কম থাকিবে। স্মৃতির দিক হইতেও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর আধারিত জ্ঞান স্মরণ রাখা সহজ হইবে। কারণ উহাতে স্মৃতির আধারের জন্য যে সংযোগের (এসোসিয়েশন) প্রয়োজন তাহা বিশেষভাবে থাকিবে আর সেই সংযোগ (এসোসিয়েশন) হইতেছে তাহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। এইজন্য হাতের কাজকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষাদান করিলে বালক যে শুধু একটি প্রয়োজনীয় হস্তশিল্প শিক্ষা করিতে পারিবে তাহাই নহে, উহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কেও তাহার সজীব জ্ঞানলাভ হইবে।

যুক্তি-তর্কের দ্বারা সমালোচকগণের সন্দেহ ভঞ্জন করিবার চেষ্টা করা অপেক্ষা প্রয়োগের দ্বারা সফলতা দেখাইয়া সংশয়ীগণের সংশয় দূর করিবার দিকে মহাত্মা গান্ধী বেশী গুরুত্ব আরোপ করিতেন। এজন্য তিনি তাঁহার পরিকল্পনার প্রয়োগ তাড়াতাড়ি শুরু করিবার দিকে মন দিলেন। কোন কল্পনা স্থানবিশেষে প্রয়োগ করিয়া যদি আংশিক সফলতাও অর্জন করা যায়, তবে তাহা শত যুক্তি ও শতবার বুঝানো অপেক্ষা অধিক কার্যকরী হইয়া থাকে।

ভূদানযজ্ঞ ও গ্রামদান আন্দোলনের ক্ষেত্রে এরূপ দেখা গিয়াছে। যদি ৪০ লক্ষ একর ভূমিদান ও তিন সহস্রাধিক গ্রামদান না পাওয়া যাইত তবে

ইয়েলওয়ালে সর্বদলীয় গ্রামদান-সম্মেলন হওয়া সম্ভব হইত না। আর দেশের নেতৃবৃন্দও সর্বসম্মতিক্রমে গ্রামদান আন্দোলন সমর্থন করিয়া উহা সফল করিবার জন্য আবেদন করিতেন না। বহু প্রকারে দেশের সর্বত্র বিচার প্রচার করা হইলেও এরূপ কাজ হইত না।

প্রথম নিখিল ভারত জাতীয় শিক্ষা সম্মেলন, ওয়ার্ধা

ওয়ার্ধার নব ভারত বিদ্যালয়ের (পূর্ব নাম মারওয়ারী হাইস্কুল) রজত-জয়ন্তী অনুষ্ঠান চলিতেছিল। উহার পরিচালকগণ ঐ উপলক্ষে গান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনা সম্বন্ধে বিচার বিবেচনা করার উদ্দেশ্যে জাতীয় মনোভাবাপন্ন শিক্ষাবিদগণের একটি ক্ষুদ্র সম্মেলন আহ্বান করার কথা চিন্তা করিলেন। ঐ বিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রীশ্রীমন্নারায়ণ অগ্রবাল মহাত্মা গান্ধীর নিকট ঐ শিক্ষা-সম্মেলনের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন এবং মহাত্মা গান্ধীকে উক্ত সম্মেলনের সভাপতিত্ব করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। মহাত্মা গান্ধী উভয় প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন।

১৯৩৭ সালের ২২শে ও ২৩শে অক্টোবর ওয়ার্ধায় নিখিল ভারত জাতীয় শিক্ষা-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন নিমন্ত্রিতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হইয়াছিল। বিভিন্ন প্রদেশে যাঁহারা জাতীয় শিক্ষার বিষয়ে উদ্যোগী ও আগ্রহশীল ছিলেন তাঁহারা সম্মেলনের প্রতিনিধি হইয়াছিলেন। উপরন্তু যে ৭টি প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইয়াছিল, সেই সমস্ত প্রদেশের শিক্ষামন্ত্রীগণও সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন।

সম্মেলনের সভাপতি মহাত্মা গান্ধী তাঁহার জাতীয় শিক্ষার পরিকল্পনা সম্মেলনের সমক্ষে উপস্থিত করেন। সম্মেলনে উহার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি নূতন যাহা বলেন ও প্রস্তাব করেন তাহা হইতেছে :—

(১) প্রাথমিক শিক্ষার (ম্যাট্রিকুলেশন পর্যন্ত যতদূর শিক্ষা দেওয়া হয় ইংরাজী ব্যতীত তাহা) সময়ক্রম অন্তত ৭ বৎসরের হওয়া চাই।

(২) বালক-বালিকাদের যে বুনিয়াদী শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হইবে তাহাতে শিক্ষার্থীরা যাহা উৎপাদন করিবে তাহার দ্বারা তাহাদের শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ হইবার যে কল্পনা করা হইয়াছে তাহাতে কেবল

শিক্ষকের বেতনই ধরা হইবে। জমি, ঘরবাড়ী ও আসবাবপত্র বাবদ ব্যয় উহার মধ্যে ধরা হইবে না।

(৩) তকলীতে সুতাকাটাকে বুনিয়াদী শিল্প স্বরূপ গ্রহণ করা সমীচীন হইবে। কারণ বস্ত্রশিল্প-শিক্ষার ব্যবস্থা দেশের সর্বত্র করিতে পারা যাইবে। উপরন্তু তকলী খুবই সস্তা। দেশের বর্তমান শোচনীয় অবস্থা বিবেচনায় সমস্যা সমাধানের একমাত্র ব্যবহারিক উপায় হইতেছে তকলী।

(৪) তিনি বলেন যে তিনি যে পরিকল্পনা উপস্থিত করিতেছেন তাহার দৃষ্টিভঙ্গী নূতন বটে, কিন্তু এই বিচার সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা পুরাতন। দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালীন 'টলষ্টয় ফারম'এ তিনি তাঁহার পুত্রগণকে কাঠের কাজ ও জুতা তৈয়ারীর কাজের মাধ্যমে শিক্ষাদান করিতেন। জুতা তৈয়ারীর কাজ তিনি শ্রীক্যালেনবাক-এর নিকট হইতে শিখিয়াছিলেন।

(৫) প্রাথমিক ও উচ্চ (কলেজের) শিক্ষা উভয়ই তাঁহার পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত বটে, কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হইবে।

আর্থিক স্বাবলম্বন সম্পর্কে আপত্তি

পরিকল্পনা সম্পর্কে সম্মেলনে যে আলোচনা চলে তাহা খুবই গাম্ভীর্যপূর্ণ হইয়াছিল। ইংরাজী ব্যতীত মাধ্যমিক শিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত ও সমগ্র শিক্ষা কোন উৎপাদক হাতের কাজের মাধ্যমে প্রদত্ত হওয়া উচিত এ সম্বন্ধে সম্মেলনে সকলেই একমত ছিলেন। কিন্তু শিক্ষার্থীদের উৎপাদিত দ্রব্যাদি দ্বারা শিক্ষার ব্যয় নির্বাহের প্রশ্ন সম্পর্কে আপত্তি ও সমালোচনা হইয়াছিল। এমন কি শিক্ষকের বেতন মাত্র বিষয়ে বিদ্যালয়ের স্বাবলম্বন সীমিত রাখিবার যে সংশোধিত প্রস্তাব মহাত্মা গান্ধী করিয়াছিলেন সে সম্পর্কেও সকলে সম্মত হইতে পারেন নাই। সুতরাং সম্মেলনে ঐ সম্পর্কে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহা সতর্কতাসূচক ভাষায় রচিত হইয়াছিল। উহা এই :—

'এই সম্মেলন আশা করে যে এই শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা ক্রমে ক্রমে শিক্ষকের বেতনের খরচ উঠানো যাইতে পারিবে।'

"আশা করে" ও "ক্রমে ক্রমে" শব্দগুলির দ্বারা এ সম্পর্কে সম্মেলনের সতর্কতা প্রকাশ পাইয়াছে। এ সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী তাঁহার হরিজন পত্রিকায়

মন্তব্য করেন যে সম্মেলনকে অন্ধকারে হাতড়াইতে হইয়াছে। কারণ সম্মুখে কোন পরিপূর্ণ নজীর ছিল না। এজন্য সম্মেলনকে এইরূপ সতর্কতা জ্ঞাপক সিদ্ধান্ত করিতে হইয়াছে। যাহা হউক, যদি এই বিচার নির্ভুল হয় তবে প্রয়োগের দ্বারা তাহা বুঝা যাইবে। এজন্য স্বাবলম্বী শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে যাঁহাদের বিশ্বাস আছে তাঁহাদের সেই আদর্শ অনুযায়ী বিদ্যালয় পরিচালনা করিয়া অভীষ্ট ফল প্রদর্শন করিতে হইবে। পরিকল্পনার অন্যান্য অংশ সম্মেলন পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সহিত সমর্থন করেন। যথা :—

(১) সম্মেলন এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে দেশের সর্বত্র সাত বৎসর অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হউক ;

(২) মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করা হউক ;

(৩) সাত বৎসরকাল যাহা কিছু শিক্ষা দিতে হইবে তাহা কোন উৎপাদক হাতের কাজের মাধ্যমে দেওয়া উচিত ও বালক-বালিকাগণের অন্য যে সব গুণের বিকাশ সাধন করিতে হইবে বা তাহাদিগকে অন্য যে সব শিক্ষা দেওয়া হইবে তাহা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইয়া করিতে হইবে।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। সম্মেলনে ডঃ জাকির হোসেন সাহেব তাহার বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে মহাত্মা গান্ধী কাজের মধ্য দিয়া শিক্ষাদানের যে কল্পনা দিয়াছেন তাহা কোন নূতন কল্পনা নহে। তিনি বলেন,—

"তাঁহারা জানেন, কাজের মাধ্যমেই প্রকৃত শিক্ষাদান করা যাইতে পারে। তাঁহারা এ-ও জানেন, নগর-সভ্যতায় অথবা গ্রাম-সভ্যতায় কিংবা অহিংসায় যাহাতেই বিশ্বাস থাকুক না কেন একমাত্র কাজের মধ্য দিয়াই বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেওয়া উচিত।"

তিনি আরও বলেন যে কাজের মাধ্যমে শিক্ষাদান প্রণালীকে আমেরিকায় প্রোজেক্ট্ মেথড্ ও রাশিয়ায় কম্প্লেক্স্ মেথড্ বলা হয়।

বিনোবাজী সম্মেলনে তাঁহার বক্তৃতায় ডঃ জাকির হোসেন সাহেবের এই মন্তব্যের উত্তর প্রদান করেন। তিনি বলেন যে হাতের কাজের মধ্য দিয়া শিক্ষাদানের কল্পনা নূতন নহে বটে, কিন্তু মহাত্মা গান্ধী উহাতে এক নূতন আলোকপাত করিয়াছেন।

পাঠ্যক্রম সমিতি

উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে যে মহাত্মা গান্ধী তাঁহার পরিকল্পিত পদ্ধতির প্রয়োগ যথাসম্ভব শীঘ্র করাইতে চাহিতেছিলেন। সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা শ্রীশ্রীমন্নারায়ণের 'এন্টেরিক ফিভার' (আন্ত্রিক জ্বর) হওয়ার কারণে সম্মেলন পিছাইয়া দিবার প্রস্তাবে গান্ধীজী কিছুতেই সম্মত হন নাই। দীর্ঘকাল মৌনাবলম্বন করিয়া তিনি সম্মেলনের জন্য শক্তি সঞ্চয় করেন। তাড়াতাড়ি প্রয়োগের কাজ আরম্ভের জন্য তিনি কত আগ্রহশীল ছিলেন তাহা ইহাতে বুঝা যায়।

সম্মেলন শেষে বক্তৃতায় তিনি সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাবলীর ভিত্তিতে বিস্তৃত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ পাঠ্যক্রম রচনা করিবার জন্য একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেন। তদনুসারে পুঙ্খানুপুঙ্খ পাঠ্যক্রম রচনার জন্য ডঃ জাকির হোসেনের অধ্যক্ষতায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি কমিটি গঠন করা হয় ও সম্মেলনের অধ্যক্ষ মহাত্মা গান্ধীর নিকট একমাসের মধ্যে উক্ত কমিটির রিপোর্ট পেশ করিবার জন্য অনুরোধ করা হয়: (১) ডঃ জাকির হোসেন (চেয়ারম্যান), (২) শ্রী এড্ওয়ার্ড উইলিয়ম আর্যনায়কম্ (আহ্বায়ক), (৩) শ্রীখাজা গুলাম সৈয়িদ্দিন, (৪) আচার্য বিনোবা ভাবে, (৫) শ্রী জোসেফ কর্ণেলিয়স্ কুমারাপ্পা, (৬) শ্রীকৃষ্ণদাস জাজু, (৭) শ্রী কে. টি. সাহা ও (৮) শ্রীআশা দেবী।

ডঃ জাকির হোসেন বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষাবিদ্। বর্তমানে তিনি এক রাজ্যের রাজ্যপাল। প্রথম জীবনে তিনি আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। ১৯২০ সালে অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলনের সময় তিনি মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে সরকারী শিক্ষা-সংস্থার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া চলিয়া আসেন এবং দিল্লীতে জামিয়া-মিলীয়া ইসলামিয়া নামে একটি জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। উহা দেশের এক বিখ্যাত জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। তিনি নিজে উহার অধ্যক্ষ ছিলেন। ঐ সংস্থা গড়িয়া তুলিতে তাঁহাকে অনেক দুঃখকষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। জাতীয় শিক্ষার উন্নতি সাধনের জন্য তিনি তপস্যা ও ত্যাগ বরণ করেন।

তালীমী সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা

১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কমিটি মহাত্মা গান্ধীর হস্তে রিপোর্ট দাখিল করেন। মহাত্মা গান্ধী কমিটির নির্ণীত পরিকল্পনা ও পাঠ্যক্রম অনুমোদন করেন ও উহা বিবেচনার্থ কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির নিকট পেশ করেন। ১৯৩৮ সালের মার্চ মাসে কংগ্রেসের হরিপুরা অধিবেশনে উক্ত বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনাকে জাতীয় শিক্ষার কার্যক্রমস্বরূপ গ্রহণ করা হয়। ঐ সম্পর্কে কংগ্রেসে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয় :—

"কংগ্রেস ১৯০৬ সাল হইতে বরাবর জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব অর্পণ করিয়া আসিতেছে। অসহযোগ আন্দোলনের সময় কংগ্রেসের আনুকূল্যে অনেক জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। জনগণের শিক্ষার সুষ্ঠু সংগঠন হউক ইহা কংগ্রেস সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচনা করে। কংগ্রেসের অভিমত এই যে দেশের জনগণের জন্য যে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় শেষ পর্যন্ত তাহার প্রণালী, স্বরূপ ও লক্ষ্যের উপর সর্বপ্রকার জাতীয় উন্নতি নির্ভর করে। প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থা বিফল হইয়াছে ইহা স্বীকার্য। উহা সেকেলে হইয়া গিয়াছে। এই শিক্ষা অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ইহাতে দেশের অধিকাংশ লোককে নিরক্ষর থাকিতে হইয়াছে। সুতরাং জাতীয় শিক্ষা নূতন ভিত্তির উপর ও দেশব্যাপী করিয়া গড়িয়া তোলা অত্যাবশ্যক। কংগ্রেস বর্তমানে সেবার নূতন সুযোগ পাইয়াছে। সরকারী শিক্ষার উপর প্রভাব বিস্তার করা ও উহা নিয়ন্ত্রণ করার অধিকারও কংগ্রেস লাভ করিয়াছে। এজন্য জাতীয় শিক্ষা কিরূপ নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়া উচিত এবং উহা কার্যে পরিণত করিবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক তাহা নির্ণয় করা প্রয়োজন। কংগ্রেসের অভিমত এই যে প্রচলিত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার স্থলে নিম্নলিখিত নীতি অনুসারে বুনিয়াদী শিক্ষা (বেসিক এডুকেশন) প্রদত্ত হওয়া উচিত :—

(১) দেশের সর্বত্র বালক-বালিকাদিগের জন্য সাত বৎসরকাল বিনা খরচে বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(২) মাতৃভাষা অবশ্যই শিক্ষাদানের মাধ্যম হইবে।

(৩) ঐ সাতবৎসর কোন উৎপাদক হাতের কাজকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষাদান করিতে হইবে।

ছাত্রগণের পরিবেশের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া উক্ত মূল হস্তশিল্প নির্বাচন করিতে হইবে এবং উহার সহিত অন্যান্য কার্যক্রম ও শিক্ষাদানের সমন্বয় সাধন করিতে হইবে।

"সুতরাং কংগ্রেসের অভিমত এই যে শিক্ষার বুনিয়াদী ভাগ পরিচালনা করিবার জন্য নিখিল ভারত শিক্ষা বোর্ড গঠন করা হউক। ডঃ জাকির হোসেন ও শ্রীএডওয়ার্ড উইলিয়ম আর্যনায়কমের হস্তে উক্ত বোর্ড মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ও পরামর্শ অনুসারে গঠন করিবার ক্ষমতা অর্পণ করা যাইতেছে। উক্ত বোর্ড বুনিয়াদী জাতীয় শিক্ষার কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী করিবেন ও সরকারী ও বে-সরকারী শিক্ষা-কর্তৃপক্ষের দ্বারা উহা অনুমোদন করাইবার সুপারিশ করিবেন।

"নিজের গঠনতন্ত্র রচনা করিবার, অর্থসংগ্রহ করিবার এবং উহার উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য যাহা কিছু করা প্রয়োজন তাহা করিবার ক্ষমতা উক্ত বোর্ডের থাকিবে।"

তদনুসারে তাঁহারা ১৯৩৮-এর এপ্রিল মাসে হিন্দুস্তানী তালীমী সংঘ গঠন করেন। উহার প্রধান কার্যালয় সেবাগ্রামে স্থাপিত হয়।

জাকির হোসেন কমিটির রিপোর্ট

জাকির হোসেন কমিটির রিপোর্টের কয়েকটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা হইল। তাহাতে গান্ধী কল্পিত শিক্ষা-পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্যক উপলব্ধি করা যাইবে। কমিটি সূতাকাটা ও বস্ত্র-বয়ন সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ পাঠ্যক্রম প্রস্তুত করেন। সময় অভাবে অন্য কোন হস্তশিল্পের শিক্ষাক্রম তাঁহারা প্রস্তুত করিতে পারেন নাই। পরে তাঁহারা বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্যক্রম এবং কৃষি, বাগিচা ও কাঠের কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ পাঠ্যক্রম প্রস্তুত করেন। এগুলি ছাড়া তাঁহারা খেলনা তৈয়ারি, চামড়ার কাজ ও কাগজ তৈয়ারিকেও বুনিয়াদী শিল্প হিসাবে সুপারিশ করেন এবং বলেন যে, অন্য যে কোন শিল্প স্থানবিশেষের পক্ষে উপযোগী গণ্য হইলে তাহাও বুনিয়াদী হস্তশিল্প রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

ভারতের বর্তমান প্রচলিত শিক্ষা-প্রণালী সম্পর্কে কমিটির রিপোর্টের মন্তব্য খুবই মূল্যবান। উহাতে বলা হইয়াছে যে ভারতের শিক্ষা-প্রণালীকে সকলেই প্রায় একবাক্যে নিন্দা করিয়া থাকে। উহা জাতীয় জীবনের জরুরী প্রয়োজনসমূহ মিটাইতে সমর্থ নহে। উহা জাতির শক্তি ও আশা আকাঙ্ক্ষাকে ঠিক পথে পরিচালিত করিতে অক্ষম। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে দ্রুত সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন হইতেছে তাহার পরিপ্রেক্ষিতে উহা সম্পূর্ণ অনুপযোগী। কোন সজীব ও সৃজনাত্মক আদর্শ উহার মধ্যে নাই। যাহাতে শোষণ ও হিংসার উপর অধিষ্ঠিত বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক মানবতাবিরোধী ব্যবস্থার পরিবর্তে এক সহযোগী মানবতামূলক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিবার পথে বিশেষভাবে সহায়ক হইতে পারে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সেইরূপ হওয়া উচিত। কিন্তু বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে সেরূপ কোন কল্পনাই নাই।

কমিটির সুচিন্তিত অভিমত এই যে যাহাতে এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা-পদ্ধতির অন্ধ অনুকরণ না হয় সেই ভাবে বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে। পাশ্চাত্য শিক্ষা-পদ্ধতি হইতে উহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হওয়া চাই। কারণ পাশ্চাত্য দেশের পথ হইতেছে ভিন্ন। ভারতবর্ষ সর্বাঙ্গীন স্বাধীনতা ও শান্তির উপায় স্বরূপ অহিংসার পথ বাছিয়া লইয়াছে। এই অবস্থায় এই দেশের সুকুমারমতি বালক-বালিকাদিগকে অহিংসার শ্রেষ্ঠত্ব ও হিংসার ন্যূনতা সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া অত্যাবশ্যক।

শিক্ষাদানে শিল্প-শিক্ষার স্থান সম্পর্কে কমিটি মন্তব্য করেন যে শিক্ষা সম্পর্কীয় আধুনিক চিন্তাধারা উৎপাদক হাতের কাজের মাধ্যমে শিক্ষাদান করিবার বিশেষ পক্ষপাতী। কারণ ইহার দ্বারাই অখণ্ড ও সর্বাঙ্গীন শিক্ষালাভ সম্ভব। কমিটি বিভিন্ন দিক হইতে এই নূতন শিক্ষা-পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব ব্যাখ্যা করেন। কমিটি বলেন যে :—

(১) মনস্তাত্ত্বিক দিক হইতে এই শিক্ষা-প্রণালী গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। কারণ ইহা নিছক পুঁথিগত ও কাল্পনিক শিক্ষার অত্যাচারের হাত হইতে শিক্ষার্থীদিগকে রক্ষা করিবে। ইহা বৌদ্ধিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করিবে ও উহাদের সমন্বয় সাধন করিবে। এই শিক্ষার দ্বারা গঠনমূলক উদ্দেশ্যে হাত ও বুদ্ধির সদ্ব্যবহার করিবার প্রকৃত সামর্থ্য লাভ

হয়, ভাসা ভাসা বিদ্যাবত্তা অর্থাৎ মুদ্রিত পুস্তক পড়িতে পারা মাত্র নহে। ইহার দ্বারা সমগ্র ব্যক্তিত্বের বিদ্যাবত্তা (লিটারেসী অফ দি হোল পারসন্যালিটী) লাভ হইয়া থাকে।

(২) সামাজিক দৃষ্টিতে এই শিক্ষা-প্রণালীর উৎকর্ষ এই যে ইহাতে দেশের সকল বালক-বালিকাকে উৎপাদক শরীর শ্রমের কাজ করিতে হইবে। তাহার ফলে শ্রমজীবী ও বুদ্ধিজীবীর মধ্যে ভেদভাব দূরীভূত হইবে। ইহা সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হইবে। শরীর শ্রমের মর্যাদা ও সমাজে একাত্মবোধ প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহার নৈতিক ফল অপরিসীম।

(৩) অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে এই শিক্ষায় আমাদের দেশের শ্রমজীবীদের উৎপাদনশক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। তাহারা অবসর সময়েরও সদ্ব্যবহার করিতে পারিবে।

(৪) নিছক শিক্ষার দৃষ্টিতে শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞানে বাস্তবতা আসিবে। বাস্তব জীবনের সহিত শিক্ষার সম্পর্ক স্থাপিত হইবে। জ্ঞানের বিভিন্ন দিকের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইবে।

কিন্তু এইসব গুণ পূর্ণভাবে লাভ করিতে হইলে এমন বুনিয়াদী শিল্প নির্বাচন করা প্রয়োজন যাহার মধ্যে সর্বপ্রকার শিক্ষাদানের পক্ষে প্রচুর সম্ভাবনা নিহিত আছে। অর্থাৎ মানুষের বিবিধ কর্মপ্রচেষ্টা এবং মানুষের পক্ষে আকর্ষণীয় বিভিন্ন বিষয়ের সহিত যাহার অনুবন্ধ পাওয়া যাইবে এবং তাহার ফলে যাহা বিদ্যালয়ের নির্ধারিত সমস্ত পাঠ্যক্রমের মধ্যে সম্প্রসারিত হইতে পারিবে।

দ্বিতীয়ত ইহা বুঝিতে হইবে যে যন্ত্রবৎ (মেকানিক্যালী) শিল্প শিক্ষা করিলে ইহার উদ্দেশ্য আদৌ সফল হইবে না। মূল শিল্প এমনভাবে শিক্ষা করিতে হইবে, যাহাতে শিখিবার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া পাঠ্যক্রমের অন্য সব বিষয়ই আসিয়া যায়। অর্থাৎ ইহা বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া (ইন্‌টেলি-জেণ্টলী) শিখিতে হইবে। এই দুই সর্ত যদি যথাযথভাবে পালিত হয়, তবেই শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষালাভের সুফল পাওয়া যাইবে। নচেৎ যন্ত্রবৎ শিল্প শিক্ষা করিলে অন্যান্য পাঠ্যক্রমের সহিত আর একটি বিষয় যোগ করার মতই হইবে।

কমিটি এই শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে গভীর ভাবে বিচার বিবেচনা করিয়া মন্তব্য করেন যে এই শিক্ষা পরিকল্পনার মধ্যে প্রকৃত নাগরিকতার আদর্শ নিহিত রহিয়াছে। এই শিক্ষায় যিনি শিক্ষিত হইবেন তিনি নাগরিক হিসাবে তাঁহার কর্তব্য ও দায়িত্ব উভয়ই উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন। উহা তাঁহাকে পরাবলম্বী ও শোষক হওয়ার গ্লানি হইতে মুক্ত করিবে। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে উহা তাঁহাকে প্রকৃত গণতন্ত্রের পাঠ শিক্ষা দিবে।

এই শিক্ষা-ব্যবস্থায় কতদূর স্বাবলম্বন সম্ভব সে সম্বন্ধেও কমিটি বিবেচনা করেন। কমিটি বলেন যে এই শিক্ষা-ব্যবস্থা আর্থিক দিক হইতে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী না হইতে পারিলেও শিক্ষানীতি হিসাবে এবং জাতীয় পুনর্গঠনের জরুরী উপায় স্বরূপ ইহা যে সম্পূর্ণ নিখুত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে ইহা নিশ্চিত যে শিক্ষাদানের প্রক্রিয়ায় এমন আয় হইবে যাহাতে বিদ্যালয়ের চলতি খরচের অধিকাংশই মিটানো যাইবে। তাঁহারা সূতাকাটা ও বস্ত্রবয়নের যে বিস্তারিত পাঠ্যসূচী প্রস্তুত করেন তাহাতে আয়ের হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে বিদ্যালয়ের চলতি ব্যয়ের অধিকাংশই উহার দ্বারা মিটানো যাইবে। তবে সরকারকে বিদ্যালয়ের উৎপন্ন দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া লইবার দায়িত্ব লইতে হইবে। মহাত্মা গান্ধীও এই কথা বলিয়াছিলেন।

প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা

হিন্দুস্তানী তালীমী সঙ্ঘ গঠিত হওয়ায় বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনাকে শীঘ্র কার্যে পরিণত করিবার দায়িত্ব উহার উপর আসিয়া পড়িল। দেশের সকল বালক-বালিকাকে নূতন পদ্ধতিতে শিক্ষিত করিয়া তোলা বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনার লক্ষ্য। কিন্তু দেশের ৭ লক্ষ গ্রামে অবিলম্বে উহার ব্যবস্থা করা এবং উহা সকলের গ্রহণীয় করা কি সম্ভব? ইহা মনে রাখিয়া মহাত্মা গান্ধী ওয়ার্ধা শিক্ষা সম্মেলনে বলিয়াছিলেন যে এই পরিকল্পনাকে বাধ্যতামূলক ও সার্বজনীন না করিলে উহা দেশের সর্বত্র সকলের গ্রহণীয় করা সম্ভব নহে। এজন্য গবেষণাগারে পরীক্ষার দ্বারা এই নূতন পদ্ধতির সার্থকতা প্রথমে প্রমাণ করা আবশ্যক। অতঃপর উহাকে বাধ্যতামূলক ও সার্বজনীন করিবার জন্য দাবী করা যাইতে পারে।

এজন্য নব গঠিত তালীমী সংঘ প্রথমেই এই পরীক্ষামূলক কাজে ব্রতী হইলেন।

প্রয়োগের আরম্ভ

এই কাজ সম্পাদনের জন্য তালীমী সঙ্ঘ, সরকারী ও বে-সরকারী শিক্ষা-সংস্থাসমূহ, বিশেষত জাতীয় বিদ্যালয় সমূহ এবং যে সব প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা শাসন পরিচালনা করিতেছিলেন সেখানকার সরকারী শিক্ষা-বিভাগ এই উভয়কে এই কাজে সহায়তা করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। তাঁহারা ঐ কাজে আগ্রহের সহিত অগ্রসর হইলেন।

প্রথমত উপযুক্ত শিক্ষক তৈয়ারির কাজই প্রধান কাজ ছিল। সঙ্গে সঙ্গে নূতন আদর্শ অনুসারে বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও উহাতে প্রয়োগ-পরীক্ষা চালানোও প্রয়োজন ছিল। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, বোম্বাই, মাদ্রাজ, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের শিক্ষামন্ত্রিগণ (যাঁহারা ওয়ার্ধা সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন) সরকারী শিক্ষা-বিভাগের মাধ্যমে বুনিয়াদী শিক্ষা পরীক্ষামূলক ভাবে প্রবর্তন করিবার ব্যবস্থা করিলেন। কাশ্মীর রাজ্যের সরকারও অনুরূপ ব্যবস্থা করেন।

প্রথম বৎসরে খুবই উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। ঐসব প্রাদেশিক সরকার বুনিয়াদী শিক্ষার জন্য বিশেষ অফিসার নিযুক্ত করিলেন। তাঁহাদের দ্বারা বুনিয়াদী শিক্ষা বোর্ডও গঠিত হইল। শিক্ষক-শিক্ষণের জন্য ট্রেনিং স্কুল খোলা হইল। শিক্ষকগণ তাঁহাদের ট্রেনিং সমাপ্ত করিয়া যেমন বাহির হইয়া আসিতে লাগিলেন তেমনই নূতন বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে লাগিল। কোন কোন স্থানে মামুলী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পরিণত করা হইল। বিভিন্ন প্রদেশের বহু জাতীয় বিদ্যালয় বুনিয়াদী শিক্ষা-প্রণালী গ্রহণ করিল। তন্মধ্যে দিল্লীর জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া, মাদ্রাজের মসলীপট্টমের অন্ধ্র জাতীয় কলাশালা, পুণার তিলক মহারাষ্ট্র বিদ্যাপীঠ এবং আমেদাবাদের গুজরাট বিদ্যাপীঠ প্রধান। তাঁহারা প্রধানত শিক্ষক-শিক্ষণের কাজ গ্রহণ করিলেন।

যে সব ক্ষেত্রে নূতন বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপিত হইল তন্মধ্যে দুইটি ঘনীভূত ক্ষেত্রে অর্থাৎ বিহারের চম্পারণ জেলার বেতিয়া থানা অঞ্চলের

৩০টি বুনয়াদী বিদ্যালয় এবং উড়িষ্যার কটক জেলার জয়পুর মহকুমার ১৫টি বুনিয়াদী বিদ্যালয় উল্লেখযোগ্য। এই সব বুনিয়াদী বিদ্যালয় বিহার ও উড়িষ্যার সরকারই স্থাপন করেন। সরকারী ও বে-সরকারী যে সব ট্রেণিং স্কুল খোলা হয় তন্মধ্যে ওয়ার্ধার বিদ্যামন্দির স্কুলই প্রথম।

ইতিমধ্যে ১৯৩৮ সালে যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার এবং কাশ্মীর রাজ্যের গভর্ণমেণ্ট নিজ নিজ প্রদেশে প্রাথমিক পর্যায় হইতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় পর্যন্ত সমস্ত শিক্ষা-ব্যবস্থা পুনর্গঠন করার বিষয় অধ্যয়ন ও বিচার করিয়া রিপোর্ট দাখিল করিবার জন্য কমিটি নিযুক্ত করেন। ঐ সব (প্রাদেশিক শিক্ষা পুনর্গঠন) সমিতি তাহাদের রিপোর্টে বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনার প্রধান নীতিসমূহ সমর্থন করেন। যুক্তপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক ঐ সব রিপোর্ট গৃহীত হয়।

এদিকে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের অভিজ্ঞতা যতই বাড়িতে লাগিল ততই নূতন পদ্ধতিতে তাঁহাদের বিশ্বাস গভীরতর হইতে লাগিল।

পুণা সম্মেলন

অতঃপর বুনিয়াদী শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মিগণ একটি সম্মেলনে মিলিত হইয়া বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কীয় ব্যবহারিক সমস্যা সমূহের বিচার বিবেচনা করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন। তদনুসারে ১৯৩৯ সালের অক্টোবর মাসে পুণায় কাশ্মীর গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর কে. জি. সৈয়িদ্দীন-এর সভাপতিত্বে প্রথম বুনিয়াদী শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের সিদ্ধান্ত সমূহ সর্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত সমূহ উল্লেখযোগ্য :—

(১) যাহাতে তাঁহারা গ্রাম্য জীবনের বিশেষ সমস্যা সমূহ সহানুভূতি সহকারে বুঝিয়া লইয়া তাহার সমাধানের জন্য আন্তরিকভাবে যত্নবান হইতে পারেন, সেজন্য বুনিয়াদী শিক্ষকগণকে গ্রামীণ মনোভাবাপন্ন করিবার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করিতে হইবে।

(২) গ্রাম ও সহরের স্কুলের শিক্ষকগণকে পৃথক পৃথকভাবে শিক্ষা না দিয়া একই স্কুলে শিক্ষা দেওয়া উচিত, তাহাতে তাঁহাদের পক্ষে সার্বজনীন জাতীয়দৃষ্টি অর্জন করা সম্ভব হইবে।

(৩) বুনিয়াদী ট্রেণিং স্কুলে ও বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে কলাবিদ্যা শিক্ষার দিকে সমধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত এবং হস্তশিল্পের সহিত কলাবিদ্যার সমন্বয় সাধন করা উচিত।

(৪) প্রথম দুই বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে বুঝা গিয়াছে যে অনুবন্ধ-পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব এবং শিক্ষার দিক হইতে উহা খুবই কার্যকরী।

(৫) যাহা হউক, অনুবন্ধ-পদ্ধতিকে জোর করিয়া টানিয়া আনা উচিত হইবে না। উপরন্তু শিক্ষাদান একটিমাত্র মূল শিল্পের অনুবন্ধে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নহে। পারিপার্শ্বিক, প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের অনুবন্ধনের দ্বারাও শিক্ষা দান করা প্রয়োজন, কারণ সেই সকলের মধ্যে শিক্ষাদানের উপযোগী অনেক জিনিসই নিহিত থাকে এবং তাহার দ্বারা বালক-বালিকাদের বুনিয়াদী জ্ঞান সমৃদ্ধ করা যায়।

(৬) বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনার শিক্ষা-সম্পর্কীয় সম্ভাবনা সমূহকে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগাইতে হইলে সাধারণ শিক্ষকগণকেই কারিগরী শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। শিল্প-শিক্ষক ও সাধারণ শিক্ষক পৃথক ব্যক্তি হইলে বুনিয়াদী শিক্ষার অভীষ্ট ফল লাভ করা সম্ভব হইবে না।

(৭) স্থানীয় জনসাধারণের জীবিকার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের মূল শিল্প নির্বাচন করা উচিত।

(৮) ছাত্র-ছাত্রীদের উৎপন্ন দ্রব্যাদি কোথায় ব্যবহার বা বিক্রয় করা যাইতে পারে তাহার একটি সঠিক ধারণা রাখা চাই। তজ্জন্য বিদ্যালয়ে কত দরকার হইবে, কতটা স্থানীয় জনসাধারণ লইতে পারে, কতটা মিউনিসিপ্যালিটি ও লোকাল বোর্ড প্রভৃতি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের চাহিদা হইবে এবং কতটা গভর্ণমেণ্টের চাহিদা হইবে তাহার একটি মোটামুটি হিসাব করিয়া রাখা উচিত।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার ঠিক পরেই এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তখন সকলেরই মনে এই প্রশ্ন জাগিতেছিল যে যদি যুদ্ধের পরিস্থিতিতে কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলী সমূহকে পদত্যাগ করিতে হয় তবে বুনিয়াদী শিক্ষার অবস্থা কি হইবে? তখন অ-কংগ্রেসী সরকার উহাকে কি দৃষ্টিতে দেখিবেন? যদি সরকারী সহযোগিতা আর না পাওয়া যায় বা কম

পাওয়া যায় তবে বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিবার জন্য কি করা হইবে? সকলেই সম্মেলন হইতে এই দৃঢ় সংকল্প লইয়া যান যে, যে কোন প্রতিকূল অবস্থা ঘটুক না কেন পরিকল্পনানুসারে কাজ চালাইয়া যাইতেই হইবে। তবে সম্মেলনের অধ্যক্ষ মহাশয় এই আশা প্রকাশ করেন যে কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলী পদত্যাগ করিলেও তৎ তৎ প্রদেশের সরকার বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিবেন না। কারণ কোন সুবুদ্ধি সম্পন্ন সরকারের এই শিক্ষা পরিকল্পনার বিরোধিতা করিবার কোন কারণ নাই।

কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলীর পদত্যাগের পর

১৯৩৯ সালের ৮ই নভেম্বর কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলী পদত্যাগ করিলেন। বিভিন্ন প্রদেশে সরকারের পক্ষ হইতে বুনিয়াদী শিক্ষার যে কাজ চালানো হইতেছিল প্রথমত তাহার বিশেষ কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। কেবল মাদ্রাজ সরকার ১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসে কোয়েম্বাটোরে বুনিয়াদী ট্রেণিং স্কুল বন্ধ করিয়া দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ প্রদেশে বুনিয়াদী শিক্ষার যে পরীক্ষা কার্য চলিতেছিল তাহাও বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। দ্বিতীয় বৎসরের শেষ পর্যন্ত মধ্যপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, বোম্বাই ও কাশ্মীর এই কয়টি প্রদেশে গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে এবং কয়েকটি বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থা ঠিকভাবে চালানো হইতেছিল। মোট ১২টি ট্রেণিং স্কুল, দুইটি ট্রেণিং কলেজ, সাতটি রিফ্রেসার ট্রেণিং কেন্দ্র এবং পাঁচ হাজারের উপর বুনিয়াদী বিদ্যালয় তখন চলিতেছিল।

পরের বৎসর (১৯৪০-৪১) হইতে সরকারী প্রচেষ্টা মন্দীভূত হইতে থাকিল। মধ্যপ্রদেশের সরকার পরিকল্পনা অনুসারে কাজ চালাইলেন না। তাঁহারা বিদ্যামন্দির ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট্ বন্ধ করিয়া দিলেন। সমস্ত নরম্যাল স্কুলকে বুনিয়াদী ট্রেনিং স্কুলে পরিণত করা এবং চল্‌তি সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পরিণত করার কথা ছিল। কিন্তু এই দুইটির কোনটিই করা হইল না। তবে সরকার মারাঠী অঞ্চলের ওয়ার্ধা তহশীল ও হিন্দী অঞ্চলের সিউনীতে পরীক্ষামূলকভাবে বুনিয়াদী শিক্ষা চালাইবার সিদ্ধান্ত করিলেন।

উড়িষ্যা গভর্ণমেণ্ট ১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের এক ইস্তাহারে ঘোষণা করিলেন যে বুনিয়াদী শিক্ষার পরীক্ষা-কার্য চালাইয়া যাওয়া ঐ প্রদেশের স্বার্থের দিক হইতে ঠিক হইবে না। ঐ প্রদেশে বুনিয়াদী শিক্ষা পরিচালনের জন্য শ্রীগোপবন্ধু চৌধুরীর সভাপতিত্বে যে বে-সরকারী বুনিয়াদী শিক্ষা বোর্ড সরকারের উদ্যোগে গঠিত হইয়াছিল তাহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল এবং ট্রেনিং স্কুল ও বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলি ১৯৪১ সালের মার্চ মাস হইতে বন্ধ করিয়া দিবার আদেশ দেওয়া হইল।

উড়িষ্যার নেতৃবৃন্দ ও কর্মীবৃন্দ ইহাতে নিরুৎসাহিত হইলেন না। ঘনীভূত অঞ্চলে যে সব বুনিয়াদী বিদ্যালয় চলিতেছিল তাঁহারা সেগুলিকে চালাইয়া যাইবার সিদ্ধান্ত করিলেন। স্থানীয় জনগণের নিকট হইতে তাঁহারা প্রভূত সহানুভূতি ও সহযোগিতা লাভ করিলেন। উৎকল মৌলিক শিক্ষা পরিষদ নামক একটি সংস্থা গঠন করা হইল। জয়পুর অঞ্চলের ১৪টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ৭টি বিদ্যালয়ের কার্য বে-সরকারী তত্বাবধানে ভালভাবে চলিতে লাগিল।

এই সময়ে বোম্বাই ও বিহারে সরকারের পরিকল্পনামত কাজ পূর্ববৎ চলিয়া আসিতেছিল।

দ্বিতীয় সম্মেলন : দিল্লী

বুনিয়াদী শিক্ষার তৃতীয় বৎসরের শেষে (১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে) জামিয়া মিলিয়া ইস্‌লামিয়ার আহ্বানক্রমে দিল্লীর জামিয়া নগরে দ্বিতীয় বুনিয়াদী শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বোম্বাই, উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও কাশ্মীর সরকারের প্রতিনিধিগণ উহাতে যোগদান করেন। নিমন্ত্রণক্রমে বহু শিক্ষাবিদ্ ও জনসেবক উহাতে যোগ দেন। ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ সম্মেলন উদ্বোধন ও ডঃ জাকির হোসেন সভাপতিত্ব করেন। দুই তিন বৎসরের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা লইয়া কর্মীরা উপস্থিত হন। কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডল চলিয়া যাওয়াতে বুনিয়াদী শিক্ষার ক্ষেত্রে যে সঙ্কট আসিয়াছিল তাহা ইতিমধ্যে কাটিয়া গিয়াছিল।

উড়িষ্যায় কর্মীদের ও স্থানীয় লোকের স্বাবলম্বন শক্তির বলে বুনিয়াদী শিক্ষা অগ্রসর হইতেছিল। অন্যত্র সরকারের যেটুকু সহযোগিতা পাওয়া

যাইতেছিল তাহা বুনিয়াদী শিক্ষার আভ্যন্তরীণ উৎকর্ষতার কারণেই পাওয়া যাইতেছিল। মহাত্মা গান্ধী এই সম্মেলনে যে বাণী প্রেরণ করেন তাহাতে সকলের অন্তরের কথাই ফুটিয়া ওঠে। তিনি বলেন :—

"আমি আশাকরি সম্মেলন একথা উপলব্ধি করিবে যে সরকারের সহায়তা না লইয়া আত্মনির্ভরশীল হইলে বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনা অধিকতর সফল হইবে। সরকার দিতে চাহিলেও সাহায্য লইবার সময় সতর্ক থাকা উচিত। আমাদের পরীক্ষাকার্য অবিমিশ্র ও বাহিরের হস্তক্ষেপ মুক্ত হওয়া চাই।"

বুনিয়াদী শিক্ষা চালাইতে গিয়া কার্যক্ষেত্রে যে তিনটি সমস্যার উদ্ভব হইয়াছিল সে সম্পর্কে সম্মেলনে বিচার বিবেচনা করা হয়। যথা :—

(১) বুনিয়াদী শিক্ষার পাঠ্যক্রম,
(২) অনুবন্ধমূলক শিক্ষাদানের কলা কৌশল, এবং
(৩) শিক্ষক-শিক্ষণ।

সম্মেলনে যে সব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তটি এই :—

"সম্মেলন সানন্দে ইহা লিপিবদ্ধ করিতেছে যে সরকার, স্বায়ত্ব-শাসন-মূলক প্রতিষ্ঠান, অথবা বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান যাঁহারা বুনিয়াদী বিদ্যালয় পরিচালনা করিয়াছেন তাঁহারা এই বিষয়ে প্রায় একমত যে বুনিয়াদী বিদ্যালয় সমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য, ব্যবহার ও বৌদ্ধিক বিকাশ এই যাবৎ যাহা হইয়াছে তাহা উৎসাহবর্ধক। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের বালক-বালিকারা অধিকতর কর্মঠ, প্রফুল্ল ও আত্মনির্ভরশীল হইয়াছে। তাহাদের নিজেদের মনোভাব ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা সমধিক উন্নত হইয়াছে। তাহাদের সহযোগিতামূলক কাজ করিবার অভ্যাস হইতেছে এবং তাহাদের মন হইতে সামাজিক কু-সংস্কারসমূহ চলিয়া যাইতেছে।"

১৯৪১-৪২ সালে বুনিয়াদী শিক্ষার বিশেষ কোন সম্প্রসারণ হয় নাই। উড়িষ্যার জয়পুর অঞ্চলের ৭টি বিদ্যালয় ও সেবাগ্রামের বিদ্যালয়ের ভার হিন্দুস্তানী তালীমী সংঘ গ্রহণ করেন।

বেতিয়ার প্রয়োগের ফল

বিহারে বেতিয়ার ঘনীভূত অঞ্চলে যে ২৭টি বুনিয়াদী বিদ্যালয় চলিতেছিল বিহার সরকারের পক্ষ হইতে তাহাদের প্রগতি ও ফলাফল অনুসন্ধান ও নিরূপণ করিবার ব্যবস্থা করা হয়। ঐ অনুসন্ধানের ফল বিহার সরকারের এক প্রেস নোটে প্রকাশিত হয়। উহা সংক্ষেপে এই :—

(১) বুনিয়াদী শিক্ষার প্রথম ফলস্বরূপ ছাত্র-ছাত্রীদের হস্তশিল্পের কাজে দক্ষতা ও নৈপুণ্য অর্জন করা উচিত।—এই সব স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের তাহা ভালভাবে হইয়াছে।

(২) দ্বিতীয় ফল হওয়া উচিত—শৃঙ্খলাবোধের বিকাশ।—এই সব স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা কাজের মধ্য দিয়া নিজেরাই শৃঙ্খলা শিক্ষা করিয়াছে। শৃঙ্খলা তাহাদের উপর চাপানো হয় নাই। বিদ্যালয় গৃহের মধ্যে শৃঙ্খলা থাকা অপেক্ষাকৃত সহজ কিন্তু বাহিরে উহা সহজ নহে। খেলার মাঠে, সভায় ও অন্যান্য জন-সমাগমে ছাত্র-ছাত্রীদের আচরণ লক্ষ্য করা হয় এবং দেখা যায় তাহারা একটুও গোলমাল করে নাই, কিংবা কে কোথায় বসিবে তাহা লইয়া তাহাদের মধ্যে কোন ধাক্কাধাক্কি বা গোলমাল হয় নাই। ইহার দ্বারা বুনিয়াদী স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে যে শৃঙ্খলাবোধের বিকাশ হইয়াছে তাহা বুঝা যায়। অবশ্য ইহা লক্ষ্য করা গিয়াছে যে কোন কোন শিক্ষক এখনও ছাত্রদের উপর শৃঙ্খলা চাপাইবার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন। উহা বন্ধ হওয়া উচিত। নিজেরা শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া চলিবে ইহার জন্য বালক-বালিকাদিগকে স্বাধীনতা দেওয়া উচিত।

(৩) বুনিয়াদী শিক্ষার তৃতীয় ফল হওয়া উচিত—বুদ্ধির বিকাশ।—এই অঞ্চল একটি পশ্চাদ্‌পদ অঞ্চল। দুই এক বৎসরের মধ্যে ছেলেমেয়েদের বুদ্ধির যে উন্নতি হইয়াছে তাহা উৎসাহব্যঞ্জক। যে সব ছেলেদের বুদ্ধি কম ছিল ও কোন জিনিস বুঝিতে যাহাদের বেশী সময় লাগিত তাহারা এখন তাড়াতাড়ি সব বিষয় বুঝিয়া লইতে পারে।

(৪) বুনিয়াদী শিক্ষার চতুর্থ ফল এই হওয়া উচিত যে বালক-বালিকারা চালাক এবং কর্মঠ হইবে।—চম্পারণ জেলায় যে অঞ্চলে

এই বিদ্যালয়গুলি অবস্থিত সে অঞ্চলের লোক খুব অলস ও জড় প্রকৃতির এরূপ কু-খ্যাতি আছে। কিন্তু সেখানকার বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের বালক-বালিকাদিগের এই স্বভাব চলিয়া গিয়াছে দেখা যাইতেছে। শরীর ও মন উভয় দিক হইতে তাহারা কর্মঠ ও উদ্যমশীল হইয়াছে।

(৫) কাজ সুব্যবস্থিতভাবে ও পরিপূর্ণভাবে করার অভ্যাস বুনিয়াদী শিক্ষার পঞ্চম ফল হওয়া উচিত।—এই বিষয়ে বালক-বালিকারা আদর্শানুরূপ গড়িয়া উঠিতে পারে নাই।

(৬) ষষ্ঠ ফল এই হওয়া উচিত যে কোন ভাল কাজ করিবার জন্য ছেলেদের আগ্রহ আসিবে এবং তাহাতে তাহারা আনন্দ পাইবে।—দুই-একটি বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্গের ছাত্রগণকে হস্তশিল্পের কাজে আগ্রহশীল দেখা গিয়াছে কিন্তু অন্যান্য স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে বিশেষ কোন আগ্রহ এখনও জন্মে নাই।

(৭) কৌতুহল প্রবণতা, অনুসন্ধিৎসার বিকাশ ও নিরীক্ষণ ক্ষমতা এই তিনটি বুনিয়াদী শিক্ষার সপ্তম ফল হওয়া উচিত।—এই সম্পর্কে বিশেষ উন্নতি হয় নাই। শিক্ষকেরা প্রশ্ন না করিয়া ছাত্রদের মধ্যে অনুসন্ধান ও প্রশ্ন করিবার বৃত্তি তুলিবেন। কিন্তু শিক্ষকেরা এখনও প্রশ্ন করিবার অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারেন নাই।

(৮) বালক-বালিকারা তাহাদের সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে সজাগ থাকিবে—ইহা অষ্টম ফল হওয়া উচিত।—সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে তাহাদের জ্ঞান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। এখন তাহারা তাহাদের গ্রামের চারিদিকে কি ঘটিতেছে তাহা বুদ্ধিপূর্বক বুঝিতে পারে। কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে তাহাদের জ্ঞান বিশেষ হয় নাই। এই জ্ঞান হওয়া উচিত।

(৯) নবম ফল হওয়া উচিত—সহযোগিতা ও সেবাভাবের বিকাশ।—এই বিষয়ে যে বেশ ভাল উন্নতি হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করা গিয়াছে। ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয় ও বাহিরে পরস্পরের মধ্যে ও শিক্ষকদের সহিত সহযোগিতা করিয়া থাকে। নিজেদের মধ্যে পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করা এবং পরস্পরকে সেবা করার মূল্য তাহারা উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

সাধারণ স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের অপেক্ষা বুনিয়াদী স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের বেশী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার অভ্যাস হয়—ইহা জানা কথা। ঐ সব বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে কিংবা বেতিয়ার বুনিয়াদী বিদ্যালয়েও ইহা দেখা গিয়াছে। তথাপি ইহা লক্ষ্য করা হইয়াছে যে, কয়েকজন বালক পরিদর্শনের দিন মুখ না ধুইয়া স্কুলে আসিয়াছিল।

স্কুলগুলিতে একটি শ্রম সপ্তাহ পালন করা হইয়াছিল। ঐ সপ্তাহে সকলে গ্রামে গিয়া জঞ্জাল অপসারণ করিয়া তাহা গর্তে ফেলিয়াছে। কূয়ার পাশে ড্রেণ কাটিয়া জল নিকাশের ব্যবস্থা করিয়াছে। গ্রাম সাফাইয়ের অন্যান্য কাজও করিয়াছে। ইহার বিবরণ ছাত্রেরা তাহাদের নোট বুকে লিখিয়াছে।

গোছ-গাছ করার অভ্যাস হওয়া (অর্ডারলিনেস্) বুনিয়াদী শিক্ষার এক উপ-ফল (বাইপ্রোডাক্ট্)।—ছেলেদের এই অভ্যাস কতদূর হইয়াছে তাহা পরীক্ষা করা হয়। বিদ্যালয়ে কোন কোন জিনিসপত্র যথাস্থান হইতে সরাইয়া এখানে সেখানে রাখা হয় ও ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করা হয় উহার মধ্যে কোন ত্রুটি আছে কি-না। ছাত্ররা ত্রুটি দেখাইয়া দেয় এবং জিনিসপত্র ঠিকমত গুছাইয়া রাখে। কোন কোন স্কুলে অবশ্য জিনিসপত্র অগোছালো দেখিতে পাওয়া যায়।

শিক্ষার ফলে ছাত্রেরা নিজের ভাব ভালভাবে ব্যক্ত করিতে শিখিয়া থাকে।—দেখা যায় যে সাধারণ বিদ্যালয় অপেক্ষা ঐ সব বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা নিজেদের মনোভাব ভালভাবে প্রকাশ করিতে শিখিয়াছে। ঐ অঞ্চলের ছেলেরা সাধারণত খুব লাজুক ও ভীরু হইয়া থাকে। কিন্তু বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্য হইতে ঐ সব ত্রুটি সম্পূর্ণ দূর হইয়াছে।

বুনিয়াদী শিক্ষার ফলে ছাত্রদের সমগ্র ব্যক্তিত্বের বিকাশ হওয়া উচিত।—এখানে তাহা হইতেছে কি-না এত শীঘ্র তাহা বিচার করা কঠিন। তবে ঐ পর্যন্ত যে ফল পাওয়া যায় তাহা হইতে বুঝা যায় যে তাহাদের শিক্ষা অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

পাটনা ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপক শ্রীইউ. সি. চ্যাটার্জি ঐ সব বুনিয়াদী বিদ্যালয় সম্পর্কে এক কৌতুহলোদ্দীপক ও তুলনামূলক পরীক্ষা করেন।

বেতিয়া অঞ্চলের সাধারণ প্রাথমিক স্কুল এবং ঐ অঞ্চলের বুনিয়াদী স্কুলের যে সব ছাত্র ৪ বৎসর যাবৎ শিক্ষা পাইয়াছে তাহাদের লইয়া এই তুলনামূলক পরীক্ষা হয়। পড়া, লেখা, পাটিগণিত, সামাজিক বিষয় সম্পর্কীয় শিক্ষা, সাধারণ বিজ্ঞান এবং স্বাস্থ্যনীতি এই কয়টি বিষয় সম্পর্কে পরীক্ষা করা হয়।

দেখা যায় যে, বুনিয়াদী স্কুলের ছাত্রেরা মৌখিক পঠন, প্রাথমিক বিজ্ঞান স্বাস্থ্যনীতি ও সমাজ বিজ্ঞান সম্বন্ধে সাধারণ স্কুলের ছাত্র অপেক্ষা অধিক উন্নতি করিয়াছে কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে তত উন্নতি হয় নাই।

বুনিয়াদী শিক্ষার আর্থিক দিকে কতটা উন্নতি হইয়াছে তাহারও পরীক্ষা করা হয়। ঐ কয়টি বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা যাহা উৎপাদন করিয়াছে, বয়ণ খরচ ইত্যাদি সর্বপ্রকার খরচ বাদ দিয়া তাহার মূল্য দাঁড়ায় টা. ১,১২৪৷৵৯ পাই। উহা ঐ সব বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মোট উৎপাদন।

অতঃপর ১৯৪২ সালের গণ-আন্দোলন আরম্ভ হয়। হিন্দুস্তানী তালিমী সংঘের ২১ জন সদস্যের মধ্যে ১৫ জনই গ্রেপ্তার হইয়া জেলে আবদ্ধ হন। বহু জাতীয় বিদ্যালয় বন্ধ করিতে হয়। উড়িষ্যার বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলিও বন্ধ হইয়া যায়। তবে বিহার সরকার ও অন্যান্য প্রাদেশিক সরকার এবং কাশ্মীর সরকার যে সব কাজ চালাইতেছিলেন তাহা চলিতে থাকে। জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া পরিচালিত বুনিয়াদী বিদ্যালয় ও ট্রেনিং স্কুল, হিন্দুস্তানী তালিমী সংঘ পরিচালিত সেবাগ্রামের বুনিয়াদী স্কুল ও বুনিয়াদী ট্রেনিং স্কুল এবং তিলক মহারাষ্ট্র বিদ্যাপীঠ পরিচালিত পুণার নিকটস্থ বুনিয়াদী স্কুল—এইগুলি চলিতে থাকে। কিন্তু সরকারী ও বে-সরকারী পরীক্ষাকার্যের মধ্যে তখন আর কোন যোগাযোগ থাকে নাই।

কারাগারে গভীর চিন্তন

১৯৪২-৪৪ সালের গণ-আন্দোলনের সময় নয়ী তালীমের বাহ্যিক আকার এইভাবে সঙ্কুচিত ও বাধাপ্রাপ্ত হইল বটে কিন্তু ভিতরে ভিতরে উহার বিকাশের পথ পরিষ্কার হইতেছিল। অহিংসা নীরবে অধিক ক্রিয়াশীল হয়। নয়ী তালীমের কর্মী ও জনসেবকগণ কারাগারের মধ্যে নয়ী তালীম সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তন-মনন করিবার অবসর পাইলেন। তাঁহারা নয়ী তালীমের

আদর্শ ও উদ্দেশ্য অধিকতর গভীর ও স্পষ্টভাবে বুঝিয়া লন এবং জাতি-গঠনে নয়ী তালীমের স্থান কোথায় তাহার সুস্পষ্ট ধারণা লইয়া জেল হইতে বাহির হন। ফলে দেশের বিভিন্ন দিক হইতে নয়ী তালীম প্রবর্তনের তাগিদ আসিতে থাকে।

বুনিয়াদীর প্রসার

কস্তুরবা গান্ধী স্মৃতি ট্রাষ্ট নয়ী তালীমকে তাঁহাদের শিক্ষানীতি স্বরূপ গ্রহণ করিলেন। ট্রাষ্টের অর্থসংগ্রহ করিবার জন্য যে আবেদন করা হয় তাহাতে বলা হয় যে নয়ী তালীম প্রচার করা ট্রাষ্টের অন্যতম উদ্দেশ্য হইবে। মহাত্মা গান্ধী জেল হইতে মুক্তিলাভ করিবার পর কস্তুরবা স্মৃতি ট্রাষ্টের উদ্দেশ্য কি হইবে সে সম্বন্ধে বলেন যে, নয়ী তালীম প্রচার ও প্রচলন করা উহার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হইবে। এরূপে গ্রামাঞ্চলে বালিকা ও স্ত্রীলোকদের মধ্যে নয়ী তালীমের প্রসারের পথ উন্মুক্ত হইল।

১৯৪২-৪৩ সালে বাংলার বুকের উপর দিয়া দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর প্রকোপ চলিয়াছিল। তাহার ফলে সহস্র সহস্র শিশু মাতৃপিতৃহীন হইয়া আশ্রয়হীন হয়। নিখিল ভারত মহিলা সংঘের শিশু রক্ষা সমিতি (সেভ্ দি চিল্‌ড্রেন কমিটি) বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থানে শিশু-সদন খুলিয়া নিরাশ্রয় শিশুদের আশ্রয়দানের ব্যবস্থা করেন। তাঁহারা ঐ সদনগুলি নয়ী তালীমের পদ্ধতিতে চালাইবার সিদ্ধান্ত করেন। বাংলাদেশে তখন নয়ী তালীম প্রবর্তনের কোন ব্যবস্থা হয় নাই। এই অবস্থায় সদনগুলিতে নয়ী তালীম প্রবর্তন করিবার জন্য হিন্দুস্তানী তালিমী সংঘের নিকট আবেদন আসে। এজন্য ১৯৪৪ সালে ঝাড়গ্রামে একটি অস্থায়ী শিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হয়। তাহাতে বাংলার শিশু-সদনগুলি ও অন্য ৩টি বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষক ট্রেনিং দেওয়া হয় এবং সেবাগ্রামেও ঐজন্য কয়েকজন শিক্ষককে ট্রেনিং দেওয়া হয়।

জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত শিক্ষা

১৯৪২-৪৪ সালের গণ-আন্দোলনের পর এইরূপে নয়ী তালীমের ক্ষেত্র প্রসারের সুযোগ হইল। আবার নয়ী তালীমের অর্থের বিকাশ সাধন করায় উহার দৃষ্টি প্রসারিত হইল। মহাত্মা গান্ধী কারাগার হইতে বাহির হইয়া নয়ী তালীমের অর্থের বিকাশ সাধন করিবার কথা বলিলেন,—

"এখন আমাদের লক্ষ্য মাত্র সাত বৎসর হইতে চৌদ্দ বৎসরের বালকের শিক্ষা নহে। এ যাবৎ আমরা যাহা পাইয়াছি তাহা লইয়া আমরা সন্তুষ্ট থাকিব না। আমরা ছেলেদের বাড়ীতেও প্রবেশ করিব। তাহাদের মাতা-পিতাকেও শিক্ষা দিব। নয়ী তালীম অক্ষরশ জীবনব্যাপী শিক্ষা হইবে।

"আমি সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়াছি যে বুনিয়াদী শিক্ষার ক্ষেত্র প্রসারিত করিতে হইবে। জীবনের প্রত্যেক স্তরে প্রত্যেক ব্যক্তিরই শিক্ষা বুনিয়াদী শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হইবে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিজেকে সার্বজনীন শিক্ষক বলিয়া গণ্য করিবেন। পুরুষ বা স্ত্রী, তরুণ বা বৃদ্ধ কোন ব্যক্তির সংস্পর্শে যখনই আসিবেন তখনই তিনি যেন চিন্তা করেন, তিনি তাহাকে কি শিক্ষা দিতে পারেন। ইহা ব্যতীত আমাদিগকে সন্তানের জন্মের সময় হইতেই তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আমি আরও একপদ অগ্রসর হইয়া বলিব যে জন্মের পূর্ব হইতেই ভাবী জাতকের শিক্ষার কার্য আরম্ভ হইবে।"

তৃতীয় সম্মেলন ঃ সেবাগ্রাম

এরূপে নয়ী তালীমের ক্ষেত্র সম্প্রসারণের জন্য প্রস্তাব করা হইল। উপরন্তু দেশের নূতন নূতন অঞ্চলে নয়ী তালীম প্রবর্তন বা প্রসারের আগ্রহ জাগ্রত হইতেছিল। এই অবস্থায় ১৯৪৫ সালের জানুয়ারী মাসে সেবাগ্রামে তৃতীয় নয়ী তালীম শিক্ষা-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে উদ্বোধনী অভিভাষণে মহাত্মা গান্ধী বলেন,—

"আমাদের প্রবর্তিত শিক্ষা নূতন ধরণের হইলেও উহা অদ্যাবধি এক উপসাগরের মধ্যে রক্ষিত ছিল। খোলা সমুদ্রের তুলনায় উপসাগর সুরক্ষিত। কারণ উহাতে আশ্রয়ের কিছু ব্যবস্থা থাকে। আমাদের কার্য সীমাবদ্ধ ছিল। এখন আমরা উপসাগর হইতে উন্মুক্ত সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইতেছি। সেখানে ধ্রুবতারা ব্যতীত আমাদের আর কোন রক্ষক নাই। ঐ ধ্রুবতারা হইতেছে হস্তশিল্প বা উৎপাদক হাতের কাজ। এখন আর আমাদের ক্ষেত্র কেবল ৭ হইতে ১৪ বৎসর বয়সের বালক-বালিকারা নহে। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত যাবজ্জীবনই আমাদের

অর্থাৎ নয়ী তালীমের ক্ষেত্র। এজন্য আমাদের কাজ খুবই বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু কাজ করিবার লোক তো একই রহিয়াছে।

"এজন্য আমরা যেন চিন্তা না করি। আমাদের প্রকৃত সঙ্গী হইতেছেন সত্যরূপী ঈশ্বর। তিনি কখনও আমাদিগকে ছলনা করিবেন না। আমরা যখন অন্য কিছু চিন্তা না করিয়া সত্যের উপর অটুট থাকিব তখনই সত্য আমাদের প্রকৃত সঙ্গী হইতে পারে। উহাতে আড়ম্বরের স্থান নাই; অহঙ্কার বা ক্রোধেরও স্থান নাই। আমরা সকলে গ্রামবাসীদিগের শিক্ষক হইতে চাহিতেছি। উহাতে কাজই হইবে আমাদের পুরস্কার।

"এই নয়ী তালীম অর্থের উপর নির্ভরশীল হওয়া উচিত নহে। এ সম্পর্কে যতই বিরুদ্ধ সমালোচনা হউক না কেন নয়ী তালীমের ব্যয় শিক্ষার আয় হইতে মিটানো চাই। আমি জানি যে প্রকৃত শিক্ষা স্বাশ্রয়ী। ইহাতে লজ্জা নাই, বরং নূতনত্ব আছে। যদি আমরা ইহা সফল করিতে পারি ও বলিতে পারি যে ইহাতে মন অর্থাৎ মস্তিষ্কের সত্যিকারের উন্নতি হইতেছে তবে আজ যাঁহারা ইহা লইয়া হাসি-ঠাট্টা করিতেছেন তাঁহারা তখন নয়ী তালীমের প্রশংসা করিতে থাকিবেন এবং নয়ী তালীম সর্বব্যাপক হইয়া উঠিবে। আর আমাদের যে সাত লক্ষ গ্রাম হইতে আজ সর্ব প্রকারের দারিদ্র্যের স্বষ্টি হইতেছে তৎপরিবর্তে সেখানে সমৃদ্ধির স্বষ্টি হইবে। উপরন্তু এই সমৃদ্ধি বাহির হইতে আসিবে না, তাহা ভিতর হইতে—আমাদের প্রত্যেক গ্রামবাসীর পবিত্র শ্রমের দ্বারা স্বষ্ট হইবে। হয় ইহা স্বপ্ন, নতুবা সত্যিকারের খেলা।

"ইহাই নয়ী তালীমের উদ্দেশ্য। ইহা অপেক্ষা ক্ষুদ্র কিছু নহে। এই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য সত্যরূপী ঈশ্বর আমাদের সহায় হউন।"

নয়ী তালীমের ক্ষেত্রের প্রসার

উক্ত সম্মেলনে মহাত্মা গান্ধীর পরামর্শক্রমে পূর্ব-বুনিয়াদী, উত্তর-বুনিয়াদী ও বয়স্ক-শিক্ষাকে নয়ী তালীমের অন্তর্ভুক্ত করিয়া উহার ক্ষেত্র সম্প্রসারণ করিবার সুপারিশ করা হয় এবং তালিমী সঙ্ঘকে উপযুক্ত কমিটি নিযুক্ত করিয়া

পূর্ব-বুনিয়াদী, উত্তর-বুনিয়াদী ও জাতীয় বয়স্ক-শিক্ষার উপযোগী শিক্ষাক্রম রচনা করাইবার জন্য অনুরোধ করা হয়। তদনুসারে পরবর্তী মাসে (অর্থাৎ ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে) হিন্দুস্তানী তালিমী সঙ্ঘের বিশেষ বৈঠক আহ্বান করা হয়। তালিমী সঙ্ঘ সম্মেলনের সুপারিশ গ্রহণ করিয়া পূর্ব-বুনিয়াদী, উত্তর-বুনিয়াদী ও বয়স্ক-শিক্ষার শিক্ষাক্রম রচনার জন্য কমিটি নিযুক্ত করেন। নয়ী তালীমের ক্ষেত্র এইভাবে সম্প্রসারিত হওয়ায় সঙ্ঘের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য সংশোধন করা হয়। সঙ্ঘের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের নূতন সংজ্ঞা এইরূপ স্থির করা হয় :—

"জীবনের সকল পর্যায়ে জাতীয় শিক্ষার পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করা হিন্দুস্তানী তালিমী সংঘের উদ্দেশ্য।"

নব শিক্ষা-বিচার এতদিন বুনিয়াদী শিক্ষারূপে চলিতেছিল। এখন উহা নয়ী তালীমে পরিণত হইল।

স্বাবলম্বনের উপর জোর

সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে ইহা বলা হয় যে, জাতীয় আন্দোলনের কয় বৎসরের প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও নয়ী তালীমের অগ্রগতি বিশেষ কিছু ব্যাহত হয় নাই। বরং নয়ী তালীম সম্পর্কে সাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। নয়ী তালীমে শিক্ষার্থীদিগের ব্যক্তিগত ও নাগরিক উভয় প্রকার ব্যক্তিত্ব বিকাশের উন্নতি দেখিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। উহার অন্তর্নিহিত গুণবত্তা ব্যাপকভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করিতে করিতে শিক্ষার্থীরা এতটা পরিমাণ উৎপাদন করিবে যাহাতে শিক্ষার চলতি ব্যয় নির্বাহ হইতে পারে—সেইভাবে নয়ী তালীমকে সংগঠিত করার জন্য সম্মেলনের সিদ্ধান্তে বিশেষ জোর দেওয়া হয়। প্রস্তাবে আরও বলা হয় যে, গ্রামবাসীদের ব্যবহারের জন্য যে সব দ্রব্যাদি প্রয়োজন এবং যাহা শিক্ষাদানের পক্ষে উপযোগী এমন দ্রব্যাদির উৎপাদনের মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইলে এই উদ্দেশ্য সহজে সাধিত হইবে। দেশের লোকের উৎপাদন নীতিও সেইরূপ হওয়া চাই। অর্থাৎ মূলত নিজেদের বা স্থানীয় ব্যবহারের জন্য উৎপাদন করা উচিত (বাজারে বিক্রীর জন্য নহে)। অর্থাৎ স্বাবলম্বনই উৎপাদনের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। ইহার দ্বারা

আমাদের অর্থ-ব্যবস্থায় ক্রান্তি আসিবে। একদিকে শিক্ষা-ব্যবস্থায় ক্রান্তি ও অন্যদিকে অর্থ-ব্যবস্থায় ক্রান্তি যুগপৎ এই উভয়বিধ ক্রান্তি হইলে দেশের অভীষ্ট লাভ হইবে।

সার্জেণ্ট পরিকল্পনা

১৯৩৮-৩৯ সালে ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনা সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করিয়া রিপোর্ট প্রদান করিবার জন্য কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা শিক্ষা-বোর্ড কর্তৃক দুইটি কমিটি নিযুক্ত করা হয়। উভয় কমিটিই ছয় হইতে চৌদ্দ বৎসর বয়সের সকল ছেলে-মেয়েদের জন্য বুনিয়াদী পদ্ধতিতে জাতীয় শিক্ষা সংগঠন করিবার জন্য সুপারিশ করেন। ১৯৪৩ সালের শেষের দিকে কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা শিক্ষা-বোর্ড ঐ দুইটি রিপোর্টের ভিত্তিতে যুদ্ধোত্তর কালের শিক্ষা-ব্যবস্থা উন্নয়নের পরিকল্পনা সম্বলিত রিপোর্ট প্রকাশ করেন। উহা সার্জেণ্ট পরিকল্পনা (সার্জেণ্ট স্কীম) নামে খ্যাত। উহার প্রধান সিদ্ধান্তগুলি এই :—

(১) ছয় হইতে চৌদ্দ বৎসরের সকল ছেলে-মেয়েদের জন্য বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক শিক্ষা-ব্যবস্থা যথাসম্ভব শীঘ্র প্রবর্তন করিতে হইবে। অবশ্য ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষক পাওয়ার অসুবিধার জন্য ৪০ বৎসরের কম সময়ের মধ্যে ঐ পরিকল্পনা পূর্ণভাবে কার্যে পরিণত করা সম্ভব হইবে না।

(২) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা উভয়ই বুনিয়াদী শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হইবে। কাজের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার নীতি গ্রহণ করিতে হইবে। নিম্নতম পর্যায়ে অন্য যে কোন উপযোগী কর্মপ্রচেষ্টা শিক্ষার মাধ্যমে হইতে পারে। কিন্তু ক্রমশ একটি মূল শিল্পকেই শিক্ষার মাধ্যম স্বরূপ গ্রহণ করিতে হইবে। উহার সামঞ্জস্য বিধান করিয়া সমস্ত পাঠ্যক্রম নির্ণয় করিতে হইবে।

এরূপে নয়ী তালীমের কতিপয় নীতি উহাতে গৃহীত হইয়াছে বটে কিন্তু একটি প্রধান অত্যাবশ্যকীয় নীতি সার্জেণ্ট পরিকল্পনায় গৃহীত হয় নাই। উহাতে কোন অবস্থায় স্বাবলম্বনের নীতি স্বীকৃত হয় নাই। বরং উহাতে বলা হইয়াছে যে ছেলে-মেয়েদের উৎপাদিত দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া তাহাদের শিক্ষার চলতি ব্যয় নির্বাহ করা উচিত বা করা যাইতে পারে ইহা মানিয়া লওয়া যাইতে পারে না। তবে এই পর্যন্ত বলা যায় যে ছেলে-মেয়েদের দ্বারা

যে সব জিনিস উৎপাদিত হইবে তাহার দ্বারা হস্তশিল্পের জন্য যে অতিরিক্ত জিনিসপত্র ও আসবাবাদি খরিদ করিবার প্রয়োজন হইবে তাহার ব্যয় নির্বাহ হইতে পারে।

মূল উৎপাদক কাজ ও স্বাবলম্বন

সুতরাং উপযোগী হস্তশিল্পের মাধ্যমে শিক্ষাদানের নীতি গ্রহণ করা হইল বটে কিন্তু শিক্ষার ব্যয় সম্পর্কে স্বাবলম্বনের নীতি গ্রহণ করা হইল না। একথা বুঝা উচিত যে এই দুইটিকে পৃথক করা যায় না। এই দুইয়ের মধ্যে প্রায় অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। হস্তশিল্পের মাধ্যমে যদি অন্য সব শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয় তবে তাহাতে শিক্ষার্থীদের দ্বারা এতটা উৎপাদন নিশ্চয়ই হইবে যাহার দ্বারা শিক্ষার চলতি ব্যয় নির্বাহ হইতে পারে। অন্তত শিক্ষকের বেতনের বাবদ ব্যয় নিশ্চয়ই নির্বাহ করা যাইবে। ইহা অভিজ্ঞতা দ্বারা বুঝা গিয়াছে। শিক্ষার চলতি ব্যয় নির্বাহের পক্ষে পর্যাপ্ত উৎপাদন হইয়াছে কি-না তাহা দেখিলেই বুঝা যাইবে যে মূল শিল্পের শিক্ষাপ্রদ সম্ভাবনাসমূহের পূর্ণ সদ্ব্যবহার কতখানি হইয়াছে। অর্থাৎ শিক্ষাদানের জন্য মূল হস্তশিল্পকে যদি সর্বপ্রকারে কাজে লাগানো হয় তবে শিক্ষকের বেতন খরচ চালাইবার মত উৎপাদন নিশ্চয়ই হইবে। যদি তাহা না হয় তবে বুঝা যাইবে যে শিক্ষাদানের কার্যে মূল শিল্পের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা হয় নাই। শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষাদানের নীতি হইতে স্বাবলম্বনের লক্ষ্যকে বিচ্যুত করিলে শিল্প শিক্ষাও ভাল হয় না আর শিল্পের অনুবন্ধযুক্ত সাধারণ শিক্ষাও ভাল হয় না।

স্বাধীনতার পরে

স্বাধীনতা লাভের পর বিশেষত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকারের পক্ষ হইতে বুনিয়াদী শিক্ষার ট্রেনিং ও বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ব্যাপক ব্যবস্থা হইয়াছে। রাজ্য সরকারসমূহ বুনিয়াদী শিক্ষাকে প্রারম্ভিক শিক্ষার আদর্শ স্বরূপ মানিয়া লইয়াছেন। শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ পুরাতন পদ্ধতির সকল বিদ্যালয়গুলির স্থান বুনিয়াদী বিদ্যালয় অধিকার করিতে থাকিবে আশা করা যায়। কিন্তু ঐ

সকল নূতন বুনিয়াদী বিদ্যালয় সার্জেণ্ট পরিকল্পনা অনুসারে চালিত হইতেছে। অর্থাৎ উহাতে উৎপাদন সম্পর্কে স্বাবলম্বনের নীতি অনুসৃত হয় না। এইজন্য ঐ সমস্ত সরকারী বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষার জন্য মূল উৎপাদনাত্মক কাজের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা হইতেছে কি-না সন্দেহ আছে।

নয়ী তালীমের প্রারম্ভ হইতে মাত্র দুই বৎসর নয়ী তালিমের পরীক্ষা, কার্য ও প্রসার সরকারী ও বে-সরকারী প্রচেষ্টায় এবং উভয়ের পারস্পরিক সহযোগিতায় চলিয়াছিল। অতঃপর যুদ্ধের পরিস্থিতির জন্য কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করিবার পর এই যোগাযোগ ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে থাকে। স্বাধীনতা লাভের পর বাহ্যিক যোগাযোগ পুন প্রতিষ্ঠিত হইলেও এবং উহার পথ উন্মুক্ত থাকিলেও ভাবনার দিক হইতে দুই প্রচেষ্টার মধ্যে ঐক্য আছে বলিয়া মনে হয় না। স্বাবলম্বনের নীতি সম্পর্কীয় পার্থক্য তো আছেই। উপরন্তু নয়ী তালীম যে কেবল এক নূতন শিক্ষা-পদ্ধতি মাত্র নহে, উহা এক নূতন জীবন-বিচার ও সমাজে বৈপ্লবিক মূল্য পরিবর্তন উহার অন্তিম লক্ষ্য—এই মনোভাব সরকারী সংস্করণের নয়ী তালীমে কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। ব্যক্তিগতভাবে কোন কোন শিক্ষক-শিক্ষিকার সেই ভাবনা থাকিতে পারে, কিন্তু সমগ্রভাবে দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে সেরূপ দৃষ্টি এখনও আসে নাই।

সেবাগ্রামে উত্তর-বুনিয়াদী

মহাত্মা গান্ধী যখন নয়ী তালীমের সীমা সম্প্রসারণ করিবার কল্পনা তৃতীয় বুনিয়াদী শিক্ষা-সম্মেলনে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন তখন তিনি মন্তব্য করিয়াছিলেন,—

"এতদিন আমরা এক সুরক্ষিত উপসাগরের মধ্যে ছিলাম। আমাদের কার্যের দৃষ্টিভঙ্গী সীমাবদ্ধ ছিল। আজ আমরা সুরক্ষিত উপসাগরের আশ্রয় হইতে অকূল মহাসমুদ্রে যাত্রা করিতেছি।"

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে পূর্ব-বুনিয়াদী, উত্তর-বুনিয়াদী ও বয়স্ক-শিক্ষা নয়ী তালীমের অন্তর্ভুক্ত এবং তদনুযায়ী শিক্ষাক্রম প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করা হয় ও উহাদের শিক্ষাক্রম রচিত হয়। সেবাগ্রাম বুনিয়াদী স্কুলের যে প্রথম শিক্ষার্থীদল সাত বৎসরের শিক্ষাক্রম পূর্ণ করিয়াছিল, তাহাদিগকে

লইয়া ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে সেবাগ্রামে উত্তর-বুনিয়াদী শিক্ষা আরম্ভ করা হয়। দলটি ছিল ১৪ জন শিক্ষার্থী ও ১জন শিক্ষকের। উত্তর-বুনিয়াদীতে স্বাবলম্বনের দিক হইতে লক্ষ্য হইতেছে সুষম (ব্যালান্সড্) খাদ্য, বস্ত্র ও শিক্ষার সমস্ত আসবাব সরঞ্জাম ও অন্যান্য চলতি খরচ সম্বন্ধে পরিপূর্ণভাবে স্বাবলম্বী হওয়া। পড়াশুনার দিকে উহার লক্ষ্য হইতেছে এই যে, ছাত্রদের স্বয়ংপ্রেরণায় পড়িবার ও চিন্তা করিবার অভ্যাস হওয়া চাই। এজন্য শিক্ষক পড়াইবার পরিবর্তে শিক্ষার্থীদিগকে পড়িবার প্রেরণা দিবেন ও পথ দেখাইবেন। সেবাগ্রামে উত্তর-বুনিয়াদীর শিক্ষাক্রম এই সব নীতির উপর ভিত্তি করিয়া রচনা করা হয়। ছাত্রদিগকে মাতৃভাষা ও রাষ্ট্রভাষার বাছা-বাছা গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে হইবে এবং ঐ জ্ঞানকে কাজে লাগাইবার যোগ্যতা অর্জন করিতে হইবে। সেবাগ্রামে এই পদ্ধতিতে কাজ আরম্ভ হয়। সেখানকার ছাত্রেরা বিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকাও প্রকাশ করিত। তাহাদিগকে সহজ ইংরেজীতে লেখা, পড়া ও কথা বলা শিখানো হইত। অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয় হইতেছে :—(১) হস্ত-শিল্পের কাজ ও শিল্পের প্রয়োজনীয় হস্তচালিত যন্ত্রাদি সম্বন্ধে যন্ত্র-শাস্ত্রের জ্ঞান এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি সম্বন্ধীয় জ্ঞান, (২) সমাজের স্বাস্থ্য, সাফাই ও উহার সহিত সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের আলোচনা, (৩) স্থানীয় তথা প্রাদেশিক জীবনের সমাজ-বিজ্ঞান, (৪) বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞান ইত্যাদি ; ইহা ছাড়া চিত্রকলা, সঙ্গীত ও লোকনৃত্য। অনুরূপভাবে বিহারেও উত্তর-বুনিয়াদী শিক্ষার প্রয়োগ আরম্ভ করা হয়। এখন দেশের আরও কয়েক স্থানে (তের-চৌদ্দটি কেন্দ্রে) উত্তর-বুনিয়াদী শিক্ষার প্রয়োগ চলিতেছে।

উত্তম বুনিয়াদী

উত্তর-বুনিয়াদী শিক্ষা সমাপনের পর উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে লইয়া আরও অগ্রসর হওয়া অর্থাৎ নয়ী তালীমের বিশ্ববিদ্যালয় আরম্ভ করার কথা স্থির করা হয়। অতঃপর উত্তর-বুনিয়াদী শিক্ষাক্রমে উত্তীর্ণ ৮ জনের একটি ছাত্রদল লইয়া সেবাগ্রামে বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যায়ে কাজ আরম্ভ করা হয়। বিনোবাজী নয়ী তালীমের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষাকে 'উত্তম বুনিয়াদী' আখ্যা

দিয়াছেন। ১৯৫৬ সালে উত্তম বুনিয়াদীর শিক্ষাক্রম সমাপ্ত করিয়া যাঁহারা প্রথম নয়ী তালীমে স্নাতক হইবার গৌরব অর্জন করেন তাঁহারা কাঞ্চীপুরম্ সর্বোদয় সম্মেলনের সহিত অনুষ্ঠিত একাদশ নয়ী তালীম সম্মেলনে বিনোবাজীর আশীর্বাদ লাভ করেন। ঐ স্নাতকদের কেহ কেহ কোরাপুটের গ্রামদানী গ্রামে গ্রাম-নির্মাণের কাজ করিতেছেন এবং কেহ কেহ সেবাগ্রামে ও রামচন্দ্রপুরে নয়ী তালীমের কাজ করিতেছেন।

পূর্ব-বুনিয়াদীর প্রয়োগ

পূর্ব-বুনিয়াদী শিক্ষার জন্যও হিন্দুস্তানী তালিমী সঙ্ঘের নিযুক্ত সমিতি একটি শিক্ষাক্রম রচনা করেন। উহাকে ভিত্তি করিয়া সেবাগ্রামে পূর্ব-বুনিয়াদী বিদ্যালয় আরম্ভ করা হয়। অতঃপর উহা দেশের সর্বত্র প্রসার লাভ করিতে থাকে। উহার শিক্ষক শিক্ষণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কস্তুরবা স্মারক ট্রাষ্টের সেবিকারাও কোন কোন স্থানে এই কাজ হাতে লইয়াছেন। বিভিন্ন স্থানে প্রয়োগের ফলে পূর্ব-বুনিয়াদী শিক্ষার একটি ব্যবহারিক শিক্ষাক্রম গড়িয়া উঠিতেছে।

এইভাবে ধীরে ধীরে এক এক পদ অগ্রসর হইয়া নয়ী তালীমের প্রচেষ্টা বুনিয়াদী শিক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর-বুনিয়াদী, পূর্ব-বুনিয়াদী ও বয়স্ক-শিক্ষার পর্যায় অতিক্রম করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে উপনীত হয়। হিন্দুস্তানী তালিমী সঙ্ঘের সাক্ষাৎ পরিচালনায় সেবাগ্রামে সমস্ত পর্যায়ের উপযোগী শিক্ষাক্রমের প্রয়োগ করা হয় এবং সমস্ত পর্যায়ের শিক্ষাক্রমের প্রয়োগই সম্পূর্ণ করা হইয়াছে। দেশের অন্যান্য অনেক শিক্ষায়তনেও বুনিয়াদী, পূর্ব-বুনিয়াদী এবং বয়স্ক-শিক্ষা চলিতেছে। এইভাবে নয়ী তালীমের বিভিন্ন অঙ্গের এক একটি নমুনা দেশের সম্মুখে রাখা হইয়াছে।

নয়ী তালীমের তপস্বী

নয়ী তালীমের মন্ত্র দিয়াছেন মহাত্মা গান্ধী। এই মন্ত্রের সাধনের জন্য আজ একুশ বৎসরাধিককাল বহু আদর্শনিষ্ঠ শিক্ষাব্রতী তপস্বী তপশ্চর্যা করিয়া আসিতেছেন। এযাবৎ নয়ী তালীমের যতদূর প্রগতি ও প্রসার হইয়াছে তাহার পশ্চাতে তাঁহাদের সকলের অমূল্য অবদান রহিয়াছে।

তন্মধ্যে তিন মহান ব্যক্তির নাম নয়ী তালীমের ইতিহাসে চিরদিন অবিস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তাঁহারা হইতেছেন—(১) আচার্য বিনোবা ভাবে, (২) এডওয়ার্ড উইলিয়াম আর্যনায়কম এবং (৩) শ্রীমতী আশা দেবী আর্যনায়কম। আর্যনায়কমজী ও আশাদেবী শুরু হইতেই নয়ী তালীমের কাজে মহাত্মা গান্ধীর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হইয়া কাজ আরম্ভ করেন। এই শিক্ষাব্রতী দম্পতি মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে নয়ী তালীমের সেবায় তাঁহাদের জীবন উৎসর্গ করেন। নয়ী তালীমের সাংগঠনিক ও শৈক্ষণিক উভয় দিকেরই তাঁহারা প্রাণস্বরূপ। সেবক তাঁহার নির্দিষ্ট সেবা-ক্ষেত্রে কতদূর একরস হইয়া ও অনন্যনিষ্ঠ থাকিয়া একই আদর্শের পশ্চাতে সারাজীবন হাসিমুখে কাটাইতে পারেন তাঁহারা উহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

বুনিয়াদী শিক্ষার মান

এক্ষণে একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। সাত বৎসর কাল বুনিয়াদী শিক্ষার ফলে ছাত্রের যে শিক্ষালাভ হইবে তাহার মান কীরূপ হওয়া উচিত? বুনিয়াদী শিক্ষার মান সম্পর্কে এরূপ বলা হইয়াছিল যে ইংরেজী বাদ দিলে ম্যাট্রিকুলেশন শিক্ষার যে মান উহা সেইরূপ হইবে। কিন্তু ইহা বলিলে সঠিক বলা হইল না। কারণ এ কথা ঠিক যে সাধারণ সাহিত্য, মাতৃভাষা, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, প্রাথমিক বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে ম্যাট্রিকুলেশন উত্তীর্ণ ছাত্রের যে বিদ্যালাভ হয়, সাত বৎসরের বুনিয়াদী শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রের তদ্রূপ জ্ঞানলাভ তো হয়ই, তাহা ছাড়া দুই শিক্ষা-পদ্ধতির যে মূলগত পার্থক্য বিদ্যমান তাহাতে ভিন্ন প্রকারের অন্যান্য যে সব ফল লাভ হয় তাহাই নয়ী তালীমের বিশেষত্ব। উপরন্তু ইতিহাস, গণিত, ভূগোল ইত্যাদি বিষয়েও যে সাধারণ জ্ঞান লাভ হয় তাহা জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় শ্রমশিল্পের মাধ্যমে অর্জিত হওয়ায় ঐ বিদ্যা তেজস্বী ও প্রাণবান হইয়া থাকে।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে কোন আনুষ্ঠানিক পরীক্ষা হয় না। ছাত্র বিদ্যালয়ে কিরূপ কাজ করে, ছাত্রের কাজ সম্পর্কে তাহার নিজের ও শিক্ষকের বিবরণ, বিদ্যালয়ে তাহার উপস্থিতি এবং ছাত্র সম্পর্কে শিক্ষকের ধারণা কিরূপ তাহা বিবেচনা করিয়া তাহার উত্তীর্ণ হওয়া বা না হওয়ার

কথা বিচার করা হয়। যে নব-সমাজ গঠন আমাদের কাম্য তাহার যোগ্য নাগরিক স্বরূপ ছাত্রকে গড়িয়া তোলা বুনিয়াদী শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য।

আট বৎসরের শিক্ষাক্রম সমাপ্ত করিবার পর বুনিয়াদী শিক্ষার ছাত্রদের যে যোগ্যতা ও গুণবিকাশ হইবে তাহা উল্লেখ করা প্রয়োজন। তাহাতে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রকৃত সার্থকতা কোথায় তাহা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাইবে। বুনিয়াদী শিক্ষার দ্বারা যে যোগ্যতা লাভ করা যায় তাহার যে সুস্পষ্ট রূপরেখা ১২ বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে অধ্যাপক ও পরিচালকগণের পক্ষে প্রস্তুত করা সম্ভব হইয়াছে তাহা নিম্নে উল্লেখ করা হইল :—

(১) নির্মল ও সুস্থ জীবনযাপন সম্পর্কীয় যোগ্যতা

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ইহার অন্তর্ভুক্ত :—

(ক) দেহ সুষম ও সমুচিতভাবে পুষ্ট হইবে। ছাত্রের শ্রমসাধ্য কাজ করিবার শক্তি থাকিবে ও সে স্বাস্থ্যবান ও উৎসাহী হইবে।

(খ) সামাজিক ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে তাহার ভাল অভ্যাস জন্মিবে এবং উহার সামাজিক ও নৈতিক দিক সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান থাকিবে।

(গ) সামুদায়িক পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করার বিষয়ে তাহার বিবেক-বুদ্ধি বিকশিত হইবে এবং গ্রাম পরিষ্কার-পরিছন্ন রাখার মূল বিষয়গুলি তাহার জানা থাকিবে।

(ঘ) গৃহ, গ্রাম ও স্থানীয় সমাজে সাফাইর কার্যক্রম প্রস্তুত করিবার যোগ্যতা তাহার থাকিবে।

(ঙ) মানবদেহের বিবিধ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কার্য সম্বন্ধে তাহার সাধারণ জ্ঞান থাকিবে। স্বাস্থ্যরক্ষার মূল নিয়মগুলি তাহার জানা থাকিবে এবং স্থানীয় দ্রব্যাদি হইতে সুষম খাদ্য প্রস্তুত করিবার প্রণালী সম্পর্কে তাহার সাধারণ জ্ঞান থাকিবে।

(চ) ফার্ষ্ট এইড্ দেওয়ার (সাধারণ প্রাথমিক চিকিৎসা করার) জ্ঞান তাহার থাকিবে। স্থানীয় গাছগাছড়া ও ঘরোয়া ঔষধ সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান

থাকিবে। সাধারণ রোগের কারণ ও উহার প্রতিষেধের উপায় তাহার জানা থাকিবে। সে সাধারণভাবে রোগীর শুশ্রূষা করিতে পারিবে।

(২) অন্ন-বস্ত্র ও বাসগৃহ সম্বন্ধে স্বাবলম্বনের যোগ্যতা

নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ উহার মধ্যে পড়িবে :—

(ক) কার্পাস হইতে নিজের বস্ত্রাদি তৈয়ার করিয়া লইতে পারিবে।

(খ) নিজের জন্য সুষম খাদ্যের আবশ্যক দ্রব্যাদি উৎপাদন করিতে পারিবে।

(গ) আহারের জন্য সাধারণ ভোজ্য পদার্থ তৈয়ারি করিয়া লইতে পারিবে।

(ঘ) পরিবার বা সংস্থার লোকদের জন্য রান্না করিতে, পরিবেশন করিতে ও খাদ্য সুরক্ষিত রাখিতে পারিবে। খাওয়া খরচের বাজেট তৈয়ারি করিতে ও খরচের হিসাব রাখিতে পারিবে।

(ঙ) গৃহস্থালীর জন্য প্রয়োজন যাবতীয় যন্ত্রপাতির ব্যবহার তাহার জানা থাকিবে এবং উহাদিগকে যথাযথভাবে রাখিতে পারিবে।

(চ) সাইকেল চড়া জানিবে এবং উহা ভালভাবে রাখিতে পারিবে।

(৩) বুনিয়াদী হস্তশিল্প সম্পর্কে যোগ্যতা

নির্বাচিত মূল হস্তশিল্পগুলি সম্পর্কে ছাত্রের এতটা কুশলতা ও কেতাবী জ্ঞান লাভ হইবে যে প্রয়োজন হইলে সে উহার দ্বারা নিজের সুষম খাদ্য, সাদাসিধা বস্ত্রাদি এবং জীবনের অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি তৈয়ার করিয়া লইতে পারিবে।

ইহার মধ্যে নিম্ন বিষয়গুলি পড়িবে :—

(ক) মূল বা অন্যান্য হস্তশিল্পের অভ্যাসের জন্য এবং গৃহস্থালীর যন্ত্রপাতি ও গৃহস্থালীর উপকরণের ব্যবহারের জন্য গণিত ও অন্যান্য বিজ্ঞানের যে সব নিয়ম কাজে লাগাইতে হয় সে সম্বন্ধে তাহার সাধারণ জ্ঞান থাকিবে।

(খ) নিজের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যবস্তু ও তূলা উৎপাদন করার কাজে, রন্ধনের কাজে, ঘরের কাজে, মূল হস্তশিল্পের প্রক্রিয়ায়, নিজের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এবং সাফাইর ব্যাপারে রসায়নশাস্ত্র ও প্রাণীবিজ্ঞানের যে সব নিয়ম প্রযুক্ত হওয়া প্রয়োজন তৎসম্বন্ধে সাধারণভাবে তাহার জ্ঞান থাকিবে।

(৪) সাধারণ বিজ্ঞান ও গণিত সম্পর্কে যোগ্যতা

নিজের চারিদিকের প্রাকৃতিক পরিবেশে ও দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন কাজে বিজ্ঞান, গণিত ও অন্যান্য শাস্ত্রের যে সব নিয়মের ক্রিয়া হইয়া থাকে তাহার সম্বন্ধে তাহার সাধারণ জ্ঞান থাকিবে।

নিম্নলিখিত বিষয় উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে :—

মূল হস্তশিল্প এবং অন্যান্য হস্তশিল্পের উপকরণ ও সরঞ্জামের ক্ষেত্রে যন্ত্রবিদ্যা ও গণিতশাস্ত্রের যে সব নিয়ম নিহিত থাকে উহাদের সম্বন্ধে তাহার সাধারণ জ্ঞান থাকিবে।

খাদ্য ও কার্পাস উৎপাদনে, রান্নার কাজে ও অন্যান্য গৃহকর্মে, মূল হস্তশিল্পের প্রক্রিয়ায় এবং স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারে শারীরিক, রাসায়নিক ও জীবন সম্বন্ধীয় শাস্ত্রের যে সব নিয়ম প্রয়োগের আবশ্যক হয় সে সম্বন্ধে তাহার সাধারণ জ্ঞান থাকিবে।

(৫) নাগরিকতার যোগ্যতা

সহযোগী সমাজের আদর্শ কি তাহা তাহার জানা থাকিবে এবং সকলের সহিত সে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে পারিবে।

(ক) তাহার বিকেন্দ্রিত অর্থব্যবস্থার নীতিসমূহের জ্ঞান থাকিবে। উহাতে কৃষি ও পল্লীশিল্পের সমুচিত সমন্বয়ের দ্বারা স্বাবলম্বী গ্রামের সংগঠন করা যাইতে পারিবে এবং সহর ও গ্রামের মধ্যে আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের শ্রেষ্ঠ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(খ) সমবায় সমিতির নিয়মাবলী তাহার জানা থাকিবে এবং সমবায়-মূলক কার্যাদি পরিচালনে তাহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকিবে।

(গ) সে সংবাদপত্র ও অন্যান্য পত্রিকা বুদ্ধিপূর্বক পড়িতে পারিবে এবং তাহার দ্বারা ভারত ও পৃথিবীর আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাসমূহ বুঝিয়া লইতে পারিবে।

(ঘ) ভারত ও জগতের ইতিহাস ও ভূগোলের, বিশেষত আর্থিক ভূগোলের সাধারণ জ্ঞান তাহার হইবে, ইহাতে সে উহাদের বর্তমান সমস্যা-সমূহ বুঝিয়া লইতে সক্ষম হইবে।

(ঙ) সকল ধর্মসংস্থাপকগণের জীবনী ও তাঁহারা যে সব আচার ও বিচার শিক্ষা দিয়াছেন তাহা তাহার জানা থাকিবে।

(চ) সে রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উৎসবসমূহ পালন করিতে পারিবে ও উহাদের মহত্ব তাহার জানা থাকিবে।

(ছ) নয়ী তালীমের আদর্শ অনুসারে প্রত্যেক উদীয়মান নাগরিকের ন্যায় সে সমগ্র মানব জাতিকে এমন এক বহু শাখাবিশিষ্ট পরিবারস্বরূপ জ্ঞান করিবে, যাহাতে সে উহার প্রত্যেক শাখার সাংস্কৃতিক পরম্পরার সৌন্দর্য ও গুণাবলী হইতে কিছু-না-কিছু গ্রহণ করিতে পারে।

(জ) সকল ধর্ম ও উত্তম বিচারের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা থাকিবে এবং সকল মতবাদের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আচার সম্পর্কে সে সহিষ্ণু হইবে। জাতিগত, ধর্মগত, ভাষাগত, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি সকল প্রকারের সঙ্কীর্ণতা হইতে সে মুক্ত থাকিবে।

(ঝ) ভাষা ও গণিত সম্বন্ধে তাহার এরূপ যোগ্যতা থাকিবে যাহাতে ছাত্র নিজের দৈনন্দিন কাজকর্ম চালাইতে পারে এবং উত্তর-বুনিয়াদী শিক্ষা সমাপ্ত হইবার পর সে ঐ সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হয়।

(৬) ভাষা সম্পর্কীয় যোগ্যতা

(ক) বিদ্যালয় ও গ্রাম-সমাজ সম্বন্ধীয় প্রধান প্রধান বিষয় সম্পর্কে বিদ্যালয়ের সাধারণ সভায় ও প্রকাশ্য জনসভায় ছাত্র অনর্গল প্রাঞ্জল ও শুদ্ধ ভাষায় ভাষণ দিতে পারিবে।

(খ) মাতৃভাষায় লিখিত সাহিত্যের সহিত তাহার পরিচয় থাকিবে।

(গ) দৈনিক সংবাদপত্র এবং সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রপত্রিকাসমূহের সদ্ব্যবহার সে করিতে পারিবে।

(ঘ) অভিধানের ব্যবহার জানিবে।

(৭) গণিত সম্পর্কীয় যোগ্যতা

(ক) ছাত্রের গণিত-বোধ (ম্যাথমেটিক্যাল সেন্স্) বিকশিত হইবে।

(খ) হিসাব রক্ষণে তাহার এরূপ যোগ্যতা হইবে যাহাতে সে দৈনন্দিন কাজকর্ম সম্পর্কীয় সরল হিসাব, পরিমাপ ইত্যাদি সঠিকভাবে ও তাড়াতাড়ি করিতে পারিবে।

(গ) জ্যামিতির সরল চিত্রসমূহ ও প্রধান নিয়মসমূহ তাহার জানা থাকিবে।

(৮) সৃজনাত্মক ও কলাত্মক বিষয়ে যোগ্যতা

(ক) তাহার সুরুচির বিকাশ হইবে।

(খ) ভাল সঙ্গীত, সাহিত্য ও কলার নমুনা সম্বন্ধে তাহার সাধারণ জ্ঞান থাকিবে ও উহাতে সে আনন্দ লাভ করিতে পারিবে।

(গ) কলা, সঙ্গীত ও কোন কলাত্মক হস্তশিল্পের দ্বারা আত্মপ্রকাশের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাহার থাকিবে এবং উহার দ্বারা সানন্দে সে নিজের সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে পারিবে।

(ঘ) সমবেতভাবে রাষ্ট্রীয় সঙ্গীত, আনন্দবর্ধক গান, ভজন, ধুন ইত্যাদি গাহিতে পারিবে। নাট্যাভিনয়ও করিতে পারিবে।

(ঙ) উৎসব, পর্ব এবং সভাসমিতি উপলক্ষে সে বিদ্যালয় ও সভাস্থল প্রভৃতি সুরুচিসম্পন্ন করিয়া সাজাইতে পারিবে।

(চ) নিজের অঞ্চলের পরম্পরাগত কলা, লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্য ইত্যাদির সহিত তাহার পরিচয় থাকিবে।

(ছ) সে ক্লাস, স্কুল ও গ্রাম-সমাজের জন্য শুদ্ধ মনোরঞ্জনের কার্যক্রম রচনা করিতে পারিবে।

ইউনেস্কো প্রতিনিধির অভিমত

নয়ী তালীমের যে প্রয়োগ সেবাগ্রাম প্রভৃতি কয়েক স্থানে চলিতেছে তাহা বৈদেশিক শিক্ষাবিদগণের মনে কিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করিয়াছে এখানে তাহার একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হইল। গত ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে ‘ইউনেস্কো’র (সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের শিক্ষা-বিজ্ঞান-কৃষ্টি সংস্থার) শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা বোম্বাই সহরে অনুষ্ঠিত বয়স্ক-শিক্ষা আলোচনাচক্রে যোগদান করিতে আসিয়াছিলেন। ঐ সঙ্গে ভারতে মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত শিক্ষার নব-বিচারের যে প্রয়োগ চলিতেছিল তাহাও তিনি পরিদর্শন করেন। তদনুসারে ঐ সময়ে তিনি সেবাগ্রামে আসিয়া কিছুদিন থাকিয়া নয়ী তালীমের বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষাকার্য নিরীক্ষণ করেন এবং তাঁহার যে ধারণা হয় তাহা লিখিয়া যান। ঐ সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছেন,—

"It is difficult for an outsider who has been in India only a month, to talk about the spirit of India. But I feel that something of that spirit is epitomised here at Sevagram.

The Principle of Education through work, not mere activity, is a profoundly sound one, however simple a form it may take with young children. With adequate safeguards against the conscious or unconscious exploitation of the child for the sake of mere production, it helps to integrate the child in his society, to develop his intellect and his sense of responsibility.

There is another profound principle on which the experiment of Sevagram seems to be based. It is the Buddhist, Christian, Gandhian principle of love and dedication to our fellowmen coupled with the principle of renunciation of the acquisitiveness of worldly goods and of personal ambitions as methods of building up a new, peaceful society.

I feel sure that no peaceful society can be built on personal ambitions and interests and on acquisitiveness and competitive search for profits. Inevitably the profits and possession become the ends, and fellow human beings are sacrificed and exploited for them. Moreover ambitions and interests clash and lead to personal, group and national conflicts—hence war. The only legitimate personal ambition is to come in contact with and gently and discreetly serve other groups. When every human being feels concerned about the welfare of any other human beings all over the world, then we can hope to have a new, ethical and peaceful world order.

Sevagram in its own humble way is trying to practise these principles of its master and founder, Mahatma Gandhi. If it keeps on experimenting with ever fresher ways of applying its principles, and if it has the courage to utilise modern science in the service of these principles,

it may yet have a lesson to give to India and the world." অর্থাৎ "ভারতে মাত্র একমাসকাল অবস্থান করিয়া তাহার বিশিষ্ট প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন বহিরাগতের পক্ষে কিছু বলা কঠিন। কিন্তু আমি অনুভব করিতেছি যে ভারতের বিশিষ্ট প্রকৃতির সারাংশ কিয়ৎ পরিমাণে এই সেবাগ্রামেই প্রকাশ পাইতেছে। নিছক গতানুগতিক কর্ম নহে উৎপাদন-মূলক কাজের মাধ্যমে শিক্ষাদানের নীতি ছোট ছেলেদের শিক্ষার ক্ষেত্রে যতই সাদাসিধা হউক না কেন তথাপি খুবই সারগর্ভ। কেবলমাত্র উৎপাদনের কাজে খাটাইয়া ছেলেদিগকে যাহাতে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে শোষণ করা না হয় সে বিষয়ে যদি যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা হয় তবে এই শিক্ষা বালককে তাহার সমাজের সহিত একীভূত করিয়া দিতে সাহায্য করিবে এবং তাহার বুদ্ধি ও দায়িত্ব-বোধের বিকাশ সাধন করিতে সহায়ক হইবে।

"সেবাগ্রামে নব শিক্ষণের যে পরীক্ষাকার্য চলিতেছে তাহা আর একটি মহান নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই নীতি হইতেছে বুদ্ধ, খৃষ্ট, গান্ধীর প্রেমধর্ম এবং জনসেবায় আত্মোৎসর্গ, আর উহাদের সহিত যুক্ত রহিয়াছে নূতন, শান্তিময় সমাজ গঠনের উপায় স্বরূপ পার্থিব ধনসম্পত্তি সঞ্চয়ের লোভ ও আত্মপ্রতিষ্ঠা-লিপ্সার বিসর্জন।

"আমি নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করি যে ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা-স্পৃহা, ব্যক্তিগত স্বার্থ, সঞ্চয়ের আকাঙ্ক্ষা ও অধিক লাভের জন্য প্রতিযোগিতামূলক প্রচেষ্টা —এই সকলকে ভিত্তি করিয়া কোন শান্তিময় সমাজ গড়িয়া তোলা সম্ভব নহে। ইহাতে লাভ ও ধনসম্পত্তি অনিবার্যভাবে জীবনের লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায় এবং জনগণের স্বার্থ বিসর্জন দেওয়া হয় ও তাহাদিগকে শোষণ করা হয়। উপরন্তু পরস্পরের প্রতিষ্ঠা-লিপ্সা ও স্বার্থবুদ্ধির ফলে ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত ও জাতিগত সংঘর্ষের উদ্ভব হয় এবং যুদ্ধই উহার পরিণতি হইয়া দাঁড়ায়। পোষণযোগ্য উচ্চাকাঙ্ক্ষা হইল— অন্যান্য গোষ্ঠীর সংস্পর্শে আসিয়া নম্রভাবে ও বিচক্ষণতার সহিত সকলের সেবা করা। যখন প্রত্যেক ব্যক্তি জগতের অন্য সকলের কল্যাণের জন্য আগ্রহশীল হইয়া উঠিবে তখনই এক নূতন নৈতিকতাসম্পন্ন, শান্তিময় বিশ্বসমাজ গঠন করিবার আশা করা যাইতে পারিবে।

"সেবাগ্রাম উহার মহান নেতা ও প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা গান্ধীর এই সকল নীতি অনুসরণ করিবার জন্য নম্রভাবে সাধনা করিতেছে। যদি নূতন নূতন উপায়ে এই সকল নীতির প্রয়োগ করিবার সাহস উহার থাকে তাহা হইলে উহা ভারত তথা সমগ্র বিশ্বকে এক মহান শিক্ষা দান করিতে পারিবে।"

নয়ী তালীমের কল্পনা ও মহাত্মা গান্ধী

মহাত্মা গান্ধী প্রাথমিক শিক্ষা তথা জাতীয় শিক্ষা সম্পর্কে তাঁহার বৈপ্লবিক কল্পনা ১৯৩৭ সালের ৩১শে জুলাই তারিখের 'হরিজন' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। ঐ প্রবন্ধ পড়িয়া মনে হইতে পারে ঐ কল্পনা অকস্মাৎ তাঁহার মনে উদিত হইয়াছিল। তিনি নিজেও ঐ সময়ে এইরূপ লিখিয়াছিলেন যে ঐ কল্পনা আকস্মিক দীপ্তি স্বরূপ তাঁহার অন্তরে উদ্ভাসিত হয়। কল্পনাটি সমগ্ররূপে অকস্মাৎ তাঁহার মনে উদয় হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু উহা তাঁহার দীর্ঘকালব্যাপী নিরন্তর বিচার ও অভিজ্ঞতার পরিণতি।

বহুদিন হইতে তাঁহার মনে ঐ কল্পনার ভূমিকা প্রস্তুত হইতেছিল। এই ভূমিকাকে দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে : (১) প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীর বিরুদ্ধে তাঁহার অন্তরের বিদ্রোহ ও (২) প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির সংস্কারের জন্য যে সব চিন্তা তাঁহার মনে আসিতেছিল তদনুযায়ী শিক্ষা প্রবর্তনের প্রচেষ্টা। তাঁহার বুনিয়াদী শিক্ষা তথা নয়ী তালীমের কল্পনা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে হইলে ঐ ভূমিকা স্মরণ করা প্রয়োজন।

(১) প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

১৯০৮ সালে 'হিন্দ স্বরাজ' পুস্তকে তিনি লেখেন যে সাধারণ অর্থে অক্ষর-জ্ঞানকে শিক্ষা বলা হয়। কিন্তু যে কৃষক সততার সহিত চাষ-আবাদ করিয়া

জীবিকা উপার্জন করে, পিতামাতা, পত্নী, পুত্র-কন্যা প্রভৃতির কাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করা উচিত তাহা জানে, গ্রামের লোকের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া কিভাবে বাস করিতে হয় তাহাও জানে এবং সদাচারের নিয়ম ভালভাবে বুঝে ও পালন করে, নিজের নামটুকু সহি করিতে না জানিলেও তাহাকে তিনি অশিক্ষিত বলিয়া মানিতে রাজি নহেন এবং তাহাকে অক্ষর জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে করেন না। তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, অনুশীলনের ফলে যে ব্যক্তির দেহ তাঁহার এরূপ আয়ত্তে আসিয়াছে যে যে-কোন কাজ তিনি সহজে করিয়া ফেলিতে পারেন, যাঁহার বুদ্ধি শুদ্ধ শান্ত ও ন্যায়দর্শী, যাঁহার ইন্দ্রিয়সমূহ বশে আছে ও অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়াছে এবং যিনি অন্যকে আত্মবৎ দেখেন, তিনিই প্রকৃত শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। গান্ধীজী বলেন যে, এই উক্তির দ্বারা তিনি অক্ষরজ্ঞানের বিরোধিতা করিতেছেন এরূপ যেন মনে করা না হয়। তিনি এইমাত্র বলিতে চান যে, অক্ষরজ্ঞানকে দেবতারূপে পূজা করা উচিত নহে।

অতঃপর ১৯২১ সালে 'ইয়ং-ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় তিনি এক সুদৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেন—"সরকারী স্কুল-কলেজ আমাদিগকে পুরুষার্থহীন, অসহায় ও নাস্তিক করিয়া ফেলিয়াছে। ঐ সব স্কুল ও কলেজ আমাদের অন্তরে অসন্তোষ ভরিয়া দিয়াছে।"

তিনি আরও বলেন যে, ইংরেজী শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য সরকারী ও সওদাগরী অফিসের জন্য কেরাণী তৈয়ারি করা।

ইংরেজী শিক্ষা সম্পর্কে তাঁহার অভিমত এই, "লক্ষ লক্ষ লোককে ইংরেজী শিক্ষা দেওয়ার অর্থ তাহাদিগকে গোলাম করিয়া গড়িয়া তোলা। মিঃ মেকলে শিক্ষার যে বুনিয়াদ রচনা করেন তাহা আমাদিগকে গোলাম করিয়া ফেলিয়াছে। তাঁহার এরূপ উদ্দেশ্য ছিল একথা আমি বলি না। তবে উহার পরিণাম এইরূপই হইয়াছে। ইহা কি দুঃখের কথা নহে যে আমাদিগকে স্বরাজ্যের কথা ইংরেজীতে বলিতে হয়?"

ইংরেজী শিক্ষার কুফল

"ইংরেজী শিক্ষার ফলে আমাদের দম্ভ ও অত্যাচার বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা কি দুঃখের বিষয় নহে যে বিচারালয়ে গেলে আমাকে ইংরেজীতে কথা

বলিতে হইবে? আর ব্যারিষ্টার হইলে নিজের মাতৃভাষায়ও কথা বলিতে পারিব না?"

"যাঁহারা ইংরেজী ভাষা অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহাদের নিজ সন্তানদিগকে প্রথমে মাতৃভাষার মাধ্যমে নীতিধর্ম শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। অন্য একটি ভারতীয় ভাষাও তাহাদের শিক্ষা করা উচিত। পরে যখন তাহারা বড় হইবে তখন তাহারা ইংরেজী শিখিতে পারে। কিন্তু অন্তিম লক্ষ্য এই হওয়া চাই যে, আমাদের ইংরেজী শিক্ষা করা আবশ্যক বলিয়া যেন মনে করা না হয়।"

(২) গান্ধীজীর কল্পনামত শিক্ষাদানের সুযোগ

১৮৯৭ সালে যখন গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকায় যান তখন শিক্ষা সম্পর্কে তাঁহার এই অভিমত ছিল যে ছোট ছেলেদিগকে মাতাপিতার নিকট হইতে দূরে রাখা উচিত নহে। ছোট ছেলেরা সুব্যবস্থিত গৃহে স্বাভাবিকভাবে যে শিক্ষা লাভ করিতে পারে তাহা কোন ছাত্রাবাসে হওয়া সম্ভব নহে। ঐ সময়ে দশ বৎসর বয়স্ক ভাগিনেয় এবং আট ও পাঁচ বৎসর বয়স্ক দুই পুত্র তাঁহার সঙ্গে ছিল। সুতরাং সমস্যা হইল কেমন করিয়া তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়? তিনি তাহাদিগকে দেশে পাঠাইতে রাজি ছিলেন না। তিনি তাহাদিগকে নিজের কাছে রাখিলেন এবং নিজেই তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেন। পর্যাপ্ত সময় তাঁহার হাতে ছিল না। সুতরাং তিনি তাহাদিগকে যতটা সাহিত্যের জ্ঞান দিতে চাহিতেন তাহাও দিতে পারিতেন না। ছেলেরা বিদ্যালয়ের শিক্ষা না পাওয়াতে তাহাদের মনে কিছু ক্ষোভ থাকিয়া গিয়াছিল। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী বলেন,—"তথাপি আমি এই মনে করি যে যদি সাধারণ বিদ্যালয়ে তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা হইত তাহা হইলে অভিজ্ঞতার শিক্ষালয়ে ও মাতাপিতার সাহায্যে তাহারা যে শিক্ষা লাভ করিয়াছে তাহা হইতে বঞ্চিত থাকিত। উপরন্তু তাহাদের সম্বন্ধে আমি সেরূপ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতাম না। আর ইংল্যাণ্ডে বা দক্ষিণ আফ্রিকায় সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা পাইলে আজ উহাদের মধ্যে যে অনাড়ম্বর ভাব ও সেবাভাব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে তাহা দেখা যাইত না।"

টলষ্টয় ফার্ম

অতঃপর টলষ্টয় ফার্মে সহকর্মীদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করার প্রয়োজন হয়। ঐ প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন,—

"বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীতে আমার বিশ্বাস ছিল না। আমি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও গবেষণা দ্বারা শিক্ষার নির্ভুল প্রণালী আবিষ্কার করিতে চাহিতেছিলাম।"

তিনি জানিতেন যে মাতাপিতার দ্বারাই প্রকৃত শিক্ষা হওয়া সম্ভব এবং তাহাতে বাহিরের হস্তক্ষেপ যতটা সম্ভব কম হওয়া প্রয়োজন। তিনি নিজেকে টলষ্টয় ফার্মের ছেলেমেয়েদের পিতা স্বরূপ বিবেচনা করিয়া নিজেই তাহাদের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি হৃদয়ের শুদ্ধতা সম্পাদন ও চরিত্র গঠনকে প্রথম স্থান দিলেন এবং অধিকাংশ সময় তাহাদের সঙ্গে থাকিতে লাগিলেন।

শ্রীক্যালেনবাক্ ও শ্রীপ্রাগজী দেশাইর সহায়তায় তিনি ক্লাস শুরু করিলেন এবং যতটা সম্ভব সাহিত্য শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিলেন। শিক্ষায় তিনি শারীরিক শ্রমের উপর গুরুত্ব দিতেন। ফার্মে কোন ভৃত্য রাখা হইত না। রান্না হইতে সাফাইর কাজ পর্যন্ত সমস্ত কাজ আশ্রমকর্মীরা নিজেরা করিতেন। শ্রীক্যালেনবাকের বাগান করার সখ ছিল। যুবা-বৃদ্ধ সকলকে তাহাদের সামর্থ্য অনুসারে বাগানের কাজে লাগিতে হইত। তাহাতে পৃথকভাবে ব্যায়াম বা খেলাধূলার আর প্রয়োজন থাকিত না।

হস্তশিল্পের আবশ্যকতা

শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার বিচারধারা তখনও এই ছিল যে প্রত্যেক বালককে কোন-না-কোন হস্তশিল্প শিক্ষা দেওয়া উচিত। তদনুসারে ব্যবস্থাও করা হয়। ক্যালেনবাক্ কোন ট্রেপিষ্ট মঠ হইতে জুতা তৈয়ারির কাজ শিখিয়া আসেন। তাঁহার নিকট হইতে মহাত্মা গান্ধী জুতা সেলাই শিখিলেন। ক্যালেনবাক্ কাঠের কাজও কিছু জানিতেন। এইভাবে ছেলেদের হস্তশিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। শিক্ষার এই নিয়ম করা হয় যে শিক্ষকগণ নিজেরা যে কাজ করিবেন না তাহা ছাত্রদিগের দ্বারা করানো হইবে না।

তিনি বিশ্বাস করিতেন যে ছেলেরা চক্ষুর সাহায্যে যে সময়ে যতটা শিখিতে পারে, কানের সাহায্যে তদপেক্ষা কম সময়ে অনেক বেশী শিখিয়া লইতে পারে। এজন্য তিনি নিজে ভালভাবে পড়িয়া লইয়া তাহা ছেলেদিগকে শুনাইতেন। আধ্যাত্মিক শিক্ষাও দেওয়া হইত। কিন্তু

আধ্যাত্মিক শিক্ষার জন্য ধর্মগ্রন্থের উপর বেশী নির্ভর করা হইত না। তবে প্রত্যেক ছাত্রের নিজের ধর্মের তত্ত্ব ও নিজের ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান থাকা উচিত মনে করা হইত। এইভাবে পরিস্থিতির প্রয়োজনে সেখানে এরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইল যাহাকে নয়ী তালীম শিক্ষা-ব্যবস্থার পূর্বাভাস বলা যাইতে পারে।

তাঁহারা ভারতে আসার পর জাতীয় বিদ্যাপীঠ প্রভৃতিতে সুতাকাটার প্রচলন করা হয়। উহাতে তাঁহার প্রেরণায় চরিত্রগঠন ও হৃদয়ের শিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। পাঠ্যপুস্তকের উপর গুরুত্ব কম দেওয়া হইত। সেবাকে শিক্ষার অঙ্গস্বরূপ গণ্য করা হইত।

তিনি গুরুকুলের ছাত্রদিগকে শরীরশ্রম করিতে ও আত্মনির্ভরশীল হইতে উপদেশ দেন। গুরুকুলের একজন অনুরাগী হিসাবে উহার পরিচালক সমিতি ও উহার ছাত্রদের মাতাপিতার উদ্দেশ্যে তিনি বলেন,—

> "গুরুকুলের বালকদিগকে যদি আত্মনির্ভর ও স্বাবলম্বী হইতে হয় তবে তাহাদিগকে ভালভাবে হাতের কাজ শিক্ষা দেওয়া উচিত। আমার মনে হয়, যে দেশে শতকরা ৫০ জনের জীবিকা হইতেছে কৃষি ও যে দেশে শতকরা ১০ জন লোক কৃষকের প্রয়োজন মিটাইবার কাজ করে সে দেশে কৃষি ও বস্ত্রবয়ন যুবকদের শিক্ষার আবশ্যক অঙ্গ হওয়া উচিত।"

নয়ী তালীম কল্পনা উদ্ভাবনের ১৬ বৎসর পূর্বে ১৯২১ সালে শিক্ষায় যে আর্থিক স্বাবলম্বন হওয়া সম্ভব এই বিচার তাঁহার মনে আসে। ১৯২১ সালে 'ইয়ং-ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় তিনি লেখেন,—"যদি প্রত্যেক বিদ্যালয়ে সুতাকাটা চালানো হয় তবে আমার মনে হয় যে তাহার দ্বারা শিক্ষার আর্থিক ব্যবস্থায় বিপ্লব আসিবে। আমরা প্রত্যহ ছয়ঘণ্টা বিদ্যালয় চালাইয়া ছাত্রদিগকে বিনা ব্যয়ে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে পারি। মনে করুন, একজন বালক প্রতিদিন ৪ ঘণ্টা চরকায় সুতা কাটিবে। তাহা হইলে পাঠশালার জন্য সে প্রত্যহ এক আনা করিয়া উপার্জন করিবে।"

মহাত্মা গান্ধী এইভাবে নয়ী তালীম আবিষ্কারের অভিমুখে ধীরে ধীরে অথচ দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হইতেছিলেন। ইহা ছিল নয়ী তালীম কল্পনার ভ্রূণ অবস্থা।

মহাত্মাজী প্রবর্তিত হস্তশিল্পের মাধ্যমে শিক্ষাদান কল্পনা কি মৌলিক ?

১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসে ওয়ার্ধায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত জাতীয় শিক্ষা সম্মেলনে ভাষণদান প্রসঙ্গে ডঃ জাকির হোসেন বলেন যে মহাত্মা গান্ধী শিক্ষার যে পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছেন তাহা নূতন নহে। তিনি বলেন,—"অনেক শিক্ষাবিদ্ হাতের কাজকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষাদান করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। আমেরিকায় এই প্রণালীকে প্রজেক্ট মেথড ও রুশিয়ায় কমপ্লেক্স মেথড বলা হয়।"

এই প্রসঙ্গে বিনোবাজী ঐ সম্মেলনেই বলিয়াছিলেন,—"ইহা নূতন জিনিস না হইতে পারে, কিন্তু ইহা নূতন আলোকে উপস্থাপিত করা হইয়াছে।"

হাতের কাজের মাধ্যমে শিক্ষার কল্পনা কবে কোথায় কিভাবে উদ্ভাবিত হইয়াছিল এবং গান্ধীজী কোন নূতন আলোকে উহা প্রবর্তন করিয়াছেন তাহা ভাল করিয়া জানিয়া বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। তবেই নয়ী তালীমে হাতের কাজের মাধ্যমে শিক্ষাপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য কোথায় তাহা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করা সম্ভব হইবে।

হস্তশিল্পের মাধ্যমে শিক্ষাদান সম্পর্কে বৈদেশিক শিক্ষাবিদ্‌গণের কল্পনা

রুশোর দৃঢ় অভিমত এই ছিল যে অন্যের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া বালকের পক্ষে কিছু শিক্ষা করা উচিত নহে। পুস্তক হইতে লব্ধ জ্ঞান ঐরূপ পরোক্ষ শিক্ষার মধ্যে পড়ে। এজন্য পুঁথিগত বিদ্যা তিনি পছন্দ করিতেন না। তাঁহার বিচারধারা এই ছিল যে বালকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা জ্ঞানলাভ করা উচিত। এরূপে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্থাৎ কাজের মাধ্যমে শিক্ষার নূতন বিচারধারা তিনি জগতকে প্রথম প্রদান করেন।

আধুনিক কালে আমেরিকার বিখ্যাত শিক্ষাশাস্ত্রী ডঃ জন ডিউঈ তাঁহার শিক্ষা পরিকল্পনায় কাজের মাধ্যমে শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার 'হাউ টু থিঙ্ক' নামক পুস্তকে (১৯১০) চিন্তার প্রক্রিয়া

বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন যে কোন অসুবিধা বোধ না হইলে বা কোন সমস্যার উদ্ভব না হইলে মানুষের চিন্তা করার প্রয়োজন হয় না। যে খাদ্য আমি খাইয়াছি তাহা যদি হজম না হয় তবে তখন বাধ্য হইয়া উহার কারণ ও উহার প্রতিকার সম্পর্কে আমাকে চিন্তা করিতে হইবে। যে গাড়ীতে আমি যাইতেছি তাহা যদি হঠাৎ বন্ধ হইয়া যায় এবং আর না চলে তবে তখন ঐ সম্পর্কে আমি চিন্তা করিতে বাধ্য হইব। এইভাবে আমরা যখন কোন সমস্যার সম্মুখীন হই তখন তাহার সমাধানের উপায় সম্পর্কে আমরা চিন্তা করিতে আরম্ভ করি। তখন আমরা চিন্তা করিয়া প্রতিকারের কোন উপায় বাহির করি। আর তাহা প্রয়োগ করিয়া দেখি। যদি তাহাতে সমস্যার সমাধান হইয়া যায় তবে তাহার দ্বারা আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধি হইয়া থাকে। আর যদি তাহাতে সমস্যার সমাধান না হয় তবে অন্য একটি সম্ভাব্য উপায় প্রয়োগ করিয়া দেখি। ইহাই হইতেছে মন-বিকাশের প্রক্রিয়া। এইরূপে মনের বিকাশ সাধিত হয়। এইরূপে বুঝা যায় যে চিন্তন কর্ম-তৎপরতার (এক্‌টিভিটি) এক বৃত্তি (ফাংশন)। এক্‌টিভিটির (কর্মতৎপরতার) মাধ্যমে মনের বিকাশ হইয়া থাকে। সুতরাং জ্ঞানলাভ বা জ্ঞানের বিকাশ কর্মতৎপরতার মাধ্যমেই হওয়া সম্ভব।

তাঁহার এই চিন্তন প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ ও তাঁহার ব্যাখ্যাত মন-বিকাশের এই ধারার প্রতি শিক্ষাবিদ্‌গণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয় এবং উহার ভিত্তিতে কয়েকটি প্রগতিশীল শিক্ষাপ্রণালীর উদ্ভব হয়, যথা—ফাংশানাল প্রণালী (ফাংশানাল মেথড), প্রোজেক্ট প্রণালী (প্রোজেক্ট মেথড), প্রব্লেম্ প্রণালী (প্রব্লেম্ মেথড) প্রভৃতি।

ডঃ জন ডিউঈ উপরোক্ত সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিয়া তাঁহার শিক্ষা-পরিকল্পনায় কাজের মাধ্যমে শিক্ষাদান প্রণালীর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। নয়ী তালীম ও ডঃ ডিউঈ প্রবর্তিত শিক্ষা-পরিকল্পনার মধ্যে আরও কিছু বাহ্যিক সাদৃশ্য আছে। যথা :—

(১) উভয় শিক্ষা-পরিকল্পনায় ছাত্রের ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

(২) নয়ী তালীমে সামূহিক জীবনযাপন ও পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্য দিয়া শিক্ষাদান করা হইয়া থাকে। ডিউঈ শিক্ষা-পরিকল্পনায়ও 'শেয়ার্ড

এক্টিভিটি' (যে কাজে অনেকে একসঙ্গে অংশ গ্রহণ করে) এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ও সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের দ্বারা সামাজিক বোধ জাগ্রত করার কল্পনা আছে।

ইহা দেখিয়া কেহ কেহ এতদূর পর্যন্ত অনুমান করেন যে গান্ধীজী হয়ত তাঁহার নয়ী তালীমের কল্পনা ডিউঈর নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। এই অনুমানের মূলে কোন ভিত্তি নাই। জন ডিউঈর 'হাউ টু থিঙ্ক্' পুস্তক ১৯১০ সালে প্রকাশিত হয়। তৎপূর্বেই গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকায় কাজের মধ্য দিয়া শিক্ষার প্রয়োগ আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং শিক্ষাসংক্রান্ত বহু ক্রান্তিকারী ভাবধারা তৎপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। উপরন্ত গান্ধীজী বলিয়াছিলেন যে পরিকল্পনাটি এক দীপ্তিস্বরূপ তাঁহার অন্তরে উদ্ভাসিত হয়। ডিউঈর পরিকল্পনার সহিত উহার বাহ্য সাদৃশ্য থাকিলেও নয়ী তালীমের মূল জিনিস সম্পূর্ণ নূতন ও মৌলিক।

নয়ী তালীমের বুনিয়াদ অহিংসা

নয়ী তালীমের মৌলিকত্ব ও নূতনত্ব কোথায় তাহা ভালভাবে বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। তাহা এই :—

(১) প্রথমত নয়ী তালীম পরিকল্পনার ভিত্তি অহিংসা। মহাত্মা গান্ধী বলেন,—"অহিংসার উৎস হইতে এই পরিকল্পনার উদ্ভব হইয়াছে। আমাদের ছেলেদিগকে জাতির প্রকৃতি, কৃষ্টি ও সভ্যতার প্রকৃত বাহকরূপে গড়িয়া তুলিতে হইবে। ইউরোপের দৃষ্টান্ত আমাদের কোন কাজে আসিবে না। ইউরোপ হিংসার ভিত্তিতে তাহার পরিকল্পনা রচনা করিয়া থাকে, কারণ হিংসায় তাহার বিশ্বাস। রাশিয়া যাহা সাধন করিয়াছে তাহাকে আমি ছোট করিয়া দেখিতে চাহি না। কিন্তু উহার সমস্ত সংগঠনের ভিত্তি হইতেছে হিংসা ও বলপ্রয়োগ। ভারত হিংসা বর্জন করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছে। এইজন্য এই শিক্ষাব্যবস্থা হইতেছে অহিংসা-শৃঙ্খলার অবিভাজ্য অঙ্গ।"

(২) পাশ্চাত্যে কোন কোন শিক্ষা-পরিকল্পনার পাঠক্রমে হাতের কাজ স্থান পাইয়া থাকিতে পারে কিন্তু তাঁহারা অন্য দেশকে এখনও শোষণ করিতেছেন। হাতের কাজ শিক্ষার পরিণাম স্বরূপ তাঁহাদের শোষণ প্রবৃত্তি দূর হইবে না এবং সেই উদ্দেশ্যে ঐ সব শিক্ষা-পরিকল্পনাও রচিত হয় নাই।

গান্ধীজীর শিক্ষা-পরিকল্পনায় হাতের কাজ শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা এক ও অবিভাজ্য। তাঁহার ঐ ক্রান্তিকারী পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করা হইলে শোষণ চিরতরে বিদূরিত হইবে।

(৩) অহিংসা ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নব-সমাজ রচনার উপায় স্বরূপ ঐ শিক্ষা-পরিকল্পনা উপস্থাপিত করা হয়। যদি এই পরিকল্পনা সঠিকভাবে অনুসরণ করা হয় তবে দেশের বালকবালিকারা অহিংস নাগরিক রূপে গড়িয়া উঠিবে ও অহিংস সমাজ গঠিত হইবে।

(৪) এই বিরাট দেশের জাতীয় শিক্ষা-পরিকল্পনা হিসাবে ইহার প্রবর্তন করা হইয়াছে। ৭ হইতে ১৪ বৎসর বয়সের সমস্ত বালকবালিকার বিনাব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে এই পরিকল্পনা রচিত হয়।

(৫) স্বাবলম্বনাত্মক শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। স্বাবলম্বন নয়ী তালীমের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ইহার প্রাথমিক স্তর শিক্ষার দ্বারা স্বাবলম্বন এবং উচ্চস্তর স্বাবলম্বনের দ্বারা শিক্ষা।

নয়ী তালীমের শাস্ত্রকার বিনোবা

যুগের প্রয়োজনানুরূপ সমাজ-গঠনের উপযোগী মন্ত্র যুগপুরুষের চিত্তে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। ঐ মন্ত্রের উদ্ভব যখন হয় তখন তাহা বীজ রূপে প্রকাশ পায়। যুগপুরুষ সমাজভূমিতে সেই বীজ বপন করেন। মাটি সরস রাখিয়া বীজকে অঙ্কুরিত করা এবং জল সিঞ্চন করিয়া সেই শিশু পাদপকে পোষণ-বর্ধন করার কাজ উদ্যানপালের (মালীর)। কিন্তু বীজ কি প্রকারের, উহাতে কি প্রকারের বৃক্ষ জন্মিতে পারে, উহার দ্বারা কি প্রকারের কাজ হইতে পারে, উহার পালন-পোষণ ও বর্ধনের জন্য কিরূপ আবহাওয়ার প্রয়োজন অর্থাৎ বীজের মধ্যে কি কি সম্ভাবনা নিহিত আছে, তাহার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিরীক্ষণপূর্বক তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া ও জনসাধারণকে ঐ বীজ বপন করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করার কাজ হইতেছে উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্ বিজ্ঞানীর।

জাতীয় শিক্ষা তথা নয়ী তালীমের ক্ষেত্রে বিনোবা হইতেছেন সেই বিজ্ঞানী। গীতা প্রভৃতি অধ্যাত্মশাস্ত্রে বিজ্ঞানের আর এক অর্থ আছে। জ্ঞান হইতেছে শাস্ত্র-পাণ্ডিত্য, আর অনুভবসিদ্ধ যে জ্ঞান তাহা হইতেছে বিজ্ঞান। নয়ী তালীম শাস্ত্রে বিনোবার জ্ঞান শুধু জ্ঞান নহে, তাহা বিজ্ঞানও। উপরন্তু নয়ী তালীমের বীজকে জল-সিঞ্চনের দ্বারা অঙ্কুরিত করা ও উহার শিশু বৃক্ষকে পালন পোষণ-করার যে কাজ উদ্যানপাল বা মালীর তাহাতেও বিনোবার অবদান কম নহে।

অপূরণীয় জ্ঞান-পিপাসা

বিনোবা হইলেন স্বভাব-শিক্ষক। তিনি স্বভাব শিক্ষার্থীও বটেন। আজীবন তিনি নিজে শিখিবেন এবং অন্যকে শিখাইবেন ইহা তাঁহার স্বভাবগত। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার জ্ঞান-পিপাসা অপূরণীয়। বরোদায় থাকাকালে স্কুলে পড়ার সময় তিনি বরোদার সেণ্ট্রাল লাইব্রেরীতে গিয়া পড়াশুনা করিতেন। উহার মত সমৃদ্ধ পাঠাগার তখনকার দিনে দেশে দ্বিতীয় একটি ছিল কি-না সন্দেহ। কিন্তু বিনোবা অল্পদিনেই উহার সমস্ত পুস্তক পড়িয়া শেষ করেন এবং সঙ্গীদের লইয়া 'বিদ্যার্থী মণ্ডল' গঠন করিয়া উহার জন্য ১৬০০ বাছা বাছা গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। উহাতে কেবল নিজের জ্ঞানপিপাসা মিটানো নহে, সঙ্গীদিগের জ্ঞানবৃদ্ধির জন্যও তাঁহার আগ্রহ প্রকাশ পায়। এক্ষেত্রেও তাঁহার শিক্ষক-প্রকৃতি ক্রিয়া করিয়াছিল।

বিনোবা মহাত্মা গান্ধীর সবরমতী আশ্রমে থাকাকালীন স্বাস্থ্যোন্নয়ন ও বেদ-উপনিষদাদি অধ্যয়নের জন্য আশ্রম হইতে এক বৎসরের ছুটি লন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ২২ বৎসর। তিনি ওয়াই নামক স্থানে থাকিয়া একজন আজন্ম ব্রহ্মচারী পণ্ডিতের নিকট গীতা, উপনিষদ, বেদান্ত ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেন ও অন্যকে গীতা, উপনিষদ প্রভৃতি পড়াইতেন। সেখান হইতে ১৯১৮ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী তিনি মহাত্মা গান্ধীকে যে পত্র লেখেন তাহাতে তিনি নিজে অধ্যয়ন করার সঙ্গে সঙ্গে কাহাকে কি পড়াইয়াছেন ও শিখাইয়াছেন তাহাও বর্ণনা করেন। তিনি লেখেন,—

"(১) গীতার ক্লাস লইয়াছি। বিনা পারিশ্রমিকে দুইজনকে টীকাসহ গীতা পড়াইয়াছি। (২) চারিজনকে জ্ঞানেশ্বরীর ছয় অধ্যায় পড়াইয়াছি।

(৩) দুইজন ছাত্রকে লইয়া উপনিষদের ক্লাস করিয়াছি। ৯টি উপনিষদ পড়াইয়াছি। (৪) আমি নিজে হিন্দী ভাল জানি না; তথাপি দুইজন ছাত্রের হিন্দী পত্রিকা পড়িবার ও পড়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছি।

ঐ অল্প বয়স হইতেই তিনি জাতীয় শিক্ষার আচার্যের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বিনোবা স্বাভাবিক শিক্ষক

সবরমতী আশ্রমে থাকার সময়েই তিনি নিজের মধ্যে কায়িক শ্রম ও মানসিক শিক্ষার মিলন-সাধন আরম্ভ করিলেন। একদিকে তিনি ছিলেন ঝাড়ুদার, রাঁধুনী ও মলমূত্র পরিষ্কারকারী মেথর এবং অন্যদিকে তিনি ছিলেন আশ্রম বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং গুজরাট বিদ্যাপীঠের ধর্মোপদেষ্টা। ১৯২১ সালে বিনোবা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সবরমতী আশ্রম হইতে ওয়ার্ধায় কয়েকজন তরুণ ছাত্র সংগে লইয়া আসিলেন। বিনোবার সান্নিধ্যে আশ্রমের কাজকর্মে, চলাফেরায়, কথাবার্তা ও আলাপ আলোচনায় সেখানে প্রকৃষ্ট শিক্ষার আবহাওয়া সৃষ্টি হইয়াছিল। তিনি ঐসব তরুণদিগকে কাজেকর্মে ও শিক্ষা-দীক্ষায় প্রবীণ করিয়া তুলিলেন। তাঁহার একজন ছাত্রশিষ্য লিখিয়াছেন,—

"১৯২৭ সালে আমি বিনোবার আশ্রমে গেলাম। আমার বয়স তখন ১৪ বৎসর। পূর্ব হইতে আমি জানিতাম যে তাঁহার আশ্রমে স্কুলের পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হয় না। সমস্ত দিন কেবল কাজের মধ্যে থাকিতে হয়। শিল্পের মধ্যে ছিল বয়ন এবং গৃহকর্মের মধ্যে ছিল রন্ধন।

"সকাল সন্ধ্যায় বিনোবার প্রার্থনা প্রবচন, মধ্যাহ্ন আহারের পর অর্ধঘন্টা ধান নিড়ানোর কথা এবং সান্ধ্য আহারের পর আগুনের ধারে বসিয়া গল্প—এই ছিল পাঠ্যক্রম। আধঘন্টা গীতার সমবেত ক্লাস হইত। বড় বড় লোকের আলাপ আলোচনা শুনিতে পাইতাম। সর্বোপরি ছিলেন বিনোবার মত স্বভাব-শিক্ষক। বাঁধাধরা ক্লাস বসিত না বটে, কিন্তু যেখানে বিনোবা সেইখানেই জ্ঞানচর্চা। বেড়াইবার সময় হাঁটিতে হাঁটিতে বিনোবার মুখে শুনিতে পাইতাম প্রাচীনকালের বেদান্তের কথা। শুনিতে পাইতাম কবীরের দোঁহার আলোচনা।"

এই বর্ণনা পড়িলে মনে হয় নয়ী তালীম উদ্ভবের ১৪।১৫ বৎসর পূর্বেই স্বভাব-শিক্ষক বিনোবা নয়ী তালীমের শিক্ষকে পরিণত হইয়াছিলেন। বিনোবা একবার প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছিলেন,—

"যে সব ছেলেদের আমি পড়াইয়াছি তাহাদিগকে কেবল পড়াইয়াছি তাহা নহে, নিজে তাহাদের রান্না করিয়া খাওয়াইয়াছি। এই যে বল্লভস্বামী প্রভৃতি আমার ছাত্র তাহাদের আমি নিজ হাতে রাঁধিয়া খাওয়াইয়াছি।"

প্রাচীন ভারতে আচার্যগণ এরূপে ছাত্রদের কাজকর্ম করিয়া দিতেন। এইভাবে বিনোবার জীবনে নয়ী তালীমের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বুনিয়াদ গড়িয়া উঠিতেছিল।

কলেজে অধ্যয়নের সময় একদিন এক অধ্যাপকের সঙ্গে শিক্ষাশাস্ত্র লইয়া তাঁহার আলোচনা হয়। তিনি অধ্যাপকের সমকক্ষ স্বরূপ উৎকৃষ্টতর যুক্তিতর্ক দিয়া ঐ বিষয়ে বিতর্ক করেন। রুশোর 'এমিল' নামক শিক্ষা-বিজ্ঞান বিষয়ে এক বিখ্যাত গ্রন্থ আছে। শিক্ষাতত্ত্ব সম্পর্কে ঐ গ্রন্থে গভীর আলোচনা করা হইয়াছে। বিনোবাজী ১৯২৩ সালে এক সভায় ঐ গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে শিক্ষার প্রকৃত স্বরূপ কি তাহা ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার ঐ বিচার যে নির্ভুল তাহা যে কোন শিক্ষাশাস্ত্রজ্ঞ স্বীকার না করিয়া পারিবেন না। উহা নয়ী তালীম উদ্ভবের ১৪ বৎসর পূর্বের কথা। এত পূর্বেও শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার বিচার যে কত গভীর, নিখুঁত ও ক্রান্তিকারী ছিল তাহা ভাবিলে আশ্চর্যবোধ হয়।

এইভাবে দৃঢ় ভিত্তির উপর শিক্ষাশাস্ত্রজ্ঞ বিনোবা গড়িয়া উঠিতেছিলেন। তাই নয়ী তালীমের পাঠ্যক্রম রচনার জন্য ডঃ জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে যে সমিতি গঠন করা হয় তাহাতে তাঁহার ন্যায় যোগ্যতম ব্যক্তিকেই গ্রহণ করা হইয়াছিল।

নয়ী তালীমের সংগঠনের কাজে তিনি প্রথম হইতে আর্যনায়কমজী ও আশা দেবীকে সহায়তা দান করিতে থাকেন। ১৯৩৮ সালে ওয়ার্ধায় নয়ী তালীমের জন্য শিক্ষক-শিক্ষণের প্রথম যে কেন্দ্র খোলা হয় বিনোবাজী উহার অধ্যক্ষপদের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেন। তথায় আচার্য বিনোবা

নয়ী তালীমের তত্ত্ব ও উহার প্রয়োগ সম্পর্কে অধ্যাপনা করিতেন এবং উহার সংলগ্ন অভ্যাসশালায় তিনিই প্রথম নয়ী তালীম পদ্ধতিতে পড়াইতে আরম্ভ করেন।

সেই সময় হইতে তিনি যে কোন গঠনমূলক কাজের সংস্পর্শে আসিয়াছেন তাহাকে নয়ী তালীমের দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়াছেন এবং নয়ী তালীমের রং দেওয়ার প্রযত্ন করিয়াছেন। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ও বৎসরের পর বৎসর তিনি প্রবচন, আলোচনা ও লেখার মধ্য দিয়া নয়ী তালীমের গভীরতম তত্ত্বসমূহ উদ্ঘাটন করিয়া তাহা শিক্ষানুরাগী তথা সাধারণ জনগণের সমক্ষে তুলিয়া ধরিয়া আসিতেছেন। উহার বিচারের বিভিন্ন দিকের উপর তিনি নব-নব আলোক সম্পাত করিয়া আসিতেছেন। তিনি বিভিন্ন দিকে নয়ী তালীমের বিচারকে প্রভূতভাবে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। জাতীয় শিক্ষার এমন কোন দিক নাই যেদিকে তিনি নূতন আলোক সম্পাত করেন নাই। তাঁহার 'শিক্ষা বিচার' নামক পুস্তকে উহার অধিকাংশই সঙ্কলিত হইয়াছে। নয়ী তালীম তথা জাতীয় শিক্ষা বিষয়ে এমন উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ আর নাই বলিলে হয়।

বিনোবাজী প্রবর্তিত ভূদান ও গ্রামদান আন্দোলনের ফলে নয়ী তালীমের প্রয়োগের ক্ষেত্র অপূর্বভাবে প্রসারিত হইতে চলিয়াছে। এখন সমগ্র গ্রামদানী গ্রামই নয়ী তালীমের বিদ্যালয়ে পরিণত হইতে পারে। উহার জন্য দেওয়ালে ঘেরা সংকীর্ণ বিদ্যালয়-গৃহের প্রয়োজন আর থাকিবে না। গ্রামবাসীদের দ্বারা নয়ী তালীম গ্রহণ করাইবার জন্য আর কোন বিশেষ প্রযত্নের প্রয়োজন হইবে না। কারণ গ্রামদানের দ্বারাই সমগ্র গ্রাম নয়ী তালীমের ভিত্তিতে নব-সমাজ নির্মাণ করিবার প্রেরণা লাভ করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, উহার জন্য তাহারা সঙ্কল্পও গ্রহণ করিয়াছে।

এখন গ্রামদানী গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা হইবে নয়ী তালীমের ছাত্র। গ্রামের সমস্ত কৃষি-ক্ষেত্র ও শিল্প-গৃহ হইবে নয়ী-তালীমের অভ্যাসশালা ও গবেষণাগার। গ্রামের সমস্ত কুশল কৃষক ও কারিগর হইবে নয়ী তালীমের শিল্প-শিক্ষক। উপরন্তু যে সব গ্রাম জীবন-ধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় এক বা একাধিক দ্রব্যাদি সম্পর্কে স্বাবলম্বী ও স্বয়ং সম্পূর্ণ হইয়া উঠিবার সংকল্প লইয়াছে অথবা যে সব গ্রামের ভূমিবানগণ সর্বোদয়ের বিচার বুঝিয়া গ্রামের

ভূমিহীনদের জন্য তাঁহাদের এক-শতাংশ ভূমিদান করিয়াছেন সেইসব গ্রামে নয়ী তালীমের প্রবেশের অনুকূল ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে।

তিনি ১০ বৎসর যাবৎ সারা দেশে নিরন্তর পদযাত্রা করিয়া নবসমাজ গড়িয়া তুলিবার জন্য কঠোর তপশ্চর্যা করিয়া আসিতেছেন। সেই তপশ্চর্যার মধ্য দিয়া নয়ী তালীমের এক ক্রান্তিকারী বিচার তাঁহার অন্তরে উদ্ভাসিত হইয়াছে। এ বিচার পূর্বে তাঁহার অন্তরে ধরা পড়িয়া থাকিলেও উহা এতদিন এত পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট হয় নাই। সেই বিচার হইতেছে এই যে অহিংস বিপ্লব ও অহিংস সমাজ গঠনের প্রক্রিয়া মূলত এক শিক্ষা-প্রক্রিয়া।

হিংসাত্মক বিপ্লবে ভাবাবেগের স্থানই প্রধান। ভাবাবেগের দ্বারা অভিভূত ও চালিত হইয়া সেখানে মানুষ একদিনে বিপ্লব করিয়া বসে। কিন্তু অহিংস বিপ্লবের ক্ষেত্রে শুধু ভাবাবেগে কাজ চলে না। এখানে বিচার বিপ্লবের যেমন প্রয়োজন ক্রান্তির বিচার অনুসারে সমাজ গঠনেরও তদ্রূপ প্রয়োজন। হিংসাত্মক বিপ্লবের পশ্চাতেও বিচার বিপ্লবের প্রয়োজন হয়। কিন্তু এ যাবৎ সমাজের সমস্ত সংগঠন অল্পাধিকভাবে হিংসার ভিত্তিতে চলিয়া আসিয়াছে। এজন্য সমাজের প্রবণতা এখনও সেইদিকেই রহিয়াছে। এই কারণে সমাজের পক্ষে হিংসার বিচার বুঝিতে পারা কোন কঠিন ব্যাপার নহে। সুতরাং উহা সমাজের পক্ষে বিশেষ কোন শিক্ষা-প্রক্রিয়া নহে। কিন্তু অহিংস বিপ্লব হইতেছে অহিংসার বিচার বুঝিয়া তদ্দ্বারা উদ্বুদ্ধ হওয়া ও তদনুসারে সমাজ গঠন করা। উভয়ই সমাজের পক্ষে নূতন শিক্ষা স্বরূপ। উহা নবমানব গড়ার কাজ। এজন্য শিক্ষা স্বরূপ উহা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এই কারণে বিনোবাজী বিচার-বিপ্লব সহ নব-সমাজ গঠনের সমস্ত কাজকে শিক্ষার দৃষ্টিতে দেখিতে ও গ্রহণ করিতে বলিতেছেন এবং সমস্ত রচনাত্মক কাজকে নয়ী তালীমের রঙে রঞ্জিত করিতে বলিতেছেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি সমগ্র সর্বোদয় আন্দোলনকে অর্থাৎ সর্বোদয়ের আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি সর্ব ক্ষেত্রের কাজকে নয়ী তালীমের প্রক্রিয়া স্বরূপ গ্রহণ করিতে বলিতেছেন। তাই তিনি সূত্রাকারে বলেন,—

"যদি সমাজ শিক্ষাপূর্ণ হয় তবে তাহা শাসনশূন্য হইবে আর যদি সমাজ শিক্ষাশূন্য হয় তবে তাহা শাসনপূর্ণ হইবে।"

বিনোবা স্বভাব-আচার্য। বিনোবা জ্ঞানী। বিনোবা সন্ত। আচার্য, জ্ঞানী ও সন্ত—এই তিনে মিলিয়া তাঁহার ব্যক্তিত্বকে পরম মহিমায় মণ্ডিত করিয়াছে। তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন যে জাতীয় শিক্ষার পশ্চাতে আত্মজ্ঞান বা আধ্যাত্মিকতার বুনিয়াদ না থাকিলে উহা সার্থক হইবে না। প্রাচীন ভারতের শিক্ষা অল্পাধিকভাবে আধ্যাত্মিকতার বুনিয়াদে গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে আমাদের দেশের শিক্ষা হইতে সেই বুনিয়াদ চলিয়া গিয়াছে। বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞানের যুগে শিক্ষার বুনিয়াদে আত্মজ্ঞান অপরিহার্য। কারণ বিজ্ঞান আত্মজ্ঞানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইলে উহার অনিবার্য পরিণাম অতিহিংসা। এজন্য অহিংস সমাজ গঠনের জন্য বর্তমান যুগে শিক্ষার বুনিয়াদে আধ্যাত্মিকতা অত্যাবশ্যক।

এরূপে বিনোবা নয়ী তালীম বা জাতীয় শিক্ষার আদর্শকে উত্তরোত্তর উচ্চ হইতে উচ্চতর শিখরে আরোহণ করাইয়া দিতেছেন।

৬। বিদ্যালয়ের উৎপন্ন দ্রব্যাদি বিক্রয়

বিদ্যালয়ের ছাত্রদের উৎপন্ন দ্রব্যাদি বাহিরে বিক্রয় করিবার কল্পনা প্রথম হইতে চলিয়া আসিতেছে। মূলত মহাত্মা গান্ধীর এই কল্পনা ছিল। জাকির হোসেন কমিটিরও এই অভিমত ছিল। তাঁহারাও বলিয়াছিলেন যে সরকারকে বিদ্যালয়ের উৎপন্ন দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া লইবার দায়িত্ব লইতে হইবে। তবেই বুনিয়াদী বিদ্যালয় শিক্ষকের বেতন সম্পর্কে স্বাবলম্বী হইতে পারিবে। বিনোবাজী এই কমিটির সদস্য ছিলেন। তখন কে জানিত যে ২০ বৎসর পরে তিনি এ সম্পর্কে এক বিপরীত অথচ উন্নততর নীতি অবলম্বন করিবার প্রস্তাব করিবেন। কাল ও অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। অবস্থার পরিবর্তনে নীতিরও পরিবর্তন করিবার প্রয়োজন হইয়াছে।

বিনোবাজী সম্প্রতি (২৬-৭-৫৮ তাং) বোম্বাই রাজ্যের মানসহিবরে নামক স্থানে শিক্ষকগণের প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে বলেন যে বিদ্যালয়ে উৎপন্ন দ্রব্যাদি বিক্রয় করিবার বুদ্ধি হইতেছে দুর্বুদ্ধি। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদেরই তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্যাদি ভোগ ও ব্যবহার করিতে দেওয়া উচিত। ১৯৩৭ সালে অবস্থা ভিন্ন রূপ ছিল। তখন ঐ দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া শিক্ষকগণের ভাতা খরচ চালাইয়া লইবার প্রয়োজন ছিল। কারণ কংগ্রেসী

মন্ত্রীমণ্ডলের ঐ অর্থ খরচ করিবার সামর্থ্য ছিল না। এখন স্বাধীন দেশের সরকারের বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যয়ের জন্য অর্থের ব্যবস্থা করা উচিত। যে দেশের অধিকাংশ বালকবালিকা পুষ্টিকর খাদ্য পায় না এবং তাহাদের প্রয়োজনীয় পরিধেয় থাকে না সেখানে তাহাদের উৎপন্ন খাদ্যদ্রব্য ও বস্ত্রাদি তাহাদেরই পোষণের জন্য তাহাদিগকে ভোগ করিতে দেওয়া উচিত। কেবলমাত্র দেখা উচিত যে যাহা উৎপন্ন করা হইতেছে তাহার দ্বারা বিদ্যালয়ের চলতি ব্যয় নির্বাহ হইতে পারে কিনা। এ সম্পর্কে বিনোবাজী বলেন :

"স্কুলের উৎপন্ন দ্রব্যাদি বিক্রয়ের জন্য নহে, উহা নিজেদের ব্যবহারের জন্য। নিজেদের কাজে লাগাইলে তবে উহার সার্থকতা। কেবলমাত্র এই হিসাব রাখা প্রয়োজন যে আমাদের বিদ্যালয়ে এতটা মূল্যের দ্রব্যাদি উৎপন্ন হইয়াছে। গো-পালনে এতটা পরিমাণ মাখন তৈয়ারী হইয়াছে আর সকলে মিলিয়া উহা খাইয়াছে। যদি ঐ মাখন সহরে পাঠাইয়া বিক্রয় করিয়া অর্থ উপার্জন করা হয় তবে তাহার সহিত জীবন-শিক্ষা ব্যবস্থার কোন সম্পর্ক থাকে না।

"পণ্ডিত নেহরু আজকাল বলিতেছেন, 'স্কুলে ছেলেমেয়েদিগকে দুপুরে খাইতে দেওয়া চাই'। ইহার অর্থ এই যে স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্য খাওয়ার ব্যবস্থা করা সমাজের কর্তব্য—এখন সেই ব্যবস্থা সরকার করুন অথবা ছেলেমেয়েদের অভিভাবকগণ করুন অথবা গ্রামদানী গ্রামই করুন। কিন্তু যে কোন উপায়ে ছেলেদের দেহের পুষ্টিসাধনও শিক্ষার অঙ্গ হওয়া উচিত। ঐ খরচ শিক্ষা বিভাগের উপর চাপাইবার প্রয়োজন নাই।"

এরূপে তিনি নয়ী তালীমের বিচারের এক প্রয়োজনীয় দিককে সমৃদ্ধ করিয়াছেন।

ইহা সুখের বিষয় যে শিক্ষাসংক্রান্ত কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা বোর্ডও এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে বিদ্যালয়ের উৎপন্ন দ্রব্যাদি ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য দেওয়া উচিত।

৭। পূর্ব-বুনিয়াদী শিক্ষা

প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষার প্রথম শ্রেণী হইতেই ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা আরম্ভ করা হয়। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভের পূর্বেও যে তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া অত্যাবশ্যক তাহা দেশের শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা অনুরাগী ব্যক্তিগণ অনুভব করিতেন। বড় বড় সহরে পাশ্চাত্য পদ্ধতি অনুসরণে শিশু শিক্ষার কিছু কিছু ব্যবস্থা এখনও আছে। এজন্য মহাত্মা গান্ধী যখন প্রথম নয়ী তালীম প্রবর্তন করেন তখন কেহ কেহ এই মন্তব্য করিয়াছিলেন যে ৭ বৎসর বয়সের পূর্ব হইতেই শিক্ষা আরম্ভ হওয়া উচিত। তাঁহাদের এই কথার মধ্যে যুক্তি ছিল সন্দেহ নাই।

মহাত্মা গান্ধী ১৯৪৪ সালে পূর্ব-বুনিয়াদী শিক্ষার কল্পনা লইয়া জেল হইতে বাহির হইলেন। কিন্তু তাঁহার ঐ শিশু-শিক্ষার কল্পনা শিশু-শিক্ষা সম্বন্ধে সাধারণ চিন্তাধারার তুলনায় ক্রান্তিকারী ছিল। কারণ তাঁহার কল্পনা এই ছিল যে মায়ের উদরে যখনই সন্তান আসিল তখন হইতেই শিক্ষার আরম্ভ হওয়া উচিত। বিনোবাজী তদপেক্ষাও অধিক দূর অগ্রসর হইতে চাহেন। তিনি বলেন—

> "সন্তানের নিজেরই এক বৈশিষ্ট্য আছে। সে নিজের মাতাপিতা নির্বাচন করিয়া লইয়া তবে তাঁহাদের ক্রোড়ে জন্মলাভ করে। এইজন্য সদ্গুণসম্পন্ন মাতাপিতার সন্তানের কিছু বিশেষ বিশেষ গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। যদি গোড়া হইতেই ঐসব গুণকে রক্ষা করার ব্যবস্থা হয় তবে বালক খুবই গুণবান ও বিচারশীল হইয়া থাকে।"

অর্থাৎ যাঁহারা সদ্গুণসম্পন্ন সন্তানের মাতাপিতা হইতে চাহিবেন তাঁহাদিগকে নিজেদের জীবন এমন সদ্ভাবে গঠন করিতে হইবে এবং তাঁহাদের গৃহের পরিবেশকে এমনভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে যাহাতে উহা সদ্গুণ-সম্ভাবনা-বিশিষ্ট শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশের পক্ষে উপযোগী হয়। তবেই প্রকৃতির নিয়মে সদগুণ-সম্ভাবনা-বিশিষ্ট শিশু তাঁহাদের ঘরে জন্মগ্রহণ করিবে। এরূপে মাতার সন্তান সম্ভাবনা হইবার পূর্ব হইতেই ভাবী মাতা-পিতার জীবন গঠনের মাধ্যমে পূর্ব বুনিয়াদী শিক্ষা আরম্ভ হওয়া উচিত। পূর্ব বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে কি সুগভীর ও ক্রান্তিকারী চিন্তাধারা!

গৃহই শিশু-শিক্ষার প্রকৃষ্ট শিক্ষালয় ও উহাই তাহার একমাত্র শিক্ষালয় হওয়া উচিত। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বর্তমান অবস্থায় শিশু-শিক্ষার ব্যবস্থা গৃহের বাহিরে করার প্রয়োজন হয়। কারণ পাশ্চাত্য দেশসমূহ শিল্পপ্রধান। সেখানকার অধিকাংশ মাতাপিতাকে কাজের জন্য প্রায় সারাদিন বাহিরে থাকিতে হয়। সুতরাং ছোট ছেলেদের দেখাশুনার অবসর তাঁহাদের থাকে না। সেইজন্য সেখানে শিশু শিক্ষার ব্যবস্থা পৃথকভাবে ঘরের বাহিরে করিতে হইয়াছে। এদেশেও মাতাপিতাদের বহুসময় গৃহের বাহিরে থাকিতে হয়। উপরন্তু এদেশের অধিকাংশ পরিবার দরিদ্র। তাঁহাদের গৃহ ও গৃহের পরিবেশ অজ্ঞতা ও কুসংস্কারে পূর্ণ। সুতরাং বর্তমানে গৃহে শিশুদের সর্বাঙ্গীন বিকাশ হওয়া সম্ভব নহে। এদেশের পারিবারিক পরিবেশের প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করা কষ্টসাধ্য ও বহু সময়সাপেক্ষ।

এই অবস্থায় এদেশেও গৃহের বাহিরে শিশু-শিক্ষার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। কিন্তু এই শিক্ষা-ব্যবস্থা বাহিরে হইলেও স্কুলের সময় ছাড়া অবশিষ্ট সময় শিশুদিগকে গৃহে থাকিতে হয়। এজন্য শিশু-শিক্ষা ব্যবস্থার অঙ্গস্বরূপ শিশুর গৃহের পরিবেশের এরূপ সংশোধন ও উন্নতি সাধন করা প্রয়োজন যাহাতে শিক্ষালয়ের সহিত গৃহের পরিবেশের অসঙ্গতি না থাকে।

এজন্য পূর্ব-বুনিয়াদী শিক্ষার এক প্রধান কাজ হইতেছে মাতাপিতাকে শিশুর পালন-পোষণ ও বিকাশের পক্ষে প্রয়োজনীয় বিষয়ে শিক্ষাদান করা ও তাঁহাদের গৃহের পরিবেশের আবশ্যক সংস্কার সাধন করা। মহাত্মা গান্ধী বলিতেন যে বালকই মাতাপিতার সত্যিকারের গুরু। শিক্ষার দৃষ্টিতে সন্তানের কল্যাণের জন্য মাতাপিতাদের অন্তত সন্তানের সাক্ষাতে মিথ্যা বলা উচিত নহে ও স্বার্থপর হওয়াও উচিত নহে। কারণ সন্তানের চক্ষু সব সময় মাতাপিতার সব কাজ নিরীক্ষণ করিতে থাকে। পূর্ব-বুনিয়াদী সম্পর্কে বিনোবাজী বলেন,—

"আমার মতে ছোট ছেলেদের শিক্ষা (যাহাকে আমরা পূর্ব-বুনিয়াদী শিক্ষা বলিয়া থাকি) পরিবারের মধ্যে হওয়া উচিত। মাতাপিতাই সন্তানের প্রথম শিক্ষক এবং অন্যান্য শিক্ষক অপেক্ষা তাঁহাদের অধিকারও শ্রেষ্ঠ ; তবে তাঁহাদের শিক্ষাদান করিবার কিছু যোগ্যতা থাকা চাই। এখন সে অবস্থা নাই। এজন্য পূর্ব-বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার

প্রয়োজন হয় এবং তাহার আয়োজন করিতে হয়। কিন্তু আদর্শ এই হওয়া চাই যে বুনিয়াদী শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষার এতই প্রসার হইবে যাহাতে প্রত্যেক পরিবার যেন একটি বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। আর স্মৃতিকারগণও এই উপদেশ দিয়াছেন যে গর্ভাধান হইতে সন্তানের শিক্ষা আরম্ভ হওয়া উচিত। যতদিন এই আদর্শে পৌঁছানো না যাইতেছে ততদিন মাতাপিতার প্রতিনিধিস্বরূপ অন্য লোককে এই কাজ করিতে হইবে।"

সুতরাং শিশুদের শিক্ষা উপলক্ষ করিয়া বয়স্কদিগের শিক্ষাদান করা এবং গৃহ ও বিদ্যালয় উভয়ের সহযোগে শিশুদের বিকাশ সাধন করা শিশু-শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য হওয়া উচিত। এজন্য এখন শিশু-শিক্ষার কার্যক্রম গৃহ ও বিদ্যালয় উভয় স্থানে চালাইতে হইবে। বিদ্যালয় আরম্ভ হইবার অন্তত ১ ঘণ্টা পূর্বে ও বিদ্যালয় বন্ধ হইবার পর সন্ধ্যাকালে শিক্ষক ছেলেমেয়েদের ঘরে ঘরে থাকিয়া শিশুদের মাতাপিতা প্রভৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করিবেন ও তাঁহাদের অভ্যাসাদি এবং তাঁহাদের গৃহ ও গৃহের পরিবেশের আবশ্যক সংস্কার সাধন করিবার চেষ্টা করিবেন। এই দৃষ্টিতে 'পূর্ব-বুনিয়াদী' কোন স্বতন্ত্র বিভাগ নহে। উহা বয়স্ক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত।

পূর্ব-বুনিয়াদী—দুইভাগে

সাধারণ ভাবে ২-২॥ হইতে ৬ বৎসর বয়সকালকে পূর্ব-বুনিয়াদীর শিক্ষাকাল গণ্য করা হয়। শিশুদের স্বাভাবিক বিকাশের দৃষ্টিতে এই সময় এত দীর্ঘ যে ঐ সময়ে কোন এক প্রকারের শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্ভব নহে। সুতরাং উহাকে দুই ভাগে ভাগ করা উচিত—(১) ২-২॥ হইতে ৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত ও (২) ৪ হইতে ৬ বৎসর বয়স পর্যন্ত। প্রথম স্তরের ১॥-২ বৎসর কাল শারীরিক বিকাশ, তাহাদের ভোজন, তাহাদের নিদ্রা ও জাগরণের সময়, তাহাদের মেলামেশার ব্যবস্থা ইত্যাদির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। পাশ্চাত্য দেশসমূহের ও এ দেশের বড় বড় সহরে যে শিশু-শিক্ষার ব্যবস্থা আছে তাহাতে শিশুদের শিক্ষার এই স্তরকে 'নার্সারী' স্কুল বলা হয়। যে নার্সারী স্কুলে আরও কম বয়সের শিশুদের লওয়া হয়

(যাহাদের মাতাপিতা সাধারণত বাহিরে কাজ করে) তাহাকে 'ক্রেশ' বলা হয়।

দ্বিতীয় স্তরের দুই বৎসর কালের শিক্ষার বুনিয়াদ হইবে মানসিক বিকাশ, অভ্যাসাদি ও প্রবৃত্তি ইত্যাদি পরিশুদ্ধ করা ও উহাদিগকে রচনাত্মক পথে চালিত করা। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সদ্‌গুণাবলীর সৃষ্টি করাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে। শিশু শিক্ষার এই দ্বিতীয় স্তরকে 'ইন্‌ফ্যাণ্টস্ স্কুল' বা 'কিণ্ডারগার্টেন' নামে অভিহিত করা হয়।

বড় বড় সহরে পাশ্চাত্য পদ্ধতির অনুকরণে শিশু-শিক্ষার প্রধানত দুইটি পদ্ধতি প্রচলিত আছে। (১) ফ্রোয়েবেলের কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি ও (২) মণ্টেসরীর পদ্ধতি। এই দুই পদ্ধতি কি ও পূর্ব-বুনিয়াদী শিক্ষায় উহা কতদূর গ্রহণ করা যায়, তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করা হইতেছে।

কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি

ফ্রোয়েবেলের কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতির শিক্ষা-ব্যবস্থা ৫ হইতে ৭ বৎসর বয়সের শিশুদের জন্য। শিশুদের শিক্ষার জন্য তিনি কতকগুলি নির্দিষ্ট কার্য ও খেলার ব্যবস্থা করেন। তিনি একজন বড় দার্শনিক ও চিন্তাশীল ব্যক্তি ছিলেন। তিনি শিশুদের জীবন ও তাহাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও প্রবণতা-সমূহ গভীরভাবে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি যেসব ক্রীড়া ও কার্যের ব্যবস্থা করেন তাঁহার মতে সেগুলিতে শিশুদের স্বাভাবিক ক্রিয়াদি ও প্রারম্ভিক চেষ্টাসমূহকে ভালভাবে প্রদর্শন করা যাইতে পারে। খেলাধূলা ফ্রোয়েবেলের পদ্ধতির এক প্রধান অঙ্গ। তজ্জন্য তিনি বহু বিশেষ শিক্ষাপ্রদ খেলনার (এডুকেটিভ্ টয়েজ্) প্রবর্তন করেন। উহা তাঁহার পদ্ধতির এক বিশেষত্ব। তিনি মনে করিতেন যে আসল তত্ত্ব মানুষের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত থাকে। প্রতীক স্বরূপে (সিম্বল্) কতিপয় কাল্পনিক ক্রিয়ার দ্বারা তাহাদিগকে বাহিরে প্রদর্শন করা সম্ভব। আর ঐসব কাল্পনিক ক্রিয়াদি গণিতের বিভিন্ন আকারেও প্রদর্শন করা যাইতে পারে। একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক। শিশুদের পক্ষে বৃত্তাকারে একত্র হওয়া সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক। কিন্তু ফ্রোয়েবেল প্রবর্তিত ক্রীড়াসমূহে বৃত্তাকারে একত্র করার ব্যবস্থা এইজন্য করা হইয়াছে যে তিনি তাহার দ্বারা শিশুগণকে সামুদায়িকতা ও একতার

শিক্ষা দিতে চাহেন। খেলা ছাড়া তিনি যে সব কাজ প্রবর্তন করেন তাহাও শিশুদের কল্পনাশক্তির বিকাশের উদ্দেশ্যেই করা হয়। শিশুদের কল্পনাশক্তি সম্বন্ধে তাঁহার এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তাহারা তাহাদের প্রকাশ্য কাজের মাধ্যমে উহার আভ্যন্তরীণ তত্ত্ব পর্যন্ত পৌঁছিয়া যাইতে পারে।

এইভাবে তিনি শিশুদের শিক্ষায় তাহাদের কল্পনাশক্তি বিকাশের উপর খুবই গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি শিশুদের জন্য যে সব আকর্ষক কাজ প্রবর্তন করেন তন্মধ্যে বাগানের কাজ প্রধান। কিন্তু সত্যিকারের তিনি বাগানের কাজ না দিয়া তাহাদের জন্য বাগানের কাজের প্রতীক কৃত্রিম ক্রিয়াদির ব্যবস্থা করেন। ফ্রোয়েবেল শিশুদের কল্পনাশক্তির বিকাশের জন্য কেন যে কৃত্রিম ক্রিয়াদির উপর এত গুরুত্ব দিয়াছিলেন তাহা শিশুদের ক্রীড়া সম্বন্ধীয় স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও প্রবণতা লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যায়।

শিশুরা নিজেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যে সব খেলা খেলিয়া থাকে তাহার অধিকাংশ খেলাতেই গৃহের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কাল্পনিক অনুকরণ করা হয়। শিশুরা তাহাদের মাতার রান্নাবান্নার অনুকরণে খেলা করে তাহা অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। কিন্তু উহাতে যে সব উপকরণ তাহারা ব্যবহার করে তাহা সবই কৃত্রিম ও কাল্পনিক। তাহারা রান্না করিবার জন্য আসল উনান, কয়লা বা খাদ্য সামগ্রী লইয়া ব্যবহার করিবার চেষ্টা করে না। তাহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উহার পরিবর্তরূপে কৃত্রিম দ্রব্যাদি ব্যবহার করে। কৃত্রিম উনান তৈয়ারী করে, চাউলের পরিবর্তে মাটির গুঁড়া বা সুরকী ব্যবহার করে, তরিতরকারির স্থলে ইটের বা পাথরের টুকরা লয়। এইভাবে অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া ঘরের খুঁটিগুলিকে মানুষ কল্পনা করিয়া লইয়া উহাদের সম্মুখে তাহাদের প্রস্তুত কৃত্রিম অন্নব্যঞ্জন রাখিয়া দিয়া তাহাদিগকে আহার করিবার জন্য বলে। শিশুরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অন্যান্য যে সব খেলা খেলে তাহা লক্ষ্য করিলেও বুঝা যায় যে কল্পনাশক্তি অনুশীলনের দিকে তাহাদের ঝোঁক। অর্থাৎ তাহাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইতেছে কৃত্রিম দ্রব্যাদির মাধ্যমে কল্পনার সাহায্যে বাস্তবে পৌঁছিবার দিকে।

কিন্তু ফ্রোয়েবেলের প্রবর্তিত কোন কোন কাজ এমন হইয়াছে যাহাতে কল্পনা ও বাস্তবের দূরত্ব এত বেশী যে কল্পনা দ্বারা সত্যে পৌঁছানো সহজে সম্ভব

নহে। শিশুদের কল্পনাশক্তির বিকাশের জন্য কাল্পনিক কিছু ক্রীড়া বা কাজের ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক কিন্তু তাহাতে কল্পনা ও সত্যের মধ্যে নিকট সম্পর্ক থাকা উচিত এবং গৃহ ও গৃহের আশপাশের জীবনের সহিত তাহার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকা আবশ্যক। নচেৎ যে উদ্দেশ্যে উহাদের প্রবর্তন করা হইবে তাহা সার্থক হইবে না। এজন্য ফ্রোয়েবেলের প্রবর্তিত ক্রীড়া ও কার্যাদির অধিকাংশই অবাস্তব ও কৃত্রিম হইয়া গিয়াছে। এজন্য তাহা খুব কমই ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

মণ্টেসরী পদ্ধতি

ফ্রোয়েবেলের পর বিশেষ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন যিনি তিনি হইলেন মাদাম মণ্টেসরী। তিনি শিশু-শিক্ষার নূতন পদ্ধতি রচনা করেন। মণ্টেসরী স্কুল ৩ হইতে ৬ বৎসর বয়সের শিশুদের জন্য। তিনি তাঁহার স্বদেশ ইটালীর রাজধানী রোমনগরে এক নূতন পদ্ধতিতে স্বল্পবুদ্ধি শিশুদের শিক্ষার পরীক্ষাকার্য শুরু করেন এবং তাহা হইতে তিনি অনুমান করিয়া লন যে ঐ পদ্ধতি সাধারণ শিশুদের জন্যও উপযোগী হইবে। তাঁহার প্রবর্তিত পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইন্দ্রিয় শিক্ষণ। তিনি ইন্দ্রিয় শিক্ষণের জন্য অনেক সরঞ্জামের ব্যবস্থা করেন। ঐ সব সরঞ্জাম জ্যামিতির বিবিধ আকারের ভিত্তিতে গঠিত। তাঁহার পদ্ধতিতে প্রথম হইতেই লিখনপঠন শিখানো আরম্ভ করা হয়। তাঁহার প্রবর্তিত সমগ্র শিক্ষা এক সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থার মধ্যেই বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। এজন্য মণ্টেসরী পদ্ধতিতে ছাত্রদিগকে শিক্ষয়িত্রীর বিশেষ কিছু দেখাইতে বা বুঝাইতে হয় না। ইহাতে শিশুদের স্বাতন্ত্র্য থাকে ও তাহারা আত্মনির্ভরশীল হইবার সুযোগও পায়।

দুই পদ্ধতির তুলনা

এক্ষণে ফ্রোয়েবেলের ‘কিণ্ডারগার্টেন’ পদ্ধতি ও মণ্টেসরী পদ্ধতির তুলনা করা যাউক। (১) ফ্রোয়েবলের পদ্ধতি দর্শনের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। খেলা ইত্যাদির মধ্য দিয়া শিশুমনে সার্বজনীন ঐক্যের বোধ জাগ্রত করা এই শিক্ষার উদ্দেশ্য। মণ্টেসরী পদ্ধতির মূলে এরূপ কোন দর্শন নাই। উহার পশ্চাতে আছে বিজ্ঞান। মণ্টেসরী ছিলেন ডাক্তার ও বৈজ্ঞানিক। (২) যৌথ-

ভাবে শিক্ষাদান করা ফ্রোয়েবেলের বৈশিষ্ট্য। উহাতে যাহা কিছু করা হয় তাহা দল বাঁধিয়া করা হইয়া থাকে। শিক্ষায় সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির গুরুত্ব সম্পর্কে ফ্রোয়েবেল সর্বপ্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মণ্টেসরী অন্যদিকে ব্যক্তিগত ভিত্তিতে শিক্ষাদানের পক্ষপাতী। শিশুকে নিজস্ব গতিতে ও নিজস্বভাবে নিজের কাজ করিবার স্বাতন্ত্র্য দেওয়া হয়। এজন্য ফ্রোয়েবেলের পদ্ধতিতে বিভিন্ন শ্রেণীতে শিক্ষাদান করা হয় ও নিয়মিতভাবে সূচীও অনুসরণ করা হয়। কিন্তু মণ্টেসরী পদ্ধতিতে শ্রেণী বিভক্ত শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন স্বীকার করা হয় না। (৩) ফ্রোয়েবেল বিশ্বাস করিতেন যে খেলা-ধুলার মাধ্যমে শিশুদের ক্রিয়াশীলতা প্রকাশ পায়। খেলা শিশুমনের বিকাশের সর্বোত্তম উপায়। শৈশবাবস্থায় মানুষের পবিত্রতম আধ্যাত্মিকতার অভিব্যক্তি খেলার মাধ্যমে হইয়া থাকে। এজন্য শিশু শিক্ষাদানের প্রকৃষ্ট মাধ্যম হইতেছে খেলা। কিন্তু মণ্টেসরী খেলার বিশেষ শিক্ষাপ্রদ গুণ আছে বলিয়া মনে করেন না। তিনি ইন্দ্রিয় শিক্ষণের উপরেই অধিক গুরুত্ব দেন ও বলেন যে ঠিক সময়ে ঠিকমত ইন্দ্রিয় শিক্ষণ হইলে শিশুর বুদ্ধিবৃত্তির সম্যক বিকাশ সহজ-সাধ্য হইয়া থাকে। (৪) শিশুদের কল্পনাশক্তির বিকাশের জন্য ফ্রোয়েবেল রূপকথা ইত্যাদি গল্প শিখানোর পক্ষপাতী, কিন্তু মণ্টেসরী রূপকথার পক্ষপাতী নহেন। তাঁহার বৈজ্ঞানিক মন বাস্তবতার বাহিরে কল্পনার বিকাশ করার পক্ষপাতী নহে।

প্রচলিত শিশু বিদ্যালয়

এই দেশের সাধারণ শিশু বিদ্যালয়সমূহে কোথাও ফ্রোয়েবেল বা মণ্টেসরী পদ্ধতির হুবহু অনুকরণ করা হয় না। তবে তাহাতে এই সব শিক্ষা পদ্ধতির মূলনীতির অনেক কিছু স্বীকার করা হয়। শিশুদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই সব জীবনক্রিয়ার মধ্যে নানারূপ কাজ থাকে। তবে শিশুদের কাজই হইল খেলা। শিশুদের বিভিন্ন বয়সে উপযোগী বিভিন্ন কাজ ও বিভিন্ন প্রকার খেলার ব্যবস্থা করা হয়। খেলার জন্য নানারকম খেলনার আয়োজন করা হইয়া থাকে। এই সব খেলার ভিতর দিয়া শিশুরা যেমন আনন্দ লাভ করে তেমনই ইহার সাহায্যে তাহাদের ইন্দ্রিয়গুলির ও বুদ্ধির অনুশীলন হয়। প্রথম হইতেই শিশুদের

ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের বিভিন্ন কাজ করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। তাহার ফলে তাহারা বড়দের সাহায্য ছাড়া স্বাধীনভাবে নিজেদের প্রয়োজনীয় সব কাজ করিতে শিখে এবং সকলে সমবেতভাবে বিদ্যালয়ে সমাজের কাজ করিবার বিষয়েও শিক্ষালাভ করে।

পূর্ব-বুনিয়াদী এক বিচারধারা

নয়ী তালীম কোন পদ্ধতি নহে। উহা এক বিচার। পূর্ব-বুনিয়াদী নয়ী তালীমের এক অঙ্গ। সুতরাং উহাও এক বিচার। এজন্য পূর্ব-বুনিয়াদীতে একথা মান্য করা হয় না যে শিশুদের শিক্ষার জন্য কোন এক বিশেষ পদ্ধতিই অনুসরণ করিতে হইবে। প্রচলিত যে পদ্ধতির যাহা ভাল ও নয়ী তালীমের নীতির সহিত যাহার সামঞ্জস্য আছে তাহা পূর্ব-বুনিয়াদীতে গ্রহণ করা হয়। এজন্য কিণ্ডারগার্টেন, মণ্টেসরী প্রভৃতি প্রচলিত শিশু-শিক্ষা পদ্ধতির যাহা কিছু নয়ী তালীমের বিচারের অনুকূল তাহা পূর্ব-বুনিয়াদী শিক্ষায় গ্রহণ করা হইয়াছে। 'শিক্ষাদান কিরূপে হওয়া উচিত' অধ্যায়ে যে আলোচনা করা হইয়াছে তাহাতে বুঝা যায় যে নয়ী তালীম সহজ শিক্ষার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং বিশেষ কোন শিক্ষা-পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া শিক্ষাদান করা সহজ শিক্ষণের পক্ষে বিঘ্নকর। এজন্যই বিনোবাজী বলিয়া থাকেন যে শিক্ষা বীজগণিতের কোন ফরমূলা (সংকেতসূত্র) নহে যে সেই অনুসারে অঙ্ক কষিলেই ঠিক উত্তর বাহির হইয়া যাইবে।

পূর্ব-বুনিয়াদীতে জীবনক্রিয়া, খেলা ও সৃজনাত্মক বা উৎপাদক কার্যের ভিতর দিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়। এই দিক দিয়া মণ্টেসরী, কিণ্ডারগার্টেন প্রভৃতি শিশু-শিক্ষা পদ্ধতির সহিত পূর্ব-বুনিয়াদীর সাদৃশ্য আছে বটে কিন্তু ঐসব পদ্ধতিতে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে তৈয়ারী যে সব সরঞ্জাম ব্যবহার করা হইয়া থাকে, পূর্ব-বুনিয়াদীর দৃষ্টিতে উহার দ্বারা সহজভাবে শিক্ষা হইতে পারে না। পূর্ব-বুনিয়াদীতে শিশুদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ও পারিপার্শ্বিক বাস্তবতার সহিত তাহাদের খেলা ও কাজের যাহাতে সরাসরি সম্বন্ধ থাকে সে বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়, যাহাতে সাদাসিধা স্থানীয় ও সহজপ্রাপ্য সরঞ্জামাদি ব্যবহার করা হয় এবং ঐগুলি কৃত্রিম না হয় সেদিকেও বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। স্বাভাবিক জীবনযাত্রার সূত্রে ও বাস্তব

পরিবেশে যাহা উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হয় তাহাই গ্রহণ করা হয়। স্থান, কাল, পরিবেশ ও পরিস্থিতিভেদে পূর্ব-বুনিয়াদী বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করিতেছে বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু নীতি ও বিচার একই থাকে। স্থান ও পরিবেশভেদে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সরঞ্জাম ও শিক্ষা-কৌশল অবলম্বন করা যাইতে পারে।

ইন্দ্রিয় সম্পর্কীয় শিক্ষার লক্ষ্য

পূর্বে বলা হইয়াছে যে মণ্টেসরী পদ্ধতিতে ইন্দ্রিয়-শিক্ষণের জন্য অনেক রকম শিক্ষাপ্রদ বাঁধাধরা যন্ত্রাদি ও সরঞ্জাম তৈয়ারী থাকে। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়কে অন্যান্য ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। পূর্ব-বুনিয়াদীতে ইন্দ্রিয় শিক্ষার জন্য কোন যন্ত্রাদি ব্যবহার করা হয় না। উহাতে উপকরণের আকার বা প্রকারের কোনরূপ বাঁধাধরা নিয়ম নাই। স্থান ও পরিস্থিতি-ভেদে উপযোগী যে কোন উপায় ইন্দ্রিয় শিক্ষার জন্য অবলম্বিত হইতে পারে। উহাতে শাস্ত্রীয়তার নামে কৃত্রিম কিছু ব্যবহার করা হয় না। বিনোবাজী এ সম্পর্কে বলেন,—

"যে গ্রামে নদী আছে সেখানে ছেলেদের সাঁতার শিক্ষা দেওয়ার ভিতর দিয়া কি তাহাদের বিকাশ সাধন করা যাইবে না? ইন্দ্রিয় বিকাশের পক্ষে গ্রামের স্বাভাবিক পরিবেশ অনুকূল নহে কি? গোবর কুড়ানো এবং ফুল কুড়ানো প্রভৃতিকে শিক্ষাদানের উপায় স্বরূপ গ্রহণ করা কি সম্ভব নহে? এই সব কাজের ভিতর দিয়া কি শিক্ষা দেওয়া যায় না?"

বিনোবাজী পূর্ব-বুনিয়াদীতে ইন্দ্রিয়-শিক্ষণের উপর অধিক গুরুত্ব দিতে রাজি নহেন। স্বাভাবিক জীবনক্রিয়া চলিতে চলিতে ইন্দ্রিয়-বিকাশ আপনা-আপনি হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়ের অভিরুচি ভালর দিকে লইয়া যাওয়া ইন্দ্রিয়-সম্পর্কীয় শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। বিনোবাজী বলেন—

"পশুদেরও তো ইন্দ্রিয় বিকাশ হইয়া থাকে। তাহাদের ইন্দ্রিয় শিক্ষণের জন্য কি কোন মণ্টেসরীতে যাইতে হয়? ব্যাঘ্রের একটি ইন্দ্রিয়ের বিশেষ বিকাশ হইয়া থাকে। অন্য পশুদের তাহা কম হয়। ব্যাঘ্রের ঘ্রানেন্দ্রিয় অত্যন্ত প্রখর হয়। আপনারা লক্ষ্য করিয়া

থাকিবেন যে পরিস্থিতি যতই বিষম হয় ইন্দ্রিয়ের বিকাশও ততই অধিক হইয়া থাকে। এজন্ম ইন্দ্রিয় বিকাশের শক্তি খুব বড় কথা নহে। শিক্ষার দৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় ও প্রধান কথা হইতেছে ইন্দ্রিয়ের রুচিকে পরিশুদ্ধ করা। কৃত্রিম জীবন-যাপন করিলে ইন্দ্রিয় পরিশুদ্ধ হয় না বরং উহা বিকৃত হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয় বিকৃতির এই প্রক্রিয়া সহর ও গ্রাম উভয় ক্ষেত্রেই চলিতেছে।"

শিশু-শিক্ষা সম্পর্কে গান্ধীজীর বিচারধারা

শিশুদের শিক্ষা সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছিলেন,—

"আমরা যাহাতে সমস্ত ছেলেদের আকৃষ্ট করিয়া আনিতে পারি সেরূপ চেষ্টা আমাদের করা উচিত। কেহ না আসিলে তাহার জন্ম আমরা নিজেরা দোষী হইব। এই সব ছোট ছোট ছেলেকে টানিবার জন্ম আমাদিগকে যথেষ্ট আকর্ষণ সৃষ্টি করিতে হইবে। আমাদের কাছে যে সব ছোট ছেলে থাকিবে তাহারা সকলেই আমাদেরই সন্তান এরূপ ভাবনা রাখিয়া চলিতে হইবে। যদি উহাদের মন সবল হইয়া গড়িয়া উঠে এবং সাধারণ সভ্যতা শিখিয়া যায় তবে আমাদের কাজ সফল হইল বলিয়া বুঝিতে হইবে। ছেলেরা ভাঙ্গাচুরা করিতে শেখে ইহা আমি বিশ্বাস করি না। আমি অনেক ছেলেকে শিক্ষাদান করিয়াছি। কাহাকেও দুষ্টু হইতে দিই নাই। ছেলেরা যদি আমার হাতে থাকে তবে আমি তাহাদিগকে এমন শিক্ষা দিব যাহাতে ছেলেবেলা হইতেই তাহারা যেন দুষ্টামি না করে অথবা জিনিসপত্রাদি ভাঙ্গিতে বা নষ্ট করিতে না শিখে। বরং তাহারা যাহা করিবে তাহা সৃজনাত্মক হইবে।

"আমি ইহা বিশ্বাস করি না যে ছেলেরা জন্ম হইতে ভাল বা মন্দ থাকে। হ্যাঁ, তাহাদের স্বভাব নিশ্চয়ই কিছুটা ভিন্ন ভিন্ন ধরণের হইয়া থাকে। তাহা ঠিক করিয়া লইতে হইবে। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে যখন সন্তান মায়ের গর্ভে আসে তখন হইতেই তাহার শিক্ষা আরম্ভ হইয়া যায়। এই ভিত্তিতে বয়স্ক শিক্ষা দেওয়া উচিত। বড়দের সংস্কার ছেলেদের উপর ক্রিয়া করিয়া থাকে এবং ছেলেদের সংস্কার

উহা হইতে গড়িতে শুরু করে। ছেলেদের হাত-পা সর্বদা নড়াচড়া করিতে থাকে এবং অনেক সময় উহারা নিজেরাই অনেক কিছু করিতে থাকে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ কার্য গঠনাত্মক, ধ্বংসাত্মক নহে।

"দুই-আড়াই বৎসরের ছেলেরা যদি আমার হাতে আসে এবং আমি যেরূপ শিখাইব সেইরূপ যদি তাহারা তাহাদের হাতপায়ের ব্যবহার করিতে থাকে তবে তাহাদের এতদূর উন্নতি হইবে যে তাহার সীমা থাকিবে না। উহাদিগকে ভালবাসা দিয়া শিখাইতে হইবে, মারপিট করিয়া নহে।"

শিশুদিগকে বুনিয়াদী শিক্ষালাভের উপযুক্ত পাত্র করিয়া গড়িয়া তোলা পূর্ব-বুনিয়াদীর লক্ষ্য হওয়া উচিত। শিশুদের বিশিষ্ট চালচলন, গতি-প্রকৃতি ও উহাদের মনস্তত্ত্ব বিবেচনা করিয়া পূর্ব-বুনিয়াদী শিক্ষার কার্যক্রম রচিত হওয়া উচিত। শিশুরা সর্বদা হাত-পা চালায়। তাহারা সব সময় যাহা হউক একটা কিছু করিতে চায়। পিতামাতা তথা শিক্ষকের কাজ হইবে উহাকে সৃজনাত্মক পথে চালিত করা। ছোট ছেলেমেয়ে যখন মাকে বিরক্ত করে তখন মা তাহাকে কোন না কোন কাজ করিতে বলেন—"ঐ বাটিটা আন্। ঐ কাপড়টা ওখানে রেখে আয়, একটু জল ওখান থেকে নিয়ে আয়"—ইত্যাদি ইত্যাদি। শিশু তাহা করিতে ভালবাসে এবং অক্লান্তভাবে তাহা করিয়া থাকে। তাহার হাতপায়ের নড়াচড়াকে এমন ভাবে পরিচালিত করিতে হইবে যাহাতে তাহাদের জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় কাজ করিবার প্রবৃত্তি সৃষ্টি হইতে থাকে।

শিশুদের আর একটি স্বাভাবিক প্রবণতা এই যে তাহারা সব সময়ে স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভর হইতে সচেষ্ট থাকে। অন্যে তাহাকে খাওয়াইয়া দিতে চাহিলেও তাহারা নিজেদের হাতে খাইতে চাহে। তাহাদের জামা-কাপড় পরাইতে গেলে তাহারা নিজেরা জামাকাপড় পরিতে চেষ্টা করে, তাহাদিগকে স্নান করাইতে গেলে তাহারা নিজের হাতে জল লইয়া স্নান করিতে চেষ্টা করে। ক্রিয়াশীলতা ও স্বাবলম্বন-প্রবণতা শিশুদের এই দুই স্বাভাবিক গুণই শিশু-শিক্ষার বুনিয়াদ। ঐ দুই গুণকে ভিত্তি করিয়া অগ্রসর হইলে শিশুদের সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন করা সহজসাধ্য হইবে।

শিশুর গুণ-বিকাশ

সৃজনাত্মক ক্রিয়াশীলতার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর গুণ-বিকাশের দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত। স্নেহের সহিত আজ্ঞা পালন করাইবার চেষ্টা করিলে তাহাতে শিশু নম্রতাপূর্বক আজ্ঞা পালন করিতে শিখিবে। শিশুরা স্বভাবত খুবই অনুকরণপ্রিয়। এজন্য শিশুদের মধ্যে সদ্‌গুণ বিকাশের প্রধান উপায় হইতেছে শিশুদের মাতাপিতা ও শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের সদগুণ-সম্পন্ন হওয়া, শিশুরা তাঁহাদের অনুকরণে ভাল অভ্যাস শিখে। যেমন ভাল অভ্যাসের দ্বারা বালকের গুণ-বিকাশ হইয়া থাকে সেইরূপ খেলাধূলার দ্বারা তাহার ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ও বিকাশ হইয়া থাকে। খেলার দ্বারা বুঝা যায় শিশুর মধ্যে কোন্ কোন্ গুণ আছে। ইহা লক্ষ্য রাখা উচিত যে শিশুদের খেলা যেন কাজে এবং কাজ যেন খেলায় পরিণত হয়। মহাত্মা গান্ধী বলিতেন যে তিনি বার বৎসর বয়স পর্যন্ত যাহা কিছু শিখিয়াছেন তাহা খেলাচ্ছলে শিখিয়াছেন।

শ্রীমতী শান্তা নারুলকর তাঁহার 'পূর্ব-বুনিয়াদী' নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে ছোট ছেলেমেয়েদের খেলার উপকরণ এমন হওয়া চাই যাহাতে—

(১) উহারা তাহাদিগকে সক্রিয় করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারে ;
(২) উহারা তাহাদের ব্যক্তিত্ব বিকশিত করিতে পারে ;
(৩) উহারা তাহাদের বুদ্ধির বিকাশে সহায়ক হয় ;
(৪) জীবনের পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সঙ্গে উহাদের মিল থাকে ; এবং
(৫) উহারা তাহাদের সৃজনশক্তির বিকাশ সাধন করিতে পারে।

শিশুদের বিস্তৃত স্থান প্রয়োজন

খুব ছোট ছেলেদিগকে কোন নির্দিষ্ট খেলা বা কাজ দেওয়া সম্ভব নহে। উহাদের চারিপাশের পরিবেশ এরূপ রাখিতে হইবে যাহাতে তাহারা তাহাদের মন যেরূপ চায় সেরূপ ভাবে খেলিতে পারে ও সেরূপ ভাবে তাহাদের দ্বারা খেলাইয়া লওয়া যায়। এজন্য পূর্ব-বুনিয়াদী কেন্দ্রের পরিসর বড় হওয়া চাই। উপরন্তু বাড়ীতেও তাহাদের জন্য বড় স্থানের প্রয়োজন।

শিশুদের শরীর ও মনের স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাস্থ্যের জন্য ইহা বিশেষ প্রয়োজন। কারণ তাহারা একস্থানে বেশীক্ষণ স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। এদিক সেদিক চলাফেরা, ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে চায়। যে সব বাড়ীতে স্থান সংকীর্ণ সেই সব বাড়ীর শিশুদের গতিবিধি লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় যে ঐ সব বাড়ীর শিশুরা প্রায় সব সময় ছুটিয়া ছুটিয়া বাড়ীর বাহিরে আসিয়া এদিকে সেদিকে ঘুরিতে চায়।

কাজ ও খেলার উপকরণাদি

ছোট ছেলেদের কাজ ও খেলার উপকরণাদি এমন ভাবে সাজাইয়া-গুছাইয়া রাখা চাই যাহাতে তাহারা নিজেরা উহা সহজে লইতে পারে। তবেই তাহারা সহজে কাজ ও খেলায় মগ্ন হইয়া যাইতে পারে। শিক্ষকের কাজ হইবে তাহাদিগকে শুধু খেলার প্রক্রিয়া দেখাইয়া দেওয়া ও যাহাতে তাহারা সরঞ্জামাদি এদিক সেদিক ছুড়িয়া ফেলিয়া নষ্ট না করে এবং খেলা ও কাজের পর উহা ঠিকমত গুছাইয়া রাখে তাহা দেখা। পূর্ব-বুনিয়াদীতেও ছাত্রদের নায়কের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

অপেক্ষাকৃত বয়স্ক শিশুদের কাজের ব্যবস্থা

চার হইতে ছয় বৎসর বয়সের ছেলেদিগকে খেলা ছাড়া কিছু নিয়মিত কাজ দেওয়া যায়—যথা :—(১) সাফাই, (২) ভোজন, (৩) জল তোলা, (৪) সুতাকাটা, কাপাস পরিষ্কার করা, তুনাই করা ও পাঁজ করা, (৫) কৃষি, (৬) সঙ্গীত, ও (৭) চিত্রকলা।

সাফাই-এর মধ্যে শরীর সাফাই, দাঁত পরিষ্কার করা, হাত-পা ও মুখ ধোওয়া, চুল আঁচড়ানো, নখ কাটা, কাপড় সাফাই, খাদ্য-শস্যাদি পরিষ্কার করা ইত্যাদি বাড়ীতে করার কথা। যাহারা বাড়ীতে উহা নিয়মিত করে না শিক্ষক তাহাদিগকে উহা শিখাইয়া দিবেন। ভোজনও সাফাই-এর অন্তর্ভুক্ত। মাঝে মাঝে বাড়ী হইতে জলখাবার আনিতে বলিয়া বা যেখানে শিক্ষালয়ে জলখাবারের ব্যবস্থা থাকে সেখানে শিক্ষক ছেলেদের সঙ্গে খাইতে বসিয়া কেমন করিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে ভোজন করিতে হয় তাহা শিখাইয়া দিবেন। জল কি ভাবে পরিশুদ্ধ রাখা যায় এবং

অপরিষ্কার জল পান করিলে বা উহা খাদ্যাদি ও রন্ধনে ব্যবহার করিলে যে অসুখ হয় তাহা জলতোলার কাজ প্রসঙ্গে বুঝাইয়া দিতে হইবে।

সূতাকাটার কাজে কাপাস সাফ করার কাজ হইতে আরম্ভ করা উচিত। তকলীতে সূতাকাটা শিখিবে।

কৃষির কাজে কেয়ারী করিয়া শাক-সবজী লাগাইতে শিখিবে। মাটি খোঁড়া, সার দেওয়া, বীজ বপন করা, চারা রোপন করা, গাছে ও ক্ষেতে জল সিঞ্চন করা, ঘাস বা আগাছা তুলিয়া ফেলা ইত্যাদি শিখিবে।

এমন গীত, ছড়া ও গল্প শিখানো চাই যাহাতে তাহাদের মনোরঞ্জন হয় এবং যাহা সামাজিক ও নৈতিক দিক হইতে শিক্ষাপ্রদ হয়।

চিত্রকলায় প্রধানত হস্তকৌশল শিখানো হয় এবং উহার মধ্য দিয়া আলপনা প্রভৃতি সহজ চিত্রাঙ্কন শিখানো হয়। চিত্রকলার জন্য খড়ির টুকরা, কাঠের পটী, মাটীর বাটী, গাছ ও ঘাসের তৈয়ারী তুলি, রঙীন সূতা ইত্যাদি সাদাসিধা উপকরণ ব্যবহার করা হয়।

অন্যান্য কাজের সঙ্গে প্রকৃতি-নিরীক্ষণ করা শিখানো উচিত, যথা—(১) বিভিন্ন ঋতুতে রৌদ্র, বৃষ্টি, মেঘ, বিদ্যুৎ, গ্রীষ্ম, শীত, শিশির, কুয়াসা ইত্যাদি দেখিবে ও উহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করিবে ; (২) ভ্রমণ ও কাজের সময় বিভিন্ন প্রকারের গাছপালা এবং বিভিন্ন প্রকারের জীবজন্তু ও কীটপতঙ্গ চিনিতে শিখিবে। তাহাদের প্রকৃতি নিরীক্ষণ করিবে ও তাহারা মানুষের কে কি কাজে আসে তাহা জানিবে ও বুঝিবে।

শিশুদের বয়স ভেদে শিক্ষাক্রমে কমবেশী

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। জন্মের পর ১০।১৫ দিন পর্যন্ত শিশুর ওজন কমিতে থাকে। তাহার পর ১॥ বৎসর পর্যন্ত ওজন বরাবর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ২ হইতে ৫ বৎসর পর্যন্ত ওজন আর বিশেষ বাড়ে না উহা প্রায় স্থির থাকে। ৫ হইতে ৭ বৎসর পর্যন্ত উহা আবার দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। জন্ম হইতে ২ বৎসর পর্যন্ত এবং ৫ হইতে ৭ বৎসর বয়স্ক শিশুদের মৃত্যুর অনুপাত সর্বাপেক্ষা বেশী। এজন্য কোন কোন শিক্ষা-বিদ বলেন যে, ৫ হইতে ৭ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুদের উপর শিক্ষার বোঝা অধিক চাপানো উচিত নয়। এইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া পূর্ব-বুনিয়াদির শিক্ষাক্রম রচনা সঙ্গত কিনা তাহা বিশেষজ্ঞগণের বিচার করিয়া দেখা উচিত।

নয়ী তালীমে স্বাবলম্বন

নয়ী তালীমের ক্রান্তিকারী নীতি দুইটি :—(১) কোন উপযোগী শিল্প-শিক্ষার মাধ্যমে সর্ববিধ শিক্ষাদান; (২) স্বাবলম্বন। নয়ী তালীমের বুনিয়াদী পর্যায়ে এরূপ আশা করা হয় যে উক্ত শিল্প শিক্ষা করিতে করিতে ছাত্রেরা যে সব দ্রব্য উৎপাদন করিবে তাহার আয়ের দ্বারা বিদ্যালয়ের চলতি খরচ মিটানো যাইবে। জাকির হোসেন কমিটির রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে ইহা নিশ্চিত যে এই শিক্ষাদানের প্রক্রিয়ায় এমন আয় হইবে যাহাতে তাহার দ্বারা বিদ্যালয়ের চলতি খরচের অধিকাংশই নির্বাহ করা যাইতে পারিবে। মোটামুটিভাবে শিক্ষকের বেতন উক্ত আয় হইতে মিটাইবার নীতি গ্রহণ করা হয়। ওয়ার্ধা, সেবাগ্রাম ও অন্যান্য অনেক বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা হইতে বুঝা গিয়াছে যে ছাত্রছাত্রীদের উৎপাদিত দ্রব্যাদির আয় হইতে শিক্ষকের বেতন খরচ মিটানো যাইতে পারে।

এখন প্রশ্ন এই যে যদিও সরকারী বা বে-সরকারী কোন সূত্র হইতে বিদ্যালয়ের চলতি ব্যয় নির্বাহ করার ব্যবস্থা হইয়া যায় তথাপি স্বাবলম্বনের জন্য ঐরূপ প্রচেষ্টা করিবার প্রয়োজন হইবে কি? মহাত্মা গান্ধী যখন এই নূতন শিক্ষা-ব্যবস্থার কল্পনা প্রথম দেশের সম্মুখে রাখিয়াছিলেন তখন ৭টি প্রদেশে সবেমাত্র কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলী শাসনকার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন প্রাদেশিক সরকারগুলির হাতে যে আয় ছিল তাহার দ্বারা দেশের সর্বত্র অবৈতনিক বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল না। প্রাদেশিক সরকারের হাতে শিক্ষার বাবদ খরচের জন্য যে আবগারী আয় ছিল প্রদেশে মাদক-বর্জন কার্যকরী করা হইলে শিক্ষার জন্য আর কোন আয় সরকারের হাতে থাকিত না। অর্থাৎ অবস্থা এরূপ ছিল যে প্রাদেশিক সরকারগুলিকে কার্যত মাদকদ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া তাহার আয় হইতে শিক্ষার ব্যয় চালাইতে হইতেছিল।

ইহা মহাত্মা গান্ধীর নিকট অসহনীয় ছিল। তাই তিনি চাহিয়াছিলেন যে কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করা মাত্রই মাদকতা নিরোধ যেন তাঁহাদের জনকল্যাণসূচক প্রথম কার্য হয়। অন্যদিকে তিনি ইহাও চাহিতেন যে

অবিলম্বে বাধ্যতামূলক বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যবস্থা সার্বজনীনভাবে প্রচলন করা হউক। আর্থিক দৃষ্টিতে তাহা আদৌ সম্ভব ছিল না। এই অবস্থায় তিনি স্বাবলম্বী শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু যে সব শিক্ষাবিদ্ ও শিক্ষানুরাগীদের সম্মুখে তিনি তাঁহার পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছিলেন তাঁহারা তাঁহার মতো পরিপূর্ণ আশাবাদী হইতে পারেন নাই। এজন্য জাকির হোসেন কমিটি স্বাবলম্বন সম্বন্ধে সতর্কতামূলক অভিমত প্রকাশ করেন। স্বাধীনতা লাভের পর জাতীয় সরকার বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন বটে কিন্তু তাঁহারা স্বাবলম্বনের দিক বাদ দিয়া নয়ী তালীম শিক্ষা-পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন। বুনিয়াদী শিল্প-শিক্ষা কেবলমাত্র শিক্ষাদানের মাধ্যম স্বরূপ সরকার কর্তৃক অবলম্বিত হইয়াছে। ইহাকে সার্জেণ্ট স্কীম বলা হয় এবং এই সম্বন্ধে পূর্বে বলা হইয়াছে। সরকারী বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে এই সংশোধিত পদ্ধতি চালু করা হইয়াছে।

ঐ ভাবে বুনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থা চলিলে উহা নয়ী তালীমের দৃষ্টিতে সফল হইবে কিনা ভাবিয়া দেখা উচিত। আপাতদৃষ্টিতে এরূপ মনে করা যাইতে পারে যে স্বাবলম্বনের দৃষ্টি ত্যাগ করিয়া বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতি অনুসরণ করিলে সাফল্য লাভে কোন বাধা হইবে না। উপরন্তু যদি বিদ্যালয়ের ব্যয় অন্যভাবে চালাইবার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় তবে স্বাবলম্বনের প্রয়োজন আর থাকেই না—আপাতত এইরূপ মনে হইতে পারে। কিন্তু একটু গভীর-ভাবে চিন্তা করিলে বুঝা যাইবে যে এই ধারণা ভুল। কারণ যদি বুনিয়াদী শিল্প জড়বৎ বা যন্ত্রবৎ শিক্ষা না করিয়া বৈজ্ঞানিকভাবে শিক্ষা করা যায় তবে বিদ্যালয়ের চলতি ব্যয় নির্বাহের পক্ষে পর্যাপ্ত উৎপাদন না হইয়া যায় না। বিভিন্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা হইতে এরূপ দেখা গিয়াছে।

বৈজ্ঞানিকভাবে শিল্প শিক্ষা না দিলে নয়ী তালীমের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। জড়বৎ শিল্প শিক্ষায় শিক্ষাপ্রদ অনুবন্ধের সন্ধান পাওয়া যাইবে না এবং তাহার পরিণামস্বরূপ শিক্ষাদানের মাধ্যমরূপে মূল শিল্প শিক্ষার কোন সার্থকতাই থাকিবে না। বৈজ্ঞানিকভাবে শিল্প শিক্ষা দেওয়া কিরূপ এবং তাহাতে অনুবন্ধের দ্বারা বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষণের দ্বার কিরূপে উন্মুক্ত হয় তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা অন্যত্র আলোচনা করা হইয়াছে।

অতএব বিদ্যালয়ের সমস্ত ব্যয় চালাইবার মত সঙ্গতি অন্য সূত্র হইতে পাওয়া গেলেও বিদ্যালয়ের উৎপাদিত দ্রব্যাদির গুণ ও পরিমাণ এরূপ হওয়া অত্যাবশ্যক যাহাতে তাহার আয়ের দ্বারা বিদ্যালয়ের অন্তত চলতি ব্যয় নির্বাহ হইতে পারে। ইহা বুনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থার অপরিহার্য নীতি।

এ সম্পর্কে বিনোবাজীর সুচিন্তিত অভিমত এই যে নয়ী তালীমের বুনিয়াদী স্তরে স্বাবলম্বনের আদর্শ পর্যন্ত পৌঁছিবার শিক্ষা দেওয়া হইবে এবং উত্তর বুনিয়াদী স্তর হইতে স্বাবলম্বনের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হইবে।

মহাত্মা গান্ধী বুনিয়াদী শিক্ষায় স্বাবলম্বন সম্পর্কে জাকির হোসেন কমিটির সিদ্ধান্ত প্রারম্ভিক ও পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসাবে মানিয়া লইয়াছিলেন বটে কিন্তু তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই। তিনি অন্তর হইতে বিশ্বাস করিতেন যে 'স্বাবলম্বন বুনিয়াদী শিক্ষার কষ্টিপাথর'। তিনি জেল হইতে বাহির হইবার পর ১৯৪৫ সালের জানুয়ারী মাসে সেবাগ্রাম শিক্ষা সম্মেলনে নয়ী তালীমের ব্যাপক স্বরূপের কল্পনা প্রকাশ করেন এবং তদনুসারে পূর্ব-বুনিয়াদী, উত্তর বুনিয়াদী ও বয়স্ক-শিক্ষাকে নয়ী তালীমের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হয়। অতঃপর ১৯৪৬ সালে পাটনায় হিন্দুস্তানী তালীমী সঙ্ঘের বৈঠকে নয়ী তালীমী 'স্বাবলম্বন-এর প্রকৃত তাৎপর্য কি তাহা তিনি সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন যে বিদ্যালয়ে কিছু কিছু জিনিস উৎপন্ন হইবে, তাহা বিক্রয় করা হইবে এবং তাহার দ্বারা শিক্ষকের বেতনের খরচ কোনরূপে চালানো হইবে—নয়ী তালীমে স্বাবলম্বনের অর্থ এরূপ বুঝিলে অত্যন্ত ভাসাভাসা বুঝা হইল।

বিদ্যালয়কে ছাত্র ও শিক্ষকের দ্বারা সংগঠিত এক পরিবার স্বরূপ গণ্য করা উচিত এবং উহারই ভিত্তিতে স্বাবলম্বনের ব্যবস্থা হওয়া উচিত। ছাত্র-শিক্ষকের ঐ পরিবার হইবে শ্রমনিষ্ঠ, সহযোগী ও বিকাশোন্মুখ। ঐ পরিবারের জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য ভূমি, যন্ত্র, সরঞ্জামাদি, গরু, পুস্তকালয়, পরীক্ষাগার, গৃহাদি যাহা প্রয়োজন হইবে তাহা দেওয়া হইবে। উহা সমাজ বা সরকার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। অতঃপর বিদ্যালয়-পরিবার নিজের প্রয়োজন কি তাহা স্থির করিয়া ঐ সব উপকরণ লইয়া কাজ করিতে থাকিবে, আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি উৎপাদন করিবে ও তাহা হইতে তাহাদের প্রয়োজনমত গ্রহণ করিবে। স্বাবলম্বনের এই অর্থে শিক্ষক-ছাত্রের

ঐ পরিবার হইবে সহযোগী পরিবার। স্বাবলম্বনের দ্বারা ঐ সহযোগী পরিবার নিজেদের খাদ্য, বস্ত্র ও আবাসের প্রয়োজন মিটাইবে এবং এই ভাবে স্বাবলম্বনমূলক জীবন যাপন করিতে করিতে সামূহিক জীবনের নিয়মিত দিনচর্যা, স্বাধ্যায়, বিচার-আলোচনা, সৎসঙ্গ, প্রার্থনা, কীর্তন, ভজন, ব্যায়াম, অভিনয় ইত্যাদি দ্বারা জীবন গঠন করিবে ও মনোরঞ্জনমূলক অভ্যাসক্রম অনুসরণ করিতে করিতে বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক উভয় দিকে উন্নতি লাভ করিতে থাকিবে।

স্বাবলম্বন সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর এই ব্যাখ্যাকে বিনোবাজী আরও প্রসারিত করিয়াছেন। তিনি বলেন যে নয়ী তালীমে স্বাবলম্বন কেবলমাত্র আর্থিক হইলে চলিবে না। পরন্তু বৌদ্ধিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও স্বাবলম্বন হওয়া প্রয়োজন। আর্থিক ক্ষেত্রের স্বাবলম্বন হইতেছে অবিরোধী-উৎপাদক ও সহযোগী শ্রমের দ্বারা খাদ্য, বস্ত্র, আবাস ও জীবনের অন্যান্য সাংসারিক প্রয়োজন মিটানো। শৈক্ষিক (বৌদ্ধিক) স্বাবলম্বনে স্বাধ্যায়, পরস্পরের মধ্যে বিচার বিনিময়, গুরুজনদিগের উপদিষ্ট সেবা-কার্য এবং অধ্যয়নের দ্বারা জ্ঞানলাভ করিবার প্রযত্ন করিতে হয়। এরূপ স্বাবলম্বনমূলক জ্ঞানলাভের বিষয় গীতায় বর্ণিত আছে :

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া,
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনঃ তত্ত্বদর্শিনঃ ॥" ৪।৩৪

—জ্ঞানলাভের জন্য শিষ্য গুরুর নিকট নিজেকে বিনম্রভাবে সমর্পণ করিবে। গুরু যাহা উপদেশ দিবেন তাহা বিভিন্ন দৃষ্টি হইতে বিবেচনা করিয়া ঐ সম্পর্কে যে যে প্রশ্ন উঠিতে পারে তাহা গুরুর নিকট বিনীতভাবে উপস্থিত করিবে। এরূপে তাহার বিভিন্ন প্রকারের জ্ঞানলাভ হইতে থাকিবে। বিবিধ প্রকারের কল্যাণ ও সেবামূলক কার্য করিতে করিতে সে অনুভবসিদ্ধ জ্ঞানলাভ করিতে থাকিবে। অন্যান্য প্রকারেও জ্ঞানলাভের সুযোগ সে পাইবে। জ্ঞান-শিক্ষা-প্রদানকারী এই গুরু কিরূপ হইবেন? বিনোবাজী যে আদর্শ-শিক্ষকের কল্পনা করিয়া থাকেন, সেরূপ হওয়া চাই। অর্থাৎ তিনি তত্ত্বদর্শী হইবেন। তিনি পুস্তকের লিখিত শব্দের ব্যাখ্যাকারী মাত্র হইবেন না। তিনি প্রকৃত পক্ষে আচার্য হইবেন, অর্থাৎ তিনি জ্ঞান অনুসারে আচরণ করিবেন ও অন্যকে দিয়া তদ্রূপ আচরণ করাইবার

প্রযত্ন করিবেন। এরূপ গুরু সেবাকার্যের পথপ্রদর্শক হন। তিনি চাহিবেন যে শিষ্যগণ প্রশ্ন করুক এবং তিনি ঐ সব প্রশ্ন সাগ্রহে ও সযত্নে গ্রহণ করিয়া উহাদের সদুত্তর প্রদান করিতে করিতে প্রত্যেক বিষয়ের গভীরতায় প্রবেশ করিয়া উহার তত্ত্ব পর্যন্ত পৌঁছিবেন। ইহা বৌদ্ধিক স্বাবলম্বন শিক্ষার প্রক্রিয়া।

নৈতিক ও আধ্যাত্মিক স্বাবলম্বন সাধনের জন্য এবং সংযমশীল জীবন গঠনের জন্য উপযোগী দিনচর্যা প্রস্তুত করিয়া ও তাহা নিষ্ঠার সহিত অনুসরণ করিয়া সংযত জীবন যাপন করিতে হইবে। ইহাতে যুক্ত (সংযমিত) আহার-বিহার, যুক্ত কর্মপ্রচেষ্টা, যুক্ত নিদ্রা ও জাগরণের ব্যবস্থা থাকিবে। এইভাবে ব্রহ্মচর্যের জীবন যাপন করিতে থাকিলে বৈষয়িক ও বৌদ্ধিক স্বাবলম্বনের জন্য শক্তি সঞ্চয় হইবে। নয়ী তালীমের সকল স্তরে অবস্থা অনুসারে এরূপ স্বাবলম্বনের প্রয়োজন আছে। সুতরাং তজ্জন্য প্রযত্ন করা উচিত। তবেই নয়ী তালীমের সার্থকতা সম্পাদিত হইবে।

স্বাবলম্বন সম্পর্কে পূর্বের আলোচনা হইতে শিক্ষায় আর্থিক স্বাবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এই স্পষ্ট ধারণা হইয়াছে যে,—(১) বিদ্যালয়ের উৎপন্ন দ্রব্যের আয় হইতে বিদ্যালয়ের চল্‌তি ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা হওয়া উচিত এবং (২) শিক্ষার ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থার জন্য স্বাবলম্বনের প্রয়োজন না হইলেও শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনের জন্য উহার প্রয়োজন আছে। কারণ, যদি মূল হস্তশিল্পকে বৈজ্ঞানিকভাবে চালানো ও শিক্ষা দেওয়া হয় এবং উহার অনুবন্ধে শিক্ষাদান প্রণালীর সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার করা হয় তবে স্বাবলম্বনের জন্য বিশেষ প্রযত্ন না করিলেও উহাতে স্বাবলম্বনের পক্ষে পর্যাপ্ত উৎপাদন না হইয়া পারে না। স্বাবলম্বনের পক্ষে পর্যাপ্ত উৎপাদন না হইলে বুঝিতে হইবে শিক্ষাদানের উক্ত প্রণালী ঠিকমত কাজে লাগানো হয় নাই। শিক্ষায় স্বাবলম্বন যে অত্যাবশ্যক তাহার কারণ মাত্র উহা নহে। উহার এক গভীরতর কারণ আছে। ঐ গভীরতর কারণটি কি এবং স্বাবলম্বনের পশ্চাতে কি দর্শন আছে তাহা জানা গেলে তবে স্পষ্ট বুঝা যাইবে কেন শিক্ষায় স্বাবলম্বন অপরিহার্য।

মনুষ্যের বৈশিষ্ট্য

মানুষের বুদ্ধি আছে ও বিচারশক্তি আছে—(ম্যান্ ইজ্ এ র‍্যাশ্যাস্থাল এনিম্যাল)। ইহাই মানুষের বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যই পশু হইতে তথা অন্য

সমগ্র জীব-জগৎ হইতে মানুষকে পৃথক করিয়াছে এবং জীব-জগতে তাহাকে সর্বোচ্চ স্থান প্রদান করিয়াছে। পশু বা অন্য জীবের বুদ্ধি নাই। অন্তত বিচারশক্তি প্রয়োগের মত বুদ্ধি উহাদের নাই। উহারা সর্ব বিষয়ে সহজাত প্রেরণা বা প্রবৃত্তি (ইন্‌স্টিংকট্) দ্বারা চালিত হয়। সহজাত প্রেরণার বাহিরে উহাদের কোন ক্রিয়াশীলতা নাই। খাদ্য বা অন্য কোন আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি উহারা উৎপাদন করিতে পারে না। প্রকৃতি মনুষ্যকে যেরূপ বুদ্ধি বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়াছেন সেরূপ উহাদের দেন নাই। উহারা সহজাত প্রবৃত্তিবশে অন্যের উৎপন্ন খাদ্যাদি সংগ্রহ করে ও তদ্বারা উদর পূর্তি করে। উহাদের গুণাগুণ যাহা আছে তাহা তাহারা নিজেদের কোন প্রযত্নের দ্বারা লাভ করে নাই। কুকুর প্রভুভক্ত। ভক্তির অনুশীলন করিয়া কুকুর প্রভুভক্ত হইতে শিখে নাই। উহা তাহার সহজাত প্রবৃত্তি। উহার মধ্যে কুকুরের নিজের কোন কৃতিত্ব নাই। ব্যাঘ্রের ঘ্রাণ শক্তি প্রবল। ঘ্রাণশক্তির প্রাবল্য সম্পাদনের জন্য কোন মণ্টেসরী বিদ্যালয়ে উহার ইন্দ্রিয় শিক্ষণের (সেন্‌স্ ট্রেনিং) ব্যবস্থা করিতে হয় নাই। উহা তাহার সহজাত বৃত্তি।

কিন্তু মানুষের বুদ্ধি আছে, বিচার শক্তি আছে। ভগবান তদনুরূপ তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়াছেন। তাহাকে কাজ করিবার জন্য দুই হাত দিয়াছেন। দুই পা দিয়াছেন। বুদ্ধি ও দুই হাতের সাহায্যে মানুষকে তাহার খাদ্যাদি যাহা কিছু প্রয়োজন উৎপাদন করিয়া লইতে হয়। মানুষের মধ্যে সকল গুণই অন্তর্নিহিত হইয়া রহিয়াছে। তাহার আত্মা সকল গুণের আকর। কিন্তু তাহা সুপ্ত থাকে, লীন (লেটেণ্ট) থাকে। শিক্ষার দ্বারা, অনুশীলনের দ্বারা, অভ্যাসের দ্বারা, প্রয়োজনের দ্বারা তাহার বহিঃপ্রকাশ সম্পাদন করিতে হয়। সহজাত বৃত্তিতে তাহা প্রকাশ পায় না। সহজাত প্রেরণা ও বৃত্তির স্থান মানুষের জীবনে খুব কমই আছে। যাহা আছে তাহা জীবতত্ত্ব সংক্রান্ত কয়েকটি বিষয়ে নিবদ্ধ,যেমন সন্তানের প্রতি মায়ের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। উপরন্তু প্রকৃতি মানুষকে যেমন বুদ্ধি ও বিচারশক্তি দিয়াছেন তেমনই তাহাকে স্বাধীনতাও দিয়াছেন। মানুষ স্বভাবত স্বাধীন। তাহার অর্থ হইতেছে এই যে সে ভাল হইতে পারে আবার মন্দও হইতে পারে। সে সদ্‌গুণের অনুশীলন করিয়া মহৎ হইতে পারে। আবার অসৎবৃত্তির দাস

হওয়াও শিখিতে পারে। পশু বা অন্য প্রাণীর সে স্বাধীনতা নাই। ভৌতিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সর্ব বিষয়ে মানুষের এই স্বাধীনতা আছে। মানুষরূপে মানুষকে যাহা হইতে হয় তাহা তাহার নিজের বিচার ও নিজের পুরুষার্থের দ্বারাই সাধন করিতে হয়। সেইখানেই মানুষের মনুষ্যত্বের প্রকাশ।

এজন্য স্বাবলম্বন ও আত্মনির্ভরতা মানুষের প্রকৃতির মূলে রহিয়াছে। মানুষকে মানুষ স্বরূপ গড়িয়া উঠিতে হইলে স্বাবলম্বন-বৃত্তির স্ফুরণের প্রয়োজন। নচেৎ তাহার মানুষ হইয়া গড়িয়া উঠা হয় না। মানুষের নৈতিকতা তাহার নিজেকে গড়িয়া তুলিতে হয়। আধ্যাত্মিকতার স্ফুরণ ও বিকাশ তাহার নিজের প্রচেষ্টায় করিতে হয়। অন্যে প্রেরণা দিতে পারে মাত্র। কিন্তু ঐ সম্পর্কে যাহা কিছু করিতে হইবে তাহা তাহার নিজেরই প্রযত্নের বলে করিতে হয়।

কিন্তু জীবনের একটি ক্ষেত্রে মানুষ স্বাবলম্বন ব্যতিরেকে চলিতে পারে। তাহা হইতেছে ভৌতিক প্রয়োজন মিটাইবার ক্ষেত্রে। মানুষ নিজের খাদ্য, বস্ত্র ইত্যাদি ভৌতিক প্রয়োজন সম্বন্ধে স্বাবলম্বী না হইয়া অন্যের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে পারে। ভৌতিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য মানুষ অন্যের উপর নির্ভরশীল হইয়া জীবন ধারণ করিতে পারে। অন্যের উৎপন্ন খাদ্যাদির দ্বারা দেহের পুষ্টিসাধন করিতে পারে। অন্যের উৎপাদিত বস্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া নিজের লজ্জা নিবারণ ও শীতাতপ নিবারণ করিতে পারে। মনুষ্য সমাজের দুঃখকষ্টের মূল কারণ এইখানেই। মানুষ যেখানে তাহার ভৌতিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ঐ ভাবে পরাবলম্বী হইয়া থাকে, সেখানে মানুষ তাহার মনুষ্যত্ব হইতে বিচ্যুত হইয়া পশুত্বের পর্যায়ে নামিয়া যায়। তত্ত্ব ও বিচারের দিক হইতে এরূপ ভাবা অনুচিত হইবে না। এজন্য সত্যিকারের শিক্ষার অর্থ হইতেছে মানুষকে মানুষস্বরূপ গড়িয়া উঠিতে সহায়তা দান করা অর্থাৎ সর্ব বিষয়ে (ভৌতিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক) স্বাবলম্বী হইবার শিক্ষা দান করা।

সামাজিক স্বাবলম্বন

স্বাবলম্বন সম্পর্কে আর একটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের উল্লেখ এখানে করা প্রয়োজন। মানুষ কেবলমাত্র বুদ্ধিসম্পন্ন জীব নহে। মানুষ সমাজবদ্ধ

জীব (ম্যান ইজ এ সোশ্যাল এনিম্যাল)। মানুষ একা থাকিতে পারে না। কেবলমাত্র পরিবার লইয়াও থাকিতে পারে না। তাহাকে সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতে ও জীবন ধারণ করিতে হয়। সমাজ জীবনের (কম্যুনিটি লাইফ) মধ্য দিয়া মানুষের মনুষ্যত্বের সার্থকতা সম্পাদিত হয়। সুতরাং সমাজের দৃষ্টি সম্মুখে রাখিয়া স্বাবলম্বন সাধন করিতে হইবে। স্বাবলম্বন শুধু ব্যক্তিগত হইলে চলিবে না—সঙ্গে সঙ্গে উহা সমষ্টিগত হওয়া চাই। কারণ কেবলমাত্র ব্যক্তি কেন্দ্রিক বা পরিবার কেন্দ্রিক স্বাবলম্বনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া অন্যের উপর তথা সমাজের উপর হইতে পারে; হইয়াও থাকে। আমার ও আমার পরিবারের খাদ্য-বস্ত্র উৎপাদন প্রচেষ্টার ফলে অন্যের খাদ্য-বস্ত্রাদি উৎপাদনে বাধা সৃষ্টি হইতে পারে। কোন ব্যক্তি পরিবারের মধ্যে সৎ, দয়ালু, সহানুভূতিশীল ও উদার হইতে পারে; কিন্তু পরিবারের বাহিরে সেই ব্যক্তিই তাহার বিপরীত হইতে পারে। তাহার ফলে সমাজে শোষণ ও উৎপীড়নের সৃষ্টি হইয়া থাকে। সুতরাং ভৌতিক ক্ষেত্রে হউক আর নৈতিক বা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে হউক স্বাবলম্বন সামাজিক ভিত্তিতে গড়িয়া তুলিতে হইবে। তবেই স্বাবলম্বনের সার্থকতা। ছাত্রাবস্থায় সমষ্টিগত (কম্যুনিটি) স্বাবলনের শিক্ষালাভ হইলে তবেই পরবর্তী জীবনে তাহার সম্যক বিকাশ হওয়া সম্ভব। ছাত্রাবস্থায় সমষ্টিগত স্বাবলম্বনের সুযোগ কোথায়? শিক্ষক ও ছাত্রগণের মিলিতভাবে এক সমষ্টি গঠন করিতে হইবে। সুতরাং শিক্ষক ও ছাত্রগণের মিলিত হইয়া সমগ্রভাবে স্বাবলম্বনের প্রচেষ্টা করিতে হইবে। উহার দ্বারা শিক্ষক ও ছাত্রগণের স্বাবলম্বী সমাজ গড়িয়া উঠিবে এবং তাহাতে প্রকৃত স্বাবলম্বনের শিক্ষালাভ হইবে।

কিন্তু এখন বিনোবাজী বলিতেছেন যে ১৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলে-মেয়েদের উপর এইভাবে তাহাদের শিক্ষা-খরচের দায়িত্ব চাপানো উচিত নহে। তিনি বলেন, "ভারতীয় সংস্কৃতি অনুসারে পনর বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেদের রক্ষণ ও পালন করিবার দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত। ঐ সময় পর্যন্ত তাহাদিগকে ভালভাবে স্বাবলম্বী করিয়া গড়িয়া তুলিবার দায়িত্ব রাজ্য, প্রতিপালক এবং সমাজের উপরই থাকে। উহার পরে ঐ দায়িত্ব কিছুতেই অন্যের উপর থাকা উচিত নহে।"

কিন্তু বর্তমানে বিপরীত অবস্থা চলিতেছে। সমাজের এক স্তরে ৬ বৎসরের বালকেরও উপার্জন করার প্রয়োজন হয় এবং অন্যদিকে ২৫ বৎসর পর্যন্ত বয়সের যুবক-যুবতীর :শিক্ষার সমস্ত ব্যয় রাষ্ট্রকে বা তাহাদের অভিভাবকদের বহন করিতে হয়। তাহারা নিজেরা সেজন্য কিছুই করে না। অন্যদিকে ৬ বৎসরের যে সব বালক-বালিকা গরু-মহিষ চরাইয়া তাহাদের পিতা মাতার বোঝা কিছু লাঘব করে তাহাদিগকে যদি লেখাপড়া শিখিবার জন্য বিদ্যালয়ে যাইতে বাধ্য করা হয় তবে তাহাদের দরিদ্র মাতা-পিতাকে ঐ আয় হইতে বঞ্চিত করা হয় ও তাহাদেরই উপর অধিকতর দারিদ্র্যের বোঝা চাপানো হয়। ইহা নিষ্ঠুরতা। নয়ী তালীম এই বৈষম্য দূর করিতে চায়। ১৫ বৎসর পর্যন্ত বালক-বালিকাকে স্বাবলম্বী হইবার জন্য শিক্ষা দেওয়া হইবে। বিনোবাজীর বিচার এই যে এই পনর বৎসর বয়সের মধ্যে বালক-বালিকাদের শিক্ষাপ্রাপ্তির প্রণালীতে যাহা কিছু উৎপাদন করা হইবে তাহার ব্যবহার তাহাদেরই পালন-পোষণের জন্য করা উচিত। তাহাদের শিক্ষার ব্যয় নির্বাহের জন্য উহার কিছুমাত্র ব্যয়িত হওয়া উচিত নহে। কিন্তু পনর বৎসরের অধিক বয়সের কোন বিদ্যার্থীর শিক্ষা-খরচের দায়িত্ব রাষ্ট্র বা তাহার অভিভাবক (মাতা-পিতা হউক বা গ্রামদানী গ্রাম হউক) গ্রহণ করিবেন না।

উত্তর বুনিয়াদী শিক্ষা

'উদ্গম ও ক্রমবিকাশ' প্রকরণে উত্তর বুনিয়াদী সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। উহাতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে ১৯৪২ সালের আন্দোলনের কারাবাস হইতে মুক্তির পর মহাত্মা গান্ধী নয়ী তালীমের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ করার প্রস্তাব করেন এবং ১৯৪৫-এর জানুয়ারীতে সেবাগ্রামে অনুষ্ঠিত নয়ী তালীম সম্মেলনে তাহার সুপারিশ অনুসারে হিন্দুস্তানী তালীমী সঙ্ঘ উত্তর বুনিয়াদী, পূর্ব-বুনিয়াদী ও বয়স্ক-শিক্ষাকে নয়ী তালীমের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গ্রহণ করেন। মহাত্মা গান্ধী উক্ত সম্মেলন উদ্ঘাটন করেন এবং অভিভাষণে বলেন,

"যদিও আমরা এযাবৎ নূতন শিক্ষা চালাইয়াছি তথাপি উহা এক

উপসাগরের মধ্যে ছিল। উন্মুক্ত সমুদ্রের তুলনায় উপসাগর সুরক্ষিত। উহাতে তবু কিছু রক্ষণ থাকে। আমাদের কার্যক্রমের বন্ধন ছিল। এখন আমরা উপসাগর হইতে ভরা সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইতেছি। সেখানে ধ্রুবতারা ভিন্ন আর কোন রক্ষক নাই। ঐ ধ্রুবতারা হইতেছে পল্লীশিল্প। এখন আমাদের ক্ষেত্র আর ৭ হইতে ১৪ বৎসর বয়সের বালকগণ পর্যন্ত থাকিতেছে না। এখন গর্ভাধীন হইতে মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের অর্থাৎ নয়ী তালীমের ক্ষেত্র প্রসারিত হইবে।"

ইহার অন্তর্নিহিত অর্থ এই যে পূর্ব-বুনিয়াদী হউক, উত্তর বুনিয়াদী হউক বা বয়স্ক-শিক্ষা হউক, উহারা প্রত্যেকে অশেষ সম্ভাবনাপূর্ণ। অশেষবিধ উপায়ে ও অশেষবিধ দিকে উহাদের বিকাশ সাধন করা সম্ভব। বিভিন্ন পরিবেশে, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে, বিভিন্নভাবে উহাদের বিকাশ হইতে পারে। একমাত্র স্থির বস্তু থাকিবে উপযোগী এক বা একাধিক গৃহশিল্প। উহা হইবে অকূল সমুদ্রে ধ্রুবতারার মত। আর কোন কিছু স্থির থাকিবে না। অন্য সবই বিভিন্ন ক্ষেত্র, পরিবেশ ও পরিস্থিতির উপর নির্ভর করিবে।

শিক্ষাক্রম

সেবাগ্রামের উক্ত সম্মেলনে উত্তর বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বিচার-বিবেচনা করা হয় এবং উহার জন্য একটি পরিকল্পনা ও শিক্ষাক্রম রচনা সমিতি নিযুক্ত করা হয়। ডঃ জাকির হোসেন, শ্রীসৈয়দেন, শ্রীরামশরণ উপাধ্যায়, শ্রীকুমারাপ্পা প্রভৃতি উহার সদস্য ছিলেন। ঐ সমিতি সমগ্র দেশের জন্য উত্তর বুনিয়াদীর এক পাঠ্যক্রম রচনা করেন এবং উহা মহাত্মা গান্ধীর নিকট উপস্থাপিত করা হয়। তিনি উহা দেখিয়া এবং ঐ সম্পর্কে শুনিয়া জানিতে চাহেন যে উত্তর বুনিয়াদী শিক্ষা গ্রহণেচ্ছু শিক্ষার্থীর সংখ্যা কত পাওয়া যাইবে। তাঁহাকে বলা হয় যে সেবাগ্রামে ১৫ জন ও বিহারে ২৫ জন বুনিয়াদী শিক্ষাক্রম সমাপ্ত করিয়া উত্তর বুনিয়াদী শিক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত আছে। তাহাতে তিনি এই মন্তব্য করেন,—

"না, এখন সেবাগ্রাম ও বিহারের যে সব ছাত্রেরা বুনিয়াদী শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াছে কেবলমাত্র তাহাদের সম্বন্ধে চিন্তা করুন। তাহাদের জন্যই শিক্ষাক্রম রচনা করুন। ঐ শিক্ষাক্রম এখন দেশের সম্মুখে রাখিতে বা প্রকাশিত করিতে হইবে না।"

তাঁহাকে ঐ সময় জিজ্ঞাসা করা হয়, "উত্তর বুনিয়াদীর পর কি হইবে? বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে চিন্তা করা যাউক।" তাহাতে তিনি বলেন, "না, এখন কেবলমাত্র উত্তর বুনিয়াদীর কথা ভাবিতে হইবে।" অর্থাৎ তিনি কাল্পনিক কোন কিছু করিতে রাজী ছিলেন না। কারণ ঐ রূপ কাল্পনিক চিত্রে তাঁহার বুদ্ধি কাজ করিত না। তিনি উপদেশ দেন যে বাস্তব অবস্থা ও প্রয়োজন অনুসারে কাজ করিয়া অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান সংগ্রহ করিতে করিতে অগ্রসর হওয়া উচিত। তিনি বলেন যে ঐ ভাবে অগ্রসর হইলে যেটুকু ফল হইবে তাহাই প্রকৃত কাজের হইবে।

উহার এক বৎসরের মধ্যে সেবাগ্রাম ও বিহারে উত্তর বুনিয়াদীর কাজ আরম্ভ করা হয়। সেবাগ্রামে পূর্ব-নির্ধারিত কোন শিক্ষাক্রম অনুসরণ করিয়া কাজ আরম্ভ করা হয় নাই। সেখানে দৈনন্দিন কাজের মধ্য দিয়া অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিক্ষাক্রম গড়িয়া উঠিতে থাকে। উহার পরিণাম স্বরূপ ১৯৫৪ সালে উত্তর বুনিয়াদী শিক্ষার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে হিন্দুস্তানী তালীমী সঙ্ঘ উত্তর বুনিয়াদীর এক শিক্ষাক্রম প্রকাশ করেন।

অতঃপর ১৯৫৬ সালে সেবাগ্রামে নিখিল ভারত উত্তর বুনিয়াদী শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উহাতে দেশের বিভিন্ন অংশ হইতে নয়ী তালীম তথা উত্তর বুনিয়াদী শিক্ষায় আগ্রহশীল ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রধান প্রধান শিক্ষাবিদগণ যোগদান করেন। উহাতে উত্তর বুনিয়াদী শিক্ষাসম্পর্কে বিশদ-ভাবে আলোচনা ও বিচার-বিবেচনা করা হয়। সেবাগ্রাম হইতে প্রকাশিত উক্ত শিক্ষাক্রম ও উক্ত উত্তর বুনিয়াদী সম্মেলনের বিচার-বিবেচনার সারমর্মকে উত্তর বুনিয়াদীর বিচারধারা ও শিক্ষাক্রমের নির্ভরযোগ্য রূপরেখারূপে গণ্য করা যাইতে পারে।

পরিপূর্ণ স্বাবলম্বন

বুনিয়াদী শিক্ষা হইতেছে স্বাবলম্বনের আদর্শে পৌঁছিবার জন্য শিক্ষা। উত্তর বুনিয়াদী হইবে স্বাবলম্বনের দ্বারা শিক্ষা। নয়ী তালীমে বিশেষত উত্তর বুনিয়াদী ও উত্তম বুনিয়াদীতে যে স্বাবলম্বনের কথা বলা হয়, তাহা কেবলমাত্র ভৌতিক স্বাবলম্বন নহে। উহা হইতেছে পরিপূর্ণ স্বাবলম্বন—অর্থাৎ ভৌতিক, বৌদ্ধিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক। উহাদের মধ্যে কোন্ স্বাবলম্বনের স্বরূপ কি তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। এই ব্যাপক অর্থে

স্বাবলম্বনের জন্য নয়ী তালীমের সর্ব স্তরে প্রযত্ন করা হইবে। কিন্তু উত্তর বুনিয়াদীর স্তর হইতে উহা অনিবার্য।

এখন ছাত্র কৈশোর হইতে যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। এই সময়ে নব যুবকের অন্তর্নিহিত শক্তি ও প্রবৃত্তিসমূহ ঠিকমত কাজে লাগিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া থাকে। এখন দেহের বৃদ্ধি ও পুষ্টির সময়। সেজন্য নব যুবক কিছু না কিছু করিবার জন্য উৎসুক থাকে। তাহার অধ্যয়ন ও চিন্তন-মননের ক্ষুধা জাগে। নিত্য নিয়মিতভাবে সেই ক্ষুধার খোরাক যোগানোর প্রয়োজন হয়। এই সময়ে তাহার ব্যক্তিত্ববিকাশের যোগ্য সুযোগ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা জাগে। এখন সর্বপ্রকারের স্বাবলম্বনের বৃত্তির উপর নির্ভরশীল কার্যক্রম অনুসরণ করিবার দায়িত্ব যদি তাহার উপর দেওয়া হয়, তবেই তাহার অন্তর্নিহিত শক্তি ও প্রবৃত্তিসমূহ সমুচিত বিকাশপ্রাপ্ত হইবার সুযোগ পায়। এইজন্য উত্তর বুনিয়াদী স্তরে শিক্ষক পড়াইবার পরিবর্তে ছাত্রদিগকে পড়িবার প্রেরণা দিয়া থাকেন। স্বাবলম্বনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অন্য সকল বিষয়েও এরূপ করা হয়। অর্থাৎ যাহাতে ছাত্রেরা নিজেদের অভিক্রমে ভৌতিক, বৌদ্ধিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সকল বিষয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অগ্রসর হয় সেজন্য তাহাদিগকে উৎসাহ ও প্রেরণা দেওয়া হয়।

কিন্তু যদি এই সুযোগ হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত রাখা হয়, তবে তাহাদের বিকাশ অবরুদ্ধ হইয়া যায়। তাহার পরিণাম হয় নৈরাশ্য। নৈরাশ্যের প্রতিক্রিয়া অনুশাসনহীনতা। আজকাল সাধারণ স্কুল-কলেজের ছাত্রদের মধ্যে যে অনুশাসনের অভাবের কথা শুনিতে পাওয়া যায় তাহার মূল কারণ এখানে কিনা তাহা গভীরভাবে ভাবিয়া দেখা আবশ্যক।

উত্তর বুনিয়াদী স্তরের দৈনিক আট ঘণ্টা কার্যক্রমের মধ্যে চার ঘণ্টা উৎপাদনের কাজ ও চার ঘণ্টা অধ্যয়নের জন্য রাখা হয়। দিন-রাত্রির ২৪ ঘণ্টাকে তিন ভাগ করিয়া ৮-ঘণ্টা কাজ, ৮-ঘণ্টা বিশ্রাম ও ৮-ঘণ্টা নিত্য কার্যক্রম। ৮-ঘণ্টা কাজের মধ্যে ৪-ঘণ্টা উৎপাদক শরীরশ্রমের কাজ। ঐ ৪-ঘণ্টা উৎপাদক শ্রমের দ্বারা সরল ও সংযত জীবনের প্রয়োজন মিটাইতে পারা চাই। বাকি ৪-ঘণ্টা অধ্যয়ন, অধ্যাপন, লিখন ইত্যাদির কাজ। নির্দিষ্ট সময়ে শয়ন ও ভোরে উঠার ব্যবস্থা চাই তাহাতে চিন্তন, মনন ও ব্যক্তিগত অধ্যয়ন প্রভৃতি দ্বারা ব্রাহ্মমুহূর্তের সদ্ব্যবহার করা যায়। শৌচ,

স্নান, ভোজন, সামাজিক সম্পর্ক, মেলা-মেশা, আমোদ-প্রমোদ ও অবকাশ ৮-ঘণ্টার নিত্যক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। অবকাশ সময় কিভাবে যাপন করা যায় তাহা ব্যক্তিগত চরিত্রের উপর নির্ভর করিবে। অবকাশ সময়ের সদ্ব্যবহার হয় কিনা তাহার উপর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক স্বাবলম্বনের সফলতা নির্ভর করে।

সেবাগ্রাম ছাড়া দেশের বিভিন্ন অংশে কয়েকটি আশ্রম-বিদ্যালয়ে (বে-সরকারী ব্যবস্থায়) উত্তর বুনিয়াদী শিক্ষা চালানো হইতেছে। যথা :—(১) তামিলনাদ—৩, কেরল—২, গুজরাট ও সৌরাষ্ট্র—১৪ (?), পাঞ্জাব—২, উত্তর প্রদেশ—১, ও উড়িষ্যা—৩। ঐ সব বিদ্যালয় হইতে প্রাপ্ত স্বাবলম্বন সম্পর্কীয় অঙ্ক হইতে বুঝা যায় যে উত্তর বুনিয়াদী শিক্ষায় ছাত্রদের নিত্য ৪-ঘণ্টা কাল শ্রমের উৎপাদিত দ্রব্যাদির দ্বারা উত্তর বুনিয়াদী শিক্ষায় স্বাবলম্বন সম্পাদন করা যায়। বিহারের উত্তর বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলি (২৪?) সরকারী তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। সেখানে এখনও স্বাবলম্বন নীতির ভিত্তিতে উহা সংগঠিত করা হয় নাই। কিন্তু সেখানেও যে কয়টি উত্তর বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে উৎপাদনের কার্যক্রম সুব্যবস্থিত হইয়াছে, সেখানকার প্রাপ্ত অঙ্ক হইতে প্রমাণিত হয় যে উত্তর বুনিয়াদীর ছাত্র পরিবার বা সমাজের উপর নির্ভরশীল না হইয়া নিজ শ্রমোৎপাদিত দ্রব্যাদির আয় হইতে নিজেদের শিক্ষার ব্যয় চালাইয়া লইতে সক্ষম।

বিচার ও অভিজ্ঞতায় ইহা বুঝা গিয়াছে যে, অধিকাংশ স্থানে কৃষি ও গোপালন উত্তর বুনিয়াদীর উপযোগী মূল উদ্যোগ। কৃষি ও গোপালনের দ্বারা ছাত্রের সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধিত হইতে পারে। কৃষি ও গোপালনের দ্বারা সমাজের সর্বাপেক্ষা প্রধান ভৌতিক প্রয়োজন (খাদ্য) মিটিয়া যাইতে পারে। এজন্য শিক্ষার দৃষ্টিতে কৃষি ও গোপালনকে সর্বাপেক্ষা মুখ্য স্থান দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া বিভিন্ন স্থানের অবস্থা অনুসারে সহায়ক শিল্প-হিসাবে মৃৎ-শিল্প, গৃহ-নির্মাণ শিল্প, কাষ্ঠশিল্প, চর্মশিল্প, বাঁশের কাজ ইত্যাদি শিক্ষার মাধ্যম স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে।

মহাত্মা গান্ধীর ভাষায় উত্তর বুনিয়াদী শিক্ষার লক্ষ্য :—

"এমন এক নূতন সমাজ রচনা, যাহা ন্যায়ের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে, যাহাতে ধনী ও দরিদ্রের ভেদভাব থাকিবে না,

যাহাতে সকলের স্বাধীনতার অধিকার থাকিবে এবং নিজেরাই স্বাধীনতা আনিতে পারিবে এই বিশ্বাস থাকিবে।"

এই উদ্দেশ্য স্বাধন করিবার জন্য সামাজিক জীবন ও সামাজিক কাজকে শিক্ষার এক প্রধান মাধ্যম স্বরূপে গ্রহণ করা হয়। এজন্য গ্রামের কাজও উত্তর বুনিয়াদী শিক্ষার এক মাধ্যম স্বরূপে লওয়া হয়। ইহা উত্তর বুনিয়াদীর এক বৈশিষ্ট্য। সামুদায়িক সাফাই, সমবেত ভোজন, অতিথি সেবা, সামুদায়িক স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা, সমবেত প্রার্থনা, একত্রে মৌন প্রার্থনা এবং উৎসব-পর্বাদি অনুষ্ঠানাদির মধ্য দিয়া ছাত্রদের মধ্যে সহযোগী ও সামাজিক বৃত্তি জাগ্রত হয় ও তাহাদের ঐ সব সম্পর্কীয় জ্ঞান লাভ হয়। ছাত্রেরা গ্রামের কৃষি, গ্রামের জীবন ও গ্রামের সমস্যাসমূহের সহিত ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপন করিয়া গ্রাম-নির্মাণ ও গ্রাম-উন্নয়নের কাজে সহায়তা দান করিবে। উহাতে গ্রাম-নির্মাণ ও সেবা-কাজের জ্ঞানলাভ হইবে ও তাহাদের মধ্যে সমাজ-সেবার উপযোগী বৃত্তিসমূহ গঠিত হইবে।

উত্তর বুনিয়াদীর পাঠ্যক্রম

অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে হিন্দুস্তানী তালীমী সঙ্ঘ কর্তৃক রচিত উত্তর বুনিয়াদীর শিক্ষাক্রম সংক্ষেপে নিম্নরূপ :—

সাধারণ কার্যক্রম :

সহযোগী শ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ-জীবন সংগঠনের অভ্যাস।

জীবন স্বাবলম্বনের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মপ্রচেষ্টার অভ্যাস এবং তাহার দ্বারা সংশ্লিষ্ট জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা।

সমবেত প্রার্থনা, সাফাই, স্বাস্থ্যরক্ষা, যৌথ কৃষি ও বাগিচা, একত্র পাক ও ভোজনের ব্যবস্থা, সার্বজনীন সাংস্কৃতিক কার্যক্রম।

গৃহ-নির্মাণ ও গৃহ-নির্মাণে সরঞ্জাম তৈয়ারির কাজে সহযোগিতা দান ও ঐ সব সংশ্লিষ্ট জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধ্যয়ন।

সমাজ-বিজ্ঞান, অর্থ-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, নাগরিক বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভুগোল, বর্তমান ভারতের সমস্যাসমূহের বিশেষ অধ্যয়ন।

পবিত্রতা ও রোগহীনতা, ব্যক্তিগত তথা সামাজিক জীবন যাপনের জন্য আবশ্যকীয় কার্যাদির অভ্যাস এবং উহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান, যথা—শরীর-বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, খাদ্য-বিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞান।

গ্রাম অধ্যয়ন ও গ্রাম সেবা।

অন্যূন তিন মাস কাল প্রত্যক্ষ সেবার কাজ।

ভাষা ও সাহিত্য :

মাতৃভাষা, রাষ্ট্রভাষা, ভারতের অন্য এক প্রাদেশিক ভাষা, অন্তঃরাষ্ট্রীয় ভাষা (ইংরজী)।

চিত্রকলা, সঙ্গীত, নাট্যকলা ও উৎসব শাস্ত্র।

বিশেষ শিক্ষাপ্রদ :

(ক) শিক্ষার মাধ্যম স্বরূপ নির্বাচিত মূল শিল্প :—

(১) কৃষি-বাগিচা এবং উহার পূরক শিল্প—তেলঘানী, মধুমক্ষিকা পালন, মুর্গী পালন ও তালগুড় তৈয়ারি।

(২) গো-পালন ও দুগ্ধ বিদ্যা।

(৩) বস্ত্রবিদ্যা—বয়ন, রং করা, ধোলাই।

(৪) কাষ্ঠশিল্প, ধাতুর মেরামতের কাজ, বাঁশের কাজ ও চাটাই তৈয়ারির কাজ।

(৫) গ্রাম্য ইঞ্জিনিয়ারিং—গৃহ-নির্মাণ, রাস্তা তৈয়ারি, জল নিকাশ ও সাফাই-এর ব্যবস্থা, জল সিঞ্চনের ব্যবস্থা।

(৬) গৃহস্থালী বিজ্ঞান ও রন্ধন বিদ্যা।

(৭) গ্রামীন স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় কাজ।

(৮) গ্রাম শিক্ষার কাজ।

(খ) উপরোক্ত শিল্পসমূহের সহিত সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জ্ঞান।

ভাষা, গণিত, যন্ত্র-বিজ্ঞান, ভূগর্ভ-বিজ্ঞান, উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান, পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন-শাস্ত্র, কীটাণু বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস, অর্থশাস্ত্র ও সমাজ-শাস্ত্র।

উপরোক্ত শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি বিষয়ের উদ্দেশ্য ও তাহাদের অনুবন্ধসূত্রে যে যে শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ করা যায় তাহা এক্ষণে উল্লেখ করা যাইতেছে :—

(১) সাফাই :

সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে অন্তর্বাহ্য সমগ্র শুদ্ধি-ভাবনার বিকাশ করা ও উহার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করা এবং সামাজিক ও ব্যক্তিগত সাফাই-এর জন্য আবশ্যকীয় জ্ঞান অর্জন করা 'সাফাই' শিক্ষার উদ্দেশ্য। ঐ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শরীর-বিজ্ঞান ও সাফাই শাস্ত্র, রোগসৃষ্টিকারক কীটাণু সম্বন্ধীয় শাস্ত্র, দেশ-বিদেশের সাফাই পদ্ধতির অধ্যয়ন এবং সাফাইসম্বন্ধীয় গ্রামীন উপকরণ ও সরঞ্জামের জন্য গবেষণা করিতে হইবে। এই সব বিষয়ে শিক্ষার্থীরা যাহাতে নিজেরা অগ্রসর হয় তাহার জন্য প্রচেষ্টা করিতে হইবে। অর্থাৎ অধ্যয়ন তথা জ্ঞানার্জন স্বাবলম্বনের লক্ষ্য থাকা চাই।

(২) স্বাস্থ্য :

ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে :—সমাজ ও ব্যক্তির পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যের জন্য আবশ্যকীয় ভাবনা ও অভ্যাস সৃষ্টি করা; সামাজিক ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষার সামাজিক, নৈতিক ও বৈজ্ঞানিক দিক বুঝিয়া লওয়া এবং অতি অল্প খরচে জনগণের সামগ্রিক স্বাস্থ্যের মান উন্নত করা।

(৩) সামাজিক জীবন :

উত্তর বুনিয়াদী শিক্ষায় যে সব সামাজিক বা সামূহিক জীবন সংক্রান্ত শিক্ষাক্রম আছে তাহার উদ্দেশ্য এই : (ক) সহযোগী, শ্রমনিষ্ঠ, স্বাবলম্বী সমাজ গঠন ও পোষণের জন্য আবশ্যকীয় প্রস্তুতি, (খ) সকলের প্রতি সমান শ্রদ্ধার ভাব পোষণ, বিশেষত অন্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় বিশ্বাস, সামাজিক রীতি, সাংস্কৃতিক পরম্পরার প্রতি শ্রদ্ধার ভাব পোষণ; ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের সহিত বন্ধুত্ব ও প্রতিবেশী-মূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা; (গ) জগতের সমস্ত মহান ধর্ম সম্পর্কে শ্রদ্ধাপূর্বক অধ্যয়ন, ধর্মগুরু ও সন্তদের জীবন ও উপদেশ সম্পর্কে অধ্যয়ন এবং তাহার দ্বারা সমাজে ধর্ম সমন্বয়ের ভাবনা সৃষ্টি করা; (ঘ) মনোবিজ্ঞান অধ্যয়নের দ্বারা সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে

পবিত্রতা ও আনন্দ সম্পাদনের প্রযত্ন; (ঙ) ভারতের বিভিন্ন অংশে স্থানীয় সামাজিক, আর্থিক ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সংশোধন করিবার প্রচেষ্টা; (চ) দেশের রাজনৈতিক সমস্যাসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান এবং (ছ) জগতের বিভিন্ন সমস্যা ঠিকভাবে বুঝিয়া লওয়া।

(৪) কৃষি ও বাগিচা :

ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে :—(ক) কৃষি ও বাগিচার দ্বারা শ্রেণীহীন, স্বাবলম্বী সমাজ গঠন; (খ) সমাজের সুসম খাদ্যের (ব্যালান্স্‌ড্‌ ডায়েট) জন্য খাদ্যশস্য, ফল ও তরিতরকারী উৎপন্ন করা; (গ) কৃষি-বাগিচার শিক্ষা ও তৎসম্পর্কীয় বিজ্ঞানের অধ্যয়ন ও (ঘ) কৃষির উন্নতিতে সহায়তা করা এবং জাতীয় খাদ্য-সমস্যার সমাধানে সহায়ক হওয়া।

(৫) সামূহিক ভোজনশালা :

সামূহিক ভোজনশালা সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী বলেন,—

"আমাদের পাকশালা নয়ী তালীমের গবেষণা ক্ষেত্র স্বরূপ হওয়া উচিত।" বিনোবাজী উহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"আমাদের সামুদায়িক ভোজনশালা যেন সাম্যযোগের মন্দির স্বরূপ হয়।"

ইহার দ্বারা যে যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় তাহা এই : (ক) স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন খাদ্যবস্তুর দ্বারা সেই অঞ্চলের লোকের জন্য খাদ্য ও স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান সম্মত সুসম খাদ্য প্রস্তুত করিবার জন্য পরীক্ষাকার্য; (খ) খাদ্যবস্তুর এক কণারও অপব্যয় না করিয়া যথাসম্ভব কম খরচে উপযুক্ত খাদ্যপ্রস্তুত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া দেশের সমস্যার ও খাদ্য সমস্যার সমাধান করার জন্য প্রযত্ন করা; (গ) পরিবার, সমাজ তথা দেশের খাদ্য সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি জাগ্রত করা; (ঘ) উপরন্তু সামুদায়িক ভোজনশালার কাজের দ্বারা হিসাব রাখা সম্পর্কে ভাল জ্ঞান লাভ করা।

(৬) সার্বজনীন সাংস্কৃতিক কার্যক্রম :

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদির উদ্দেশ্য হইতেছে :—(ক) সৌন্দর্যবোধ তথা আর্থিক দুরবস্থা এই উভয় দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যতটা সম্ভব কম

খরচে সহজপ্রাপ্য ও স্থানীয় জিনিসপত্রাদির ব্যবহার করিয়া সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য প্রযত্ন করা ; (খ) সাংস্কৃতিক কার্যক্রমাদির অনুষ্ঠানের দ্বারা ভারত তথা বিশ্বের ইতিহাস, সাহিত্য, সঙ্গীত, কলা, নাট্যকলা ও সমাজ শাস্ত্রের জ্ঞানলাভ করা।

(৭) সঙ্গীত ঃ

ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে ঃ—(ক) সন্তগণের ভজনের অভ্যাস দ্বারা আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতিসাধন ; (খ) ভারত তথা বিশ্বের বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশের ভজন ও সামাজিক সঙ্গীত সংগ্রহ করিয়া বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশের সংস্কৃতি সম্বন্ধে অধ্যয়ন ; (গ) সঙ্গীতের অনুশীলন ও সঙ্গীত সম্পর্কে অধ্যয়ন করিয়া উহাকে সার্বজনীন করিবার প্রযত্ন করা ও সঙ্গীতের প্রতি জনসাধারণের রুচি সৃষ্টি করা ও জনসাধারণকে ঐ সম্পর্কে জ্ঞানলাভের সুযোগ দেওয়া।

এই শিক্ষাক্রম বিশ্লেষণপূর্বক বিচার করিলে বুঝা যায় যে উত্তর বুনিয়াদীতে শিল্প ছাড়া সামাজিক জীবন এবং প্রাকৃতিক ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিও জ্ঞানলাভের মাধ্যম হইবে। ইহাতে স্বাবলম্বনের দ্বারা শিক্ষা তো হইবেই ; উপরন্তু ইহাতে সব মিলাইয়া এক নূতন গ্রাম সমাজের পরিপূর্ণ নমুনা সৃষ্টি করিবার প্রযত্ন করা হইাব। বুনিয়াদী শিক্ষা হইতেছে ভিত্তি এবং উত্তর বুনিয়াদী ঐ ভিত্তির উপর ইমারত নির্মাণ করিবে। কিরূপে ঐ ইমারতের গঠনকার্য অগ্রসর হইবে তাহা বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক।

খাদ্য উৎপাদন প্রথম প্রয়োজন। এজন্য কৃষি উত্তর বুনিয়াদীতে প্রধান শিল্প হইবে। পশু-পালন, মুর্গী-পালন, মধুমক্ষিকা-পালন ইত্যাদি মূল শিল্পের পোষক বা সহকারী শিল্প স্বরূপ চলিবে। আর একটি প্রধান প্রয়োজন বস্ত্রের। এজন্য খাদি-শাস্ত্র ও খাদি-শিল্পের উন্নয়নের কাজ চলিবে। উপকরণ সরঞ্জামাদি মেরামতের জন্য ও গৃহাদি নির্মাণের জন্য কাঠশিল্প ও লৌহশিল্পের কাজ লওয়া হইবে। ইহা ছাড়া তেলঘানী, সাবানশিল্প, কাগজ শিল্প, গুড় শিল্প, চাকী, ঢেঁকি ইত্যাদি তো চলিবেই। যেখানে যেরূপ কাঁচামাল স্বাভাবিকভাবে পাওয়া যাইবে সেখানে তদনুযায়ী শিল্পও চলিবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কুম্ভকারের কাজের উপযোগী মাটি যেখানে থাকিবে সেখানে মৃৎশিল্প চলিবে।

সমাজের স্বাস্থ্য-রক্ষা প্রয়োজন। এজন্য স্বাস্থ্য-রক্ষা ব্যবস্থার কাজ গ্রহণ করিতে হইবে। সাফাই-এর কাজ ভালভাবে চালাইতে হইবে। আত্ম-বিকাশের জন্য কলা, সঙ্গীত ও সাহিত্য অনুশীলন করিতে হইবে। ইহা ছাড়া গ্রাম সমাজের সেবা কার্য করা চাই। শিক্ষা ও সেবা উভয় উদ্দেশ্যে গ্রামের রাস্তা নির্মাণ, বাঁধ নির্মাণ, গৃহ নির্মাণ, স্কুল নির্মাণ প্রভৃতি কাজের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

উত্তর বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তনের পর ভূদানযজ্ঞ তথা সর্বোদয় আন্দোলনের দ্বারা যে নূতন আলোক পাওয়া গিয়াছে তাহাতে উত্তর বুনিয়াদীর ক্ষেত্র প্রসারিত হইয়াছে। ভূদান, গ্রামদান ও গ্রামদানী গ্রামের নির্মাণকার্যের দ্বারা গ্রাম-স্বরাজ গঠনের কাজও উত্তর বুনিয়াদী কাজের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। এজন্য উত্তর বুনিয়াদীর শিক্ষার্থীদের অনেকে নিজ নিজ প্রদেশে ভূদানের কাজে অংশ গ্রহণ করিয়াছে। সেবাগ্রাম ও উড়িষ্যার উত্তর:বুনিয়াদীর ছাত্রেরা কোরাপুটের গ্রাম-নির্মাণ কাজে অংশ গ্রহণ করিয়াছে। এইভাবে জাতীয় সমস্যাসমূহ সমাধানের কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করিলে সেবাবৃত্তির বিকাশ সাধন সম্ভব নহে।

পরীক্ষা পদ্ধতি

উত্তর বুনিয়াদী শিক্ষার একটি বড় সমস্যা হইতেছে কিভাবে ছাত্রদের পরীক্ষা গ্রহণ করা উচিত। এ সম্পর্কে অনেক বিচার বিবেচনা ও আলোচনা হইয়াছে। নয়ী তালীমের সর্বস্তরে এই সমস্যা রহিয়াছে। উত্তর বুনিয়াদী শিক্ষার ক্ষেত্রে এই প্রশ্ন বিশেষভাবে উঠিয়াছে। উত্তর বুনিয়াদী শিক্ষা স্বাবলম্বনের দ্বারা শিক্ষা। উহাতে পরীক্ষার আধারও স্বাবলম্বন হওয়া উচিত এবং বাহিরের কোন প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষের দ্বারা পুরাতন পদ্ধতি অনুসারে পরীক্ষা গ্রহণ ও প্রমাণপত্র দেওয়ার রীতি থাকা উচিত নহে। ভৌতিক স্বাবলম্বনের দ্বারা ছাত্রগণ শিক্ষালাভ করিতে পারিয়াছে কিনা, বৌদ্ধিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক স্বাবলম্বন শিক্ষাও তাহাদের হইয়াছে কিনা এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে অভীষ্ট ব্যক্তিগত ও সামাজিক গুণাবলীর বিকাশ হইয়াছে কিনা—তাহা বাহিরের কাহারও কাছে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্রশ্নপত্রের উত্তর লিখিয়া দিয়া বা প্রশ্নাবলীর মৌখিক উত্তর দিয়া প্রমাণ করা সম্ভব নহে।

অতএব ঐ পরীক্ষাকার্য বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ, স্বতঃসঞ্চালিত এবং সুব্যবস্থিত সমীক্ষা-পদ্ধতির ভিত্তিতে হওয়া উচিত। এই ব্যবস্থায় এক বা একাধিক বৎসর পরে একটি পরীক্ষার পরিবর্তে সমীক্ষা প্রতিদিনে, প্রতি-সপ্তাহে, প্রতিমাসে চলিতে থাকিবে। ছাত্র নিজে-নিজেই আত্ম-সমীক্ষা করিবে অর্থাৎ নিজের অন্তরে নিজেকে যাচাই করিবে। শিক্ষক প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার দ্বারা ছাত্রদের কাজ ও তাহাদের লিখিত খাতা ইত্যাদি দেখিয়া তাহাদের সম্বন্ধে নিজের অভিমত গঠন করিতে থাকিবেন। সাথীরা তাহার সম্বন্ধে কি মত পোষণ করে ও সাথীদের মধ্যে তাহার স্থান কোথায় ইহা প্রত্যেক ছাত্র চিন্তা করিতে থাকিবে। ছাত্র বিদ্যালয়-পরিবার, গ্রাম-পরিবার ও স্থানীয় পরিবারের এক অঙ্গ। ছাত্র ও শিক্ষক প্রত্যেকেই যেন চিন্তা করিতে থাকেন যে সমাজের দৃষ্টিতে ছাত্র কিরূপ ও তাহার স্থান কোথায়, ছাত্র তাহার দিনলিপি ও তাহার প্রগতি-লিপি প্রতিদিন লিখিতে থাকিবে। প্রত্যেক ছাত্রের নিজের পরিকল্পনা খাতা ও প্রগতি খাতা থাকিবে। শিল্প, অধ্যয়ন, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আমোদ প্রমোদ ইত্যাদি প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে পৃথক পরিকল্পনা ও প্রগতি খাতা রাখিতে হইবে। এই সবের ভিত্তিতে তাহার সম্বন্ধে বিচার করা সহজ সাধ্য হইবে। বিভিন্ন দল বাঁধিয়া কাজ করার সময় ছাত্র সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট হইতে কিরূপ সহানুভূতি ও সহযোগিতা লাভ করে তাহাও দেখিতে হইবে।

এরূপ সমীক্ষা-ব্যবস্থায় ছাত্রের যোগ্যতা চারিটি দৃষ্টি কোন হইতে প্রমাণিত হইবে :—(১) স্বাবলম্বন যোগ্যতা, (২) ব্যক্তিগত উন্নতি, (৩) সামাজিক গুণাবলীর বিকাশ ও (৪) জীবনোপযোগী জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জনের যোগ্যতা।

নয়ী তালীমে বিশেষত উত্তর বুনিয়াদীতে প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে পরীক্ষা গ্রহণ অবাঞ্ছনীয় এবং উহা কার্যকরীও নহে এ সম্বন্ধে সকলেই একমত। উপরোক্ত আত্ম-সমীক্ষা পদ্ধতি যে উন্নততর পদ্ধতি এ বিষয়েও সকলে একমত। ধৈর্যের সহিত এই পদ্ধতির উন্নতি সাধন করিতে হইবে। মোট কথা, বিদ্যালয়ের কোন্ ছাত্র প্রমাণপত্র পাইবার যোগ্য তাহা নির্ণয় করিবার দায়িত্ব বিদ্যালয়ের থাকিবে।

তবে বিদ্যালয় এই কাজ ঠিকভাবে করিতেছে কিনা তাহা পরিদর্শন, নিরীক্ষণ ও যাচাই করার ভার বাহিরের কর্তৃপক্ষের উপর থাকিলে ভাল হয়।

ইহার ফলে আপনা-আপনি বিদ্যালয়গুলির শিক্ষণ-স্তরের উন্নতি হইবে ও উহার মধ্যে সমরূপতা আসিবে। প্রশ্ন উঠিতে পারে যে 'আত্ম-সমীক্ষা' পদ্ধতি ঠিকমত চলিবার নিশ্চয়তা কোথায় ? যখন বিদ্যালয়ের নিজের উপর নিজের ছাত্রগণের প্রমাণপত্র দিবার অধিকার আসিবে, তখন বিদ্যালয়ের সমুচিত দায়িত্ব-ভাবনা জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক। ঐ দায়িত্ব-ভাবনা স্বতঃই বিদ্যালয়কে উহার শিক্ষাস্তর উন্নত করিবার ও আত্ম-সমীক্ষা পদ্ধতি সততার সহিত চালাইবার প্রেরণা যোগাইবে। যদি কোন বিদ্যালয়ের শিক্ষাস্তর সমুচিতভাবে উন্নত না থাকে বা উহার প্রমাণ-পত্র প্রাপ্ত ছাত্রদের যোগ্যতার অভাব বাহিরে প্রকাশ পায় তবে ব্যবসায়, সরকারী ও সেবাক্ষেত্রে সেই বিদ্যালয়ের দুর্নাম হইবে। উহার ফলে সেই বিদ্যালয়ের পক্ষে টিকিয়া থাকা কঠিন হইবে। উহাই ঐ বিদ্যালয়ের দায়িত্ব পালনের রক্ষাকবচ স্বরূপ হইয়া থাকিবে।

ডঃ মর্গ্যানের মতে মাধ্যমিক শিক্ষা (উত্তর বুনিয়াদী)

ডঃ আর্থার ই. মর্গ্যান (চেয়ারম্যান, টেনেসীভ্যালী অথরিটি, যুক্তরাষ্ট্র) ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সদস্যরূপে উহার জন্য যে স্মারকলিপি রচনা করেন (১৯৪৯) তাহাতে তিনি পল্লী ভারতের উচ্চশিক্ষা পরিকল্পনা রচনা প্রসঙ্গে উত্তর বুনিয়াদী শিক্ষা কিরূপ (মাধ্যমিক শিক্ষা) হওয়া উচিত তাহার এক মনোরম চিত্র অঙ্কিত করেন। উহা হইতে একজন বৈদেশিক মনীষীর বিচারে বর্তমান অবস্থায় এ দেশের মাধ্যমিক শিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত তাহা স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যাইবে। তিনি লিখিয়াছেন :—

"গ্রামীন মাধ্যমিক বিদ্যালয় (যেখানে সম্ভব) আবাসিক হওয়া উচিত। ১৫০ জন ছাত্র বিশিষ্ট স্কুলের জন্য অবস্থানুসারে ৪০ হইতে ৬০ একর জমি থাকিবে। উহার মধ্যে ১০।১৫ একর জমি বিদ্যালয় ভবন, হোষ্টেল, খেলার মাঠ, কারখানা ঘর ও শিল্পের জন্য এবং অবশিষ্ট জমি কৃষি ও গোচারণের জন্য থাকিবে। সুপরিকল্পিত, আধুনিক গ্রামে যেরূপ হওয়া উচিত যতদূর সম্ভব সেরূপভাবে পরিকল্পনা করিয়া বিদ্যালয়ের মাঠ, রাস্তা ও গৃহাদি নির্মাণ করিতে হইবে। ছাত্রছাত্রীদের নিজেদের গ্রাম কিরূপ হওয়া উচিত সে বিষয়ে উহা তাহাদের কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ হইবে।

বহুশত ছাত্র অপেক্ষা ১৫০ ছাত্রবিশিষ্ট এক-একটি স্কুল হওয়া শ্রেয়। স্কুলের জীবন-যাত্রা আদর্শ গ্রামের ন্যায় চলিবে। পার্থক্য এই থাকিবে যে কাজের সময়ের অর্ধাংশ অধ্যয়নের জন্য দেওয়া হইবে ও বাকী অর্ধেক সময় কৃষি, গৃহনির্মাণ, কাঠের কাজ, গৃহের আসবাব নির্মাণ, গৃহস্থালীর কাজ, বয়ন, রাস্তা সাফাই ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজে নিয়োজিত হইবে। এক বা একাধিক আধুনিক শিল্পের কাজও অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

"মাধ্যমিক বিদ্যালয়-রূপী গ্রাম জমি ও গৃহাদি ব্যতীত অন্যান্য সব বিষয়ে যতদূর সম্ভব স্বাবলম্বী হইবে। সুপরিকল্পিত ও সুব্যবস্থিত শিল্পের সহায়ে এই স্বাবলম্বন সহজসাধ্য হইবে।

"বিদ্যালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের অধিকাংশই স্কুল নিজে উৎপাদন করিবে। কেমন করিয়া জমিতে যথাসম্ভব অধিক ফসল উৎপাদন করা যায় তাহা ছাত্র-ছাত্রীগণ বিদ্যালয় হইতে শিখিবে। আজ জগৎ গতকাল অপেক্ষা অধিকতর দ্রুতগতিতে উত্তম কৃষির রহস্য শিক্ষা করিতেছে। মাধ্যমিক স্কুলেরও বর্তমান জগতের সহিত সমান তালে চলা উচিত।

"অধ্যয়নের সময়ে ছাত্রগণ সর্বাঙ্গীন সুষম শিক্ষা প্রাপ্ত হইবে। তাহারা ভূগোল, ভূতত্ত্ব ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করিবে। তাহাদের প্রাণীবিদ্যারও পরিচয় হইবে। তাহারা নিজেদের প্রদেশ, ভারত ও পৃথিবীর ইতিহাস সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান লাভ করিবে। কিছু ভাল সাহিত্যের পরিচয়ও তাহাদের হইবে। অধ্যয়নের দ্বারা তাহারা তাহাদের কাজের তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করিবে। ব্যবহারিক কাজের জন্য গণিত সম্পর্কে তাহাদের পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকিবে। প্রাদেশিক ও জাতীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কেও তাহাদের সাধারণ জ্ঞান থাকিবে। শরীর চর্চা সম্পর্কীয় শিক্ষা সার্বজনীন হওয়া উচিত।

"বিদ্যাশিক্ষা অপেক্ষা ভাল অভ্যাস, ভাল মনোবৃত্তি ও চরিত্র গঠন অধিকতর প্রয়োজনীয়। আচরণে সরলতা ও সততা জাতির শক্তির উৎস। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী অর্থাৎ মুক্ত, বিচারাত্মক অনুসন্ধিৎসা ভারতে নব জীবনের সঞ্চার করিবে। গ্রামীন জীবন কিরূপ হওয়া উচিত তাহার নমুনা গড়িয়া তোলা ঐ বিদ্যালয়রূপী গ্রামের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

"শ্রম-শিল্পের কাজ সম্পর্কে গ্রামীন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এক নূতন পরম্পরা সৃষ্টি করিতে হইবে। এরূপ মানিয়া লওয়া হয় যে শ্রমশিল্পী প্রধানত লাভের জন্য এবং শিক্ষক প্রধানত সেবার জন্য কাজ করেন। এরূপে বিভিন্ন পেশাবিশিষ্ট লোকের বিভিন্ন উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া চলিবার কোন অন্তর্নিহীত কারণ নাই।

"গ্রামীন শ্রমশিল্পীও ন্যায়সঙ্গত ভব্য জীবনমান ভোগ করিবার অধিকারী এবং তাঁহার জীবনে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য থাকিবে এরূপ পরম্পরা গড়িয়া উঠা প্রয়োজন। এরূপ জীবনমানের জন্য যাহা প্রয়োজন তাহার অতিরিক্ত যাহা উপার্জন হইবে তাহা ঐ শ্রমশিল্পকে শক্তিশালী করিবার, শিল্প সম্প্রসারণে, মন্দা সময়ের জন্য সঞ্চয়ের, নূতন মাধ্যমিক স্কুলে নূতন শ্রমশিল্পের উৎপন্ন দ্রব্যের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির, মূল্য হ্রাস কিংবা মজুরী বাড়াইবার এবং কাজের অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য নিয়োজিত হইবে। সৎভাবে জীবন-যাপন অপেক্ষা অর্থ-সঞ্চয়ে অধিক সুখ পাওয়া যায় ইহা এক অদ্ভুত ভ্রান্তি। গ্রামীন শিক্ষার দ্বারা এই প্রচলিত ভ্রান্ত-ধারণার অপনোদন করিতে হইবে।

"বুনিয়াদী মাধ্যমিক শিক্ষাকে যদি স্বাবলম্বী হইতে হয় তবে উহার সংশ্লিষ্ট সকলের জীবনযাত্রার মান সাদাসিধা হওয়া আবশ্যক। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবন রাজপ্রাসাদের অনুকরণে নির্মিত হইয়াছে। বুনিয়াদী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভবন রাজপ্রাসাদের মত হওয়া উচিত নহে। সরল, অনাড়ম্বর স্বল্প ব্যয়-সাধ্য জীবনযাত্রা যে পরিচ্ছন্ন, সুবিধাজনক ও আকর্ষণীয় হইতে পারে তাহার দৃষ্টান্ত উত্তর বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের যুবকগণকে সকলের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে হইবে।

"পোষাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুরুচিসম্পন্ন হওয়া উচিত। কিন্তু উহা গ্রামের উপযোগী ও সাদাসিধা হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিদ্যালয়ের জন্য আবশ্যকীয় পোষাক-পরিচ্ছদ সাধারণত স্কুলেই প্রস্তুত হওয়া উচিত। ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় মহলে ও সহরে ধনীদের মধ্যে খাদ্যের যেরূপ অপব্যয়জনক সৌখিনতা ও বাহুল্য দেখা যায়, সেরূপ যেন এইসব বিদ্যালয়ে না হয়। সাদাসিধাধরণের রন্ধন করা হইবে। খাদ্য

পরিবেশনের কলা ও কুশলতায় বুনিয়াদী মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে নূতন আদর্শ স্থাপন করিতে হইবে। খাদ্য এমন হওয়া উচিত যাহা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল হইবে ; উপরন্তু যাহাতে বিবিধ প্রকারের খাদ্য ভোজন করার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।

"সাধারণভাবে বুনিয়াদী মাধ্যমিক বিদ্যালয়রূপী গ্রামের জীবন-যাত্রার মান এরূপ হওয়া উচিত যাহাতে তাহার দ্বারা এই দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয় যে গ্রামের উন্নতি সাধিত হইয়া উহা এক সমৃদ্ধিশালী গ্রামে পরিণত হইয়াছে। অভাব কমাইয়া সাদাসিধা জীবনযাপন দ্বারা আংশিকভাবে এবং আয় বৃদ্ধি দ্বারা আংশিকভাবে স্বাবলম্বন সাধন করিতে হইবে।

"বুনিয়াদী শিক্ষার প্রত্যেক বালক ও বালিকার যে কোন সাধারণ কার্য করিতে সমর্থ হওয়া চাই। নূতন ভারতীয় সংবিধানের তাৎপর্য অনুসারে বুনিয়াদী স্কুলের প্রত্যেক বালক ও বালিকার নিম্নলিখিত সংকল্প গ্রহণ করা উচিত :—

"আমি কখনও কোন লোকের নিকট হইতে এমন কোন হীন সেবা (মিনিয়্যাল সার্ভিস) গ্রহণ করিব না যাহা আমি সানন্দে তাহার জন্য বা অন্যান্যের জন্য করিতে প্রস্তুত নহি।"

বিশ্ববিদ্যালয়-স্তরের শিক্ষা ও স্বাবলম্বন

নয়ী তালীমের বুনিয়াদী স্তরে ছেলে-মেয়েদের উপর আর্থিক স্বাবলম্বনের দায়িত্ব অর্পণ করা যায় না। কারণ ঐ সময়ে স্বাবলম্বী করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্যই শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ছাত্রেরা তখন উত্তরোত্তর স্বাবলম্বী হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। কিন্তু যদি মূল শিল্পকে শিক্ষাদানের মাধ্যমরূপে পরিপূর্ণ ও সঠিকভাবে সদ্ব্যবহার করা হয় তবে শিক্ষাপ্রাপ্তির ভিতর দিয়া ছাত্রেরা নিশ্চয়ই এতটা পরিমাণ উৎপাদন করিতে পারিবে যাহার দ্বারা বিদ্যালয়ের চলতি ব্যয়, অন্তত শিক্ষকের বেতনের ব্যয় নির্বাহ করা যাইবে।

একথা পূর্বে বলা হইয়াছে, কিন্তু বুনিয়াদী উত্তীর্ণ হইলেই এরূপ মনে করা হয় যে ছাত্র তখন স্বাবলম্বী হইতে পারিবে। তদনুসারে উত্তর বুনিয়াদী স্তরের শিক্ষার পরিকল্পনা করা হয়।

এজন্য উত্তর বুনিয়াদীতে স্বাবলম্বনের দ্বারা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সুতরাং বুনিয়াদী স্তর উত্তীর্ণ হইলে পরবর্তী স্তরের শিক্ষাক্রম কিরূপ হওয়া উচিত সে সম্পর্কে বিনোবাজী এই পরামর্শ দেন।

> "ছেলেরা ছয় ঘণ্টা শ্রমের কাজ করিয়া নিজেদের ভরণ-পোষণের সংস্থান করিয়া লইবে এবং আর দুই ঘণ্টা ঐ কাজের পরিপোষক জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা তাহাদিগকে দেওয়া হইবে। ছেলেরা গরীব হউক বা ধনবান হউক, তাহাদের জন্য তাহাদের মাতা-পিতা কিছুই খরচ করিবেন না, বিদ্যালয়ও কিছু খরচ করিবে না। এরূপ করিলে বাস্তব গবেষণা চলিবে এবং তাহার দ্বারা দেশের উন্নতি সাধিত হইবে।"

উত্তর বুনিয়াদী পার হইয়া যখন নয়ী তালীমের ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে তখন মনে করা হইবে যে ছাত্র স্বাবলম্বী হইয়া গিয়াছে। তদনুসারে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষাক্রমের কল্পনা ও ব্যবস্থা করা হয়। তখন শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ে মিলিয়া স্বাবলম্বী জীবন যাপন করিবে এবং দেশের সম্মুখে উহা উপস্থিত করিবে এই প্রত্যাশা করা হয়। তাই বিনোবাজী ঐ সম্পর্কে বলেন,—

"উহার শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের যেরূপ সুসজ্জিত পুস্তকালয়ের প্রয়োজন হইবে তাহার ব্যবস্থা করা হইবে। তাঁহাদের যে সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি লাগিবে তাহা দেওয়া হইবে। জমি যাহা প্রয়োজন হইবে তাহাও দেওয়া হইবে। ইহা ছাড়া কিছু ঘর-বাড়ী তৈয়ারি করিয়া দেওয়া হইবে। বাকিটা তাঁহারা নিজেরা তৈয়ারি করিয়া লইবেন। এই সব করিয়া দিয়া তাঁহাদিগকে বলা হইবে, 'ইহার পর আপনাদিগকে আর কিছু দেওয়া হইবে না। এখন আপনারা উভয়ে মিলিত হইয়া এক সামূহিক জীবন যাপন করুন এবং সর্বোত্তম সামুহিক জীবন কিরূপ হওয়া উচিত তাহার নমুনা দেশের সম্মুখে উপস্থিত করুন।' এরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞান চর্চা হইবে, গবেষণা চলিবে, গাবষণার যে ফল হইবে তাহা দেশের সম্মুখে রাখা হইবে। এইভাবে সমস্ত কাজ চলিবে। কিন্তু প্রধান জিনিস ইহাই হওয়া চাই যে ছাত্র ও শিক্ষক

উভয়ে নিজেদের পায়ের উপর দাঁড়াইবে, হাতে কাজ করিবে এবং নিজের জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নিজেরা উৎপাদন করিয়া লইবে। যেমন তেমন করিয়া নহে, সর্বোত্তম উপায়ে উহা করা হইতেছে এরূপ যেন দেখা যায়। সেখানে তাঁহাদের যে কাজ হইবে, যে বিদ্যা শিখানো হইবে, যে যন্ত্রপাতি তৈয়ারি করা হইবে, যে ঘর-বাড়ী নির্মাণ করা হইবে, সেই সমস্ত কাজে তাঁহাদের বিদ্যার আভা দেখিতে পাওয়া যাইবে।"

বিনোবাজী বলেন,—নয়ী তালীমে এই যে একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত স্বাবলম্বী হইয়া গড়িয়া উঠিবার জন্য শিক্ষা-ব্যবস্থা করা হয় এবং তৎপরে ছাত্রকে স্বাবলম্বী স্বরূপ গণ্য করিয়া তদনুযায়ী উচ্চস্তরের শিক্ষাক্রম রচনা করা হয় তাহা আমাদের দেশের প্রাচীন কালের পরম্পরার অনুরূপ। তিনি বলেন যে জনসাধারণের মধ্যে বহুল প্রচলিত মনুর এক প্রসিদ্ধ শ্লোক আছে। তাহা হইতেছে এই :—

"প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ।"

অর্থাৎ পুত্র ষোড়শ বৎসর বয়সে উপনীত হইলে মিত্রের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিতে হয় সেরূপ ব্যবহার তাহার সহিত করিতে হইবে। তিনি বলেন যে এই শ্লোকের প্রকৃত অর্থ এই যে ষোল বৎসর বয়সে পদার্পণ করিলে ছেলেদের নিজেদের দায়িত্ব নিজেদের গ্রহণ করা উচিত। মানুষ মিত্রকে পরামর্শ দেয় এবং কোন কোন সময়ে বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তাহাকে সাহায্য করে। ছাত্রদের ক্ষেত্রেও মাতাপিতা বা তাহাদের অন্য অভিভাবকগণের তদ্রূপ করা উচিত। ইহা শুধু কথার কথা নহে। ইহার মধ্যে মাতা-পিতা তথা সমাজের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের প্রশ্ন নিহিত রহিয়াছে। সেই দায়িত্ব হইতেছে এই যে মাতা-পিতা তথা সমাজের পক্ষ হইতে ছেলেমেয়েদের জন্য এরূপ শিক্ষা-ব্যবস্থা হওয়া উচিত যাহাতে তাহারা ষোড়শ বয়সের হইলেই জীবনের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ ও বহন করিতে সমর্থ হয়। বিনোবাজী বলেন যে পুরাকালে এইরূপই হইত। নচেৎ মনুর এই শ্লোকের সৃষ্টি হইত না। সমাজের বহুকালব্যাপী অনুভবলব্ধ জ্ঞানই মনুতে সঙ্কলিত হইয়াছে। বিনোবাজী বলেন,—

"মনু মানে কোন ব্যক্তি বিশেষ নহে। সমাজের হাজার হাজার বৎসরের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকেই 'মনু' বলা হয়।"

তখন সমাজে যে এরূপ ভাবে চলা হইত এবং এরূপ ভাবনা তখন যে প্রচলিত ছিল তাহা যজ্ঞরক্ষার জন্য। বিশ্বামিত্র ঋষির আশ্রমে রামকে পাঠাইবার ব্যাপারে দশরথের কথা হইতেও তাহা প্রমাণিত হয়। বিশ্বামিত্র যখন দশরথের নিকট রামকে চাহিলেন তখন দশরথ এই বলিয়া আপত্তি করিয়াছিলেন যে রামের বয়স তখনও ষোল বৎসর হয় নাই। সুতরাং রাম ঐ বয়সে এত বড় দায়িত্ব গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে না। কিন্তু যখন বশিষ্ট তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে রাম বিশ্বামিত্রের তত্বাবধানে ও পরিচালনায় থাকিলে রামের পক্ষে এই দায়িত্ব লওয়া সম্ভব হইবে এবং উহা রামের পক্ষে এক শিক্ষাক্রম স্বরূপও হইবে, তখন দশরথ রামকে পাঠাইতে রাজি হইলেন। ষোড়শ বৎসর যে জীবনের দায়িত্ব গ্রহণ করিবার বয়স বলিয়া গণ্য হইত তাহা ইহা হইতেও বুঝা যায়। নয়ী তালীমে চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত স্বাবলম্বনের শিক্ষার নীতি গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রগতিশীল দেশসমূহে ১৪ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া ১৫ বৎসরে পদার্পণ না করা পর্যন্ত কারখানায় কাজ করিতে দেওয়া হয় না। মনুর বচনে স্বাবলম্বী হওয়ার বয়স এক বৎসর বেশী, পার্থক্য এই।

কিন্তু আজ আমাদের দেশে বিপরীত অবস্থা দেখা যাইতেছে। দেশের অসংখ্য দরিদ্র ছেলে-মেয়েদের কম বয়স হইতেই পেটের দায়ে কঠিন পরিশ্রম করিতে হয়; তাহাদের শিক্ষা পাওয়া তো দূরের কথা। আর পরিশ্রম করিয়াও তাহাদের পেটের ভাত জোটে না। অন্যদিকে ২৪।২৫ বৎসর বয়সের ছেলেদেরও শিক্ষা চলিতে থাকে। আর তাহাতে যে শিক্ষা তাহারা পায় তাহার দ্বারা তাহারা সমাজের ভার লাঘব করিবার পরিবর্তে সমাজের উপর ভারস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। উপরন্তু ঐ শিক্ষার জন্য যে ব্যয় হয় তাহার অধিকাংশই সমাজকে অর্থাৎ সরকারকে বহন করিতে হয়। এই কারণে বিনোবাজী বলেন,—

> "ষোল বৎসর পর্যন্ত স্বাবলম্বনের শিক্ষা এবং ষোল বৎসরের পরে স্বাবলম্বনের দ্বারা শিক্ষা এই সূত্র মানিয়া লইয়া তদনুসারে শিক্ষা-ব্যবস্থা চালানো ব্যতীত এই উভয় প্রকার দুর্গতির হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে না।"

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। নয়ী তালীমের অভীষ্ট ভৌতিক স্বাবলম্বন পয়সার উপর নির্ভরশীল আর্থিক ব্যবস্থা নহে।

উহাতে জীবন ধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি যথা খাদ্য, বস্ত্র ইত্যাদি নিজেদের প্রয়োজন অদ্রোহী শ্রমের দ্বারা উৎপাদন করিয়া মিটাইতে হইবে। উহাতে অর্থকরী ফসল অথবা যে জিনিস জীবনধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় নহে তাহা কোন শিল্পের দ্বারা উৎপাদন করিয়া তাহার বিক্রয়লব্ধ অর্থে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি খরিদ করিলে চলিবে না। উপরন্তু যে শ্রমের দ্বারা জীবনধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদন করা হইবে তাহা অদ্রোহী শ্রম হওয়া চাই। অর্থাৎ, উৎপাদন এভাবে হইবে যাহাতে বেকারত্ব সৃষ্টি করিয়া দরিদ্রের অহিত সাধন করা না হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ঢেঁকিতে চাউল উৎপাদন না করিয়া যদি হাস্কিং মেশিনে (হালার) চাউল উৎপাদন করা হয় তবে সেখানে হাস্কিং মেশিন চালাইবার শ্রম অদ্রোহী শ্রম হইবে না। উহা দ্রোহাত্মক শ্রম।

এরূপে উত্তর বুনিয়াদীতে আর্থিক সাম্যের ভিত্তিতে সমাজের আবশ্যকতা পূরণ করিবার প্রযত্ন করিয়া এক নূতন আর্থিক ব্যবস্থা সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করা হয়। অর্থাৎ সামাজিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে এক মৌলিক পরিবর্তন সাধন করিবার চেষ্টা করা হয়। সেই নব সমাজের উৎপাদন হইবে ব্যবহারের জন্য, বাজারের জন্য নহে। অর্থ-প্রধান অর্থনীতির পরিবর্তে অন্নাদি আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি-প্রধান অর্থব্যবস্থা হইবে সেই সমাজের স্বরূপ।

উত্তর বুনিয়াদী স্তরে বৌদ্ধিক স্বাবলম্বনের অর্থ কেবলমাত্র স্বাধ্যায়ের দ্বারা গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করা নহে। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে যে সব সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে তাহাদের সমাধানের জন্য মন ও বুদ্ধিকে খাটাইতে হইবে—ইহাতে গবেষণার সুযোগও আসিবে। এজন্য উত্তর বুনিয়াদী ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্তরে গবেষণার কার্যক্রম উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতে থাকিবে।

উত্তর বুনিয়াদী ও সরকারী স্বীকৃতি

সার্জেন্ট্‌ পরিকল্পনা ও বুনিয়াদী শিক্ষা

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলিতে থাকার সময়ে ভারত সরকার যুদ্ধোত্তর শিক্ষা উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করিতে আরম্ভ করেন। শ্রীজন সার্জেণ্ট্‌ ঐ সময়ে ভারত সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা ছিলেন। তিনি ১৯৪৪ সালের জানুয়ারী মাসে কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা মণ্ডল-এর যুদ্ধোত্তর শিক্ষা উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা করেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা মণ্ডলের উক্ত পরিকল্পনাকে সার্জেণ্ট্‌ স্কীম বলা হয়।

ঐ সময় মহাত্মা গান্ধীর নয়ী তালীমের বুনিয়াদী বা বেসিক শিক্ষার এক নমুনা (তাহা তখন পর্যন্ত কিছু অস্পষ্ট থাকিলেও) দেশের সম্মুখে আসিয়া গিয়াছিল। সার্জেণ্ট্‌ সাহেব উহার কিছু রদবদল করিয়া তাঁহার শিক্ষা পরিকল্পনায় উহা গ্রহণ করেন। অন্যদিকে মহাত্মা গান্ধীর নয়ী তালীমের বুনিয়াদী স্তরের নাম 'বেসিক'। সার্জেণ্ট্‌ সাহেব তাঁহার পরিকল্পিত প্রাথমিক শিক্ষার নামও উহার অনুকরণে 'বেসিক শিক্ষা' রাখেন। মহাত্মা গান্ধী আবিষ্কৃত শিক্ষা বিচারের 'বেসিক' নামের প্রভাব পাইবার উদ্দেশ্যে হয়তো ঐ সরকারী পরিকল্পনার নাম 'বেসিক শিক্ষা' রাখা হইয়াছিল।

এইরূপে যুদ্ধোত্তর কালের সরকারী প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির (প্রাইমারী ও মিডল স্কুল) পদ্ধতি বেসিক অথবা বুনিয়াদী নামে চলিতে লাগিল। কিন্তু সার্জেণ্ট্‌ সাহেব যখন উচ্চ বিদ্যালয় (হাই স্কুল) স্তরের শিক্ষা পরিকল্পনার কথা চিন্তা করেন তখন উত্তর বুনিয়াদী শিক্ষার কোন রূপরেখা তাঁহার সম্মুখে ছিল না। কারণ ১৯৪৫ সালে প্রথমে উত্তর বুনিয়াদী কল্পনার উদ্ভব হয়। তাহা সত্ত্বেও তখন পর্যন্ত হাইস্কুলের যে স্বরূপ চলিয়া আসিয়াছিল তাহা তিনি সমর্থন করেন নাই। তাঁহার অভিমত এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য ছাত্র তৈয়ারি করা হাইস্কুলের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে। তাঁহার বিচারে হাইস্কুলের শিক্ষাক্রমে এমন অনেক

ব্যবহারিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত যাহাতে হাইস্কুলের উত্তীর্ণ ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়-স্তরের শিক্ষা গ্রহণ না করিলেও প্রত্যক্ষ জীবন-ক্ষেত্রে বিবিধ পেশা গ্রহণ করিতে পারে।

এজন্য তিনি হাইস্কুল পরিকল্পনায় দুইটি দিক রাখেন : (১) বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের জন্য প্রস্তুতি ও (২) স্বতন্ত্র ব্যবসায়ে প্রবেশের জন্য প্রস্তুতি।

এজন্য তাঁহার পরিকল্পিত হাইস্কুলের নাম তিনি রাখেন 'মাল্‌টি-ল্যাটারাল' বা 'বহুমুখী' উচ্চ বিদ্যালয়। ১৯৪৪-৪৫ সালে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের সুপারিশের ফলে সার্জেন্ট্ সাহেবের 'বহুমুখী' বিদ্যালয় (মালটিল্যাটারল্ হাইস্কুল) 'বহু উদ্দেশীয়' বা 'বহু শিল্পীয়' উচ্চ বিদ্যালয় নামে অভিহিত হয় এবং উক্ত বহু উদ্দেশীয় উচ্চ বিদ্যালয়ে বিবিধ প্রকারের কোর্স ও বিবিধ শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা রাখা হয়।

এখন প্রশ্ন, মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন এই শিক্ষা-স্তরের নাম পোষ্ট্ বেসিক বা উত্তর বুনিয়াদী রাখিলেন না কেন এবং 'বেসিক'-এর প্রণালীর সহিত উহার প্রণালীর সামঞ্জস্য বিধান করিলেন না কেন? মাধ্যমিক কমিশন না হউক বর্তমান ভারত সরকারই বা ঐ নাম রাখিলেন না কেন?

এই সব শিক্ষা পরিকল্পনা যখন রচিত হয় তখন ভারত স্বাধীন হয় নাই। স্বাধীনতা লাভের পর জাতীয় সরকার পুরাতন ভারত সরকারের গৃহীত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা-স্তরের উভয় পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তদনুসারে তাঁহারা বুনিয়াদী শিক্ষাকে প্রাথমিক শিক্ষার স্বরূপ হিসাবে মানিয়া লইয়াছেন এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে বুনিয়াদী শিক্ষা প্রচলিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং এক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেশের সর্বত্র প্রাথমিক শিক্ষাকে বুনিয়াদী শিক্ষায় পরিণত করিবার কথাও বলিয়াছেন। তদনুসারে দেশে বহু নূতন বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে ও পুরাতন ধরণের প্রাথমিক বিদ্যালয়কে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পরিণত করা হইতেছে। তবে সার্জেন্ট্ পরিকল্পনা অনুসারে স্বাবলম্বনের নীতি অনুসৃত হইতেছে না, ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক।

এখন নয়ী তালীম বুনিয়াদী স্তর অতিক্রম করিয়া অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে অর্থাৎ উহা উত্তর বুনিয়াদী পার হইয়াছে। উত্তম বুনিয়াদীতে

(বিশ্ববিদ্যালয়-স্তরে) উন্নীত হইয়াছে। রাষ্ট্র ও সমাজের এবং বুনিয়াদী স্তর উত্তীর্ণ ছাত্রদের কল্যাণের দৃষ্টিতে নিম্নতম স্তর হইতে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত শিক্ষানীতি ও শিক্ষা-পদ্ধতির সঙ্গতি বিধান করা অনিবার্যরূপে আবশ্যক। অর্থাৎ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষায় নয়ী তালীমের নীতির ভিত্তি (গৃহশিল্পের মাধ্যমে শিক্ষা) গ্রহণ করা প্রয়োজন।

এজন্য ১৯৫৬ সালে সেবাগ্রামে যে অখিল ভারত উত্তর বুনিয়াদী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে নম্রতা অথচ দৃঢ়তা সহকারে এই অভিমত ব্যক্ত করা হয়,—

"ভারত সরকারকে এখন স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে মাধ্যমিক শিক্ষার রূপও বুনিয়াদী শিক্ষার বিকশিত রূপ হওয়া উচিত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাও নয়ী তালীমের সিদ্ধান্তের উপর আধারিত হওয়া উচিত।"

এই কারণে সম্মেলন ভারত সরকারের নিকট সুপারিশ করেন,—

"তাঁহারা মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় এই প্রকারের পরিবর্তন করিবার জন্য শীঘ্র সিদ্ধান্ত করুন এবং উহা কার্যকরী করিবার জন্য আবশ্যকীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করুন।"

কিন্তু সরকার এ সম্বন্ধে এ যাবৎ কিছুই করেন নাই। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ সম্বন্ধে কেহ কেহ এরূপ মনে করেন যে আমাদের জাতীয় সরকার প্রাথমিক শিক্ষায় নয়ী তালীমের নীতি মানিয়া লইয়াছেন বটে কিন্তু নয়ী তালীমের বিচারধারার প্রতি বিশ্বাসপূর্বক তাহা মানিয়া লন নাই। আজও তাঁহারা বুনিয়াদী প্রণালীতে পূর্ণ বিশ্বাসী নহেন। তাঁহারা কেবল দেশের পরিস্থিতির প্রয়োজনে উহা মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন।

শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে বেকারত্ব, অসন্তোষ, নৈরাশ্য ও উগ্রতা অতি দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। রাষ্ট্রের নিরাপত্তার দৃষ্টিতে কোন সরকার উহাতে উদাসীন থাকিতে পারেন না। এজন্য তাঁহারা শিক্ষার পরিবর্তন করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছেন ও ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে শৈশব হইতেই শ্রম ও কর্মপরায়ণ করিয়া তুলিতে চাহিয়াছেন।

কিন্তু তাঁহারা নয়ী তালীমের নীতি (কাজের মধ্য দিয়া শিক্ষা) ছোট ছেলেদের ক্ষেত্রে মানিয়াছেন বটে কিন্তু যুবকদের শিক্ষা-ক্ষেত্রে তাঁহারা এই

নীতিতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। এজন্য মাধ্যমিক শিক্ষায় বিবিধ শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে বটে কিন্তু উহাদের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার নীতি মানা হয় নাই। অথচ অন্তত হাইস্কুল স্তরের শিক্ষায় এই নীতি মানিয়া লওয়ার বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে। কারণ দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থায় মাধ্যমিক শিক্ষার এক বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। উহা প্রাথমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় এই দুই স্তরের মধ্যবর্তী। যদি মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা সর্বোত্তম নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হয় তবে সহজে অনেক সমস্যার সমাধান হইয়া যাইতে পারে। নয়ী তালীমে প্রাথমিক স্তরে ছাত্রদের মধ্যে ভাল ভাল বৃত্তি ও সংস্কার উন্মেষিত করা হয়। উহাতে প্রথম হইতে দায়িত্ববোধ জাগ্রত করিয়া তাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা হয়। মাধ্যমিক অর্থাৎ উত্তর বুনিয়াদীতে প্রাথমিক স্তরে লব্ধ কর্ম ও জ্ঞানের সংস্কারসমূহকে দৃঢ়তর করা হয় এবং দায়িত্ব-বোধকে পুষ্ট করা হয়। কারণ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্য হইতে একদিকে প্রাথমিক শিক্ষক সংগ্রহ করিতে হইবে এবং অন্যদিকে উচ্চ শিক্ষার জন্য যোগ্য শিক্ষার্থী এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের কার্য সঞ্চালনের জন্য যোগ্য কর্মীও সংগ্রহ করিতে হইবে। এজন্য এ বিষয়ে নয়ী তালীমের কর্মীদের গুরুতর দায়িত্ব রহিয়াছে। তাঁহারা দেশের মধ্যে ব্যাপকভাবে উত্তর বুনিয়াদীর এরূপ নমুনা তুলিয়া ধরুন যাহাতে জনগণ ও সরকারের সন্দেহের নিরসন হইয়া যায় এবং তাঁহারা উহাকে একটি উন্নততর শিক্ষাপ্রণালী স্বরূপ গ্রহণ করিতে প্রেরণা লাভ করেন।

সরকার তাঁহাদের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা স্তরে বুনিয়াদী শিক্ষানীতি মানিয়া লইয়া তাহা অনুসরণ না করিলেও যদি উত্তর বুনিয়াদী বা উত্তম বুনিয়াদী শিক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে স্বীকৃতি দান করিতেন তাহা হইলেও ঐ শিক্ষার প্রসারের পথ কিছুটা উন্মুক্ত হইত। বর্তমানে 'উত্তর বুনিয়াদী শিক্ষা উত্তীর্ণ' এই প্রমাণপত্র সরকারী কাজ পাওয়ার ব্যাপারে কাজে আসে না এবং ঐ উত্তীর্ণ ছাত্রদের কোন স্বীকৃতি দান করা হয় না। ইহাতে ছাত্রদের উত্তর বুনিয়াদী বা উত্তম বুনিয়াদী শিক্ষা গ্রহণের উৎসাহ কমিয়া যায়।

প্রকাশ যে বিহার সরকার এক আদেশ জারি করিয়া স্থির করিয়াছেন যে উত্তর বুনিয়াদীর প্রমাণপত্র ম্যাট্রিকুলেশানের প্রমাণপত্রের সমকক্ষ হইবে।

দেশের অন্যান্য রাজ্য সরকার অন্তত এরূপ কিছু করিলেও নয়ী তালীমের পক্ষে কিছু হিত করা হইত। কিন্তু ইহা গৌণ প্রশ্ন। মুখ্য প্রশ্ন হইতেছে শিক্ষার সর্বস্তরে নয়ী তালীমের নীতি মানিয়া লইয়া এবং তাহা অনুসরণ করা।

যাহাহউক, ইহা সুখের বিষয় যে পাঞ্জাব, মাদ্রাজ ও কেরল সরকার বে-সরকারী উত্তর বুনিয়াদী শিক্ষাকে স্বীকৃতি দান করিয়াছেন।

নয়ী তালীম বিশ্ববিদ্যালয়

সেবাগ্রামের উত্তর বুনিয়াদীর ছাত্রেরা শিক্ষাক্রম সমাপ্ত করিলে পর প্রশ্ন উঠিল যে তাহারা অতঃপর কি করিবে। নয়ী তালীমের আদর্শানুরূপ সমগ্র শিক্ষা কি তাহারা পাইয়াছে ? না, তাহা পায় নাই। নয়ী তালীমে পরিপূর্ণ জীবনের যে কল্পনা করা হয় তাহার তুলনায় তাহারা যে শিক্ষালাভ করিয়াছে তাহা খুবই সীমাবদ্ধ। তবে তাহারা এখন কি করিবে ? যদি আর পড়িতে না চায় তবে তাহারা যাহা শিখিয়াছে দেশের কল্যাণের জন্য তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারিবে এবং স্বয়ং চেষ্টা করিয়া নিজেদের জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

কিন্তু যদি কেহ আরও পড়িতে চায় তবে তাহাদের জন্য কি ব্যবস্থা করা যাইতে পারে ? তাহাদের জন্য নয়ী তালীমের উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা করা কি উচিত নহে ? আর ব্যবস্থা করা কি সম্ভব নহে ? এই সব সমস্যা সম্মুখে আসিয়া যায় এবং নয়ী তালীমের বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষা-ব্যবস্থা করিবার প্রশ্ন উঠে। উত্তর বুনিয়াদী উত্তীর্ণ ছাত্রদের উচ্চতর শিক্ষার জন্য কিছু ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, ইহা সকলেই অনুভব করেন। এই প্রসঙ্গে গ্রামের জন্য পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবারও প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। মহাত্মা গান্ধীও নয়ী তালীমের বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষা-ব্যবস্থার কথা চিন্তা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,

> "আমি কলেজের শিক্ষায় ক্রান্তি সাধন করিব ও জাতীয় প্রয়োজনের সহিত উহার সামঞ্জস্য বিধান করিব।"

প্রচলিত বিশ্ববিত্থালয়গুলির সংস্কারের জন্য পরিকল্পনা রচনা করিয়া তাহা দেশের সমক্ষে উপস্থিত করিবারও প্রশ্ন উঠে। এই সব প্রশ্ন সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা ও বিচার-বিবেচনা করা হয়। এই সিদ্ধান্ত করা হয় যে যদিও বিশ্ববিত্থালয় বলিতে এক বিরাট জিনিস ও এক বিরাট শিক্ষা-ব্যবস্থার কথা বুঝায়, তথাপি যে সব ছাত্র উত্তর বুনিয়াদী উত্তীর্ণ হইয়া উচ্চতর শিক্ষালাভ করিতে চাহে তাহাদের উচ্চতর শিক্ষার জন্য যেটুকু ব্যবস্থা করা প্রয়োজন তাহা করিতে হইবে। তাহার নাম বিশ্ববিত্থালয় বা অন্য কিছু নাম দেওয়া যাইতে পারে। প্রচলিত বিশ্ববিত্থালয়গুলির সংস্কারের জন্য পরিকল্পনা রচনার যে কথা উঠিয়াছিল তৎসম্পর্কে বিনোবাজী যে অভিমত ব্যক্ত করেন তাহাই সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হয়।

বিনোবা বলেন যে, নয়ী তালীমকে বুনিয়াদী শিক্ষা বলার অর্থ এই যে দেশের সমস্ত শিক্ষা ও সমস্ত স্তরের শিক্ষা নয়ী তালীমের মূল সিদ্ধান্তের বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। যদি প্রচলিত বিত্থালয়সমূহ নয়ী তালীমের সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন তবে তাঁহারা নিজেরাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের শিক্ষাব্যবস্থার আবশ্যকীয় সংস্কার সাধন করিয়া লইবেন। কিন্তু সহজে বা শীঘ্র ঐরূপ পরিবর্তন আসা সম্ভব নহে। এ সম্পর্কে বিনোবাজী শ্রীকিশোরলাল মশ্রুওয়ালার এই অভিমত সমর্থন করেন যে বিশ্ববিত্থালয়গুলি পুরাতন ছাঁচে গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহাদের পক্ষে কায়া পাল্‌টানো অল্প সময়ের বা সহজ ব্যাপার হইতে পারে না। উপরন্তু বিনোবাজী বলেন যে নয়ী তালীমের একটি পরিপূর্ণ নমুনা এখনও গড়িয়া তোলা সম্ভব হয় নাই। স্থতরাং তাহা করিবার পূর্বেই বিশ্ববিত্থালয়গুলিকে সংশোধিত করিবার পরিকল্পনা রচনা করিয়া তাহা তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত করা ঠিক হইবে না।

বিশ্ববিত্থালয় স্তরের শিক্ষাক্রম

উত্তর বুনিয়াদী উত্তীর্ণ ছাত্রদের জন্য সেবাগ্রামে বিশ্ববিত্থালয় স্তরের (স্নাতক স্তরের) শিক্ষার পরিকল্পনা ও শিক্ষাক্রম রচনা করিবার জন্য হিন্দুস্তানী তালীমী সঙ্ঘের এক উপসমিতি গঠন করা হয়। তাঁহারা একটি পরিকল্পনা ও শিক্ষাক্রম রচনা করেন। তাহাতে বিশ্ববিত্থালয় স্তরের

শিক্ষাকাল তিন বৎসর ধার্য করা হয়। তাহাতে বলা হয় যে স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও কারিগরী শিক্ষার জন্য দীর্ঘতর সময়ের প্রয়োজন হইতে পারে। উহাতে ৮টি পাঠ্যবিষয়ে পরিষদ (ফ্যাকাল্টি) গঠন করা হয়—যথা : (১) কৃষি ও সংশ্লিষ্ট শিল্পসমূহ, (২) পশু-পালন ও দুগ্ধ বিদ্যা, (৩) খাদ্য ও পুষ্টি-বিজ্ঞান, (৪) পল্লী-শিল্প, (৫) গ্রাম্য স্বাস্থ্যরক্ষা, (৬) গ্রাম্য শিক্ষা, (৭) গ্রাম্য কারিগরী শিক্ষা ও (৮) খাদি-বিজ্ঞান।

নয়ী তালীমের বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষায় শিক্ষক ও ছাত্রগণের সহযোগী ও শ্রম-আধারিত জীবন চলিতে থাকিবে। উহার ভিত্তিতে তাঁহারা আদর্শ স্বাবলম্বী গ্রাম স্বরূপে জীবন যাত্রা নির্বাহ করিতে থাকিবেন। শিক্ষার্থীরা উহার মাধ্যমে ব্যক্তিগত ও সামূহিক জীবনের সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহে উচ্চতর জ্ঞান লাভ করিতে থাকিবেন এবং ব্যক্তিগত ও সামুহিক জীবনের পরিপূর্ণ নমুনা গড়িয়া তুলিবেন। আর অনেক বিষয়ে তাঁহাদের কার্য গবেষণামূলক হইবে।

নয়ী তালীমের বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয় বলা হইয়া থাকে। বিনোবাজী বলেন যে উহাকে বিশ্ববিদ্যালয় অথবা অন্য কিছু বলা যাইতে পারে। তিনি উহাকে উত্তম বুনিয়াদীও বলেন। আর্যনায়কমজী বলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের উক্ত শিক্ষা-পরিকল্পনা গ্রামের কল্যাণের দৃষ্টিতেই করা হইয়াছে। দেশের শতকরা ৮৫ জন গ্রামের লোক। সুতরাং উহাকে 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়' বলা যাইতে পারে। তাহাতে গ্রাম ও সহরের ভেদভাব দূরীভূত হইবে।

এই কল্পনা অনুসারে সেবাগ্রামে শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রথম স্নাতক দলকে কাঞ্চী-পুরম (মাদ্রাজ) সর্বোদয় সম্মেলন কালে অনুষ্ঠিত সমাবর্তন উৎসবে উপাধি প্রদান করা হয় একথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

বিনোবাজী প্রথম অবস্থায় মাত্র সেবাগ্রামের জন্য তৎকালীন প্রয়োজন বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষাক্রম ও শিক্ষা-পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার জন্য পরামর্শ দিয়াছিলেন। কারণ তখন প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু করার অবস্থা ছিল না। এখন বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার একটি নমুনা (উহা আদর্শানুরূপ বা আশানুরূপ না হইলেও) দেশের সম্মুখে আসিয়া গিয়াছে। অন্যান্য দিক হইতেও পরিস্থিতির পরিবর্তন হইয়াছে।

গ্রামে-গ্রামে বিশ্ববিদ্যালয়

এই অবস্থায় বিনোবাজী এখন বলিতেছেন যে গ্রামে-গ্রামে বিশ্ববিদ্যালয় হওয়া চাই। বিনোবাজী কি কোন অবাস্তব কল্পনাবশে একথা বলেন? যে সব কথা মানুষ কোনদিন ভাবে নাই এমন সব কথা মহাত্মা গান্ধী বলিতেন। কিন্তু তিনি কখনও এমন একটিও কথা বলেন নাই যাহা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কাজে লাগানো সম্ভব নহে। তিনি কল্পনাপ্রবন ছিলেন—ইহা ঠিক কথা। কিন্তু তাঁহার কল্পনাসমূহ ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগের অনুপযোগী হইত না। এজন্য তিনি নিজেকে 'প্রাকৃটিক্যাল ভিসনরী' বলিতেন। বিনোবাজী সম্বন্ধেও ঐ একই কথা বলা যায়। এজন্য তিনি যখন গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলেন, তখন তিনি সকল দিক ভাবিয়া-চিন্তিয়া তবে উহা বলেন। তাঁহার গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়-কল্পনার ব্যবহারিকতা সম্পর্কে যে সব সংশয়ের উদ্ভব হইতে পারে তাহা তিনি নিজেই দূর করিয়াছেন। তিনি বলেন যে প্রত্যেক গ্রামেই লোকে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত বাস করে এবং সারা জীবন গ্রামে কাজ করিয়া থাকে। সুতরাং তাহাদের শিক্ষার সমস্ত ব্যবস্থা গ্রামেই হওয়া উচিত। গ্রামে সাধারণ শিক্ষা, ছোট সহরে মাধ্যমিক শিক্ষা, জেলা সহরে উচ্চশিক্ষা এবং প্রদেশের রাজধানীতে উচ্চতম শিক্ষা হইবে এরূপ মনে করা ভুল। তিনি বলেন, "যখন জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত কাজ গ্রামে চলিয়া থাকে তখন সর্বপ্রকার শিক্ষার উপকরণ গ্রামেই মজুত আছে।" কিন্তু প্রশ্ন উঠিতে পারে, গ্রামে উচ্চ বা উচ্চতম তত্ত্বজ্ঞান ও সমাজশাস্ত্র ইত্যাদি শিক্ষার ব্যবস্থা করা গেলেও বিজ্ঞান বা উচ্চ কারিগরী (টেকৃনিক্যাল) শিক্ষা ও উহাদের গবেষণার ব্যবস্থা হওয়া কি সম্ভব? ইহার উত্তরে বিনোবাজী বলেন, "আমি যে বলি প্রত্যেক গ্রামে বিশ্ববিদ্যালয় থাকা চাই তাহার অর্থ এই নহে যে প্রত্যেক গ্রামে প্রত্যেক বিষয়ের পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আজ সহরের বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়েও কি ইহা সম্ভব? প্রত্যেক বিদ্যালয়ে প্রত্যেক ফ্যাকাল্‌টি অর্থাৎ প্রত্যেক বিষয়ের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ব্যবস্থা তো হয় না। দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্য সব ব্যবস্থা সমান থাকিলেও উহার মধ্যে যেখানে কোন বিষয়ের চর্চা ভাল হয়, সেইখানেই অধিক সংখ্যক ছাত্র গিয়া থাকে। গ্রামের বিশ্ববিদ্যালয়েও সেইরূপ হইবে। সাধারণভাবে

প্রত্যেক স্থানে উচ্চতম শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে। কিন্তু যেখানে বন বেশী সেখানে 'বন-বিজ্ঞান' অথবা 'কাষ্ঠ বিজ্ঞানে'র ফ্যাকাল্টি থাকিবে। সকল স্থানে ঐ বিষয়ের (ফ্যাকাল্টি) ব্যবস্থা করা যাইতে পারে না। ইহাও বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক যে বহুরকম উচ্চ জ্ঞানের ব্যবস্থা সরঞ্জামের উপর নির্ভর করে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, জ্যোতিষ-শাস্ত্রের জ্ঞানের জন্য প্রতিদিন দূরবীণের সাহায্যে দেখিবার প্রয়োজন হয় না। কখন কখন উহার দ্বারা দেখিয়া লইলে যথেষ্ট হয়। সুতরাং প্রতি গ্রামে দূরবীণ রাখার ব্যবস্থা করিতে পারা না গেলেও গ্রামে-গ্রামে জ্যোতিষ-শাস্ত্রের অধ্যয়ন চলিতে পারে। দূরবীণ কোন এক কেন্দ্রীয় স্থানে রাখিতে পারা যায় এবং প্রয়োজন হইলে সেখানে গিয়া উহা ব্যবহার করিতে পারা যায়।"

গ্রামে সর্বোত্তম শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ

"গবেষণার জন্য তিনটি জিনিসের প্রয়োজন : (১) দার্শনিক বৃত্তি, (২) হাতে কাজ করিবার অভ্যাস-কুশলতা এবং (৩) সরঞ্জাম। আমরা দেখিয়াছি যে গ্রামে দার্শনিক বৃত্তি গড়িয়া উঠিবার পথে কোন বাধা নাই। কাজ করার কুশলতা অর্জনের পক্ষেও সেখানে যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে। কারণ সেখানে লোক নিজ হাতে সকল কাজই করিয়া থাকে। অধিকাংশ সরঞ্জামও সেখানে পাওয়া যায়। কারণ সমগ্র সৃষ্টি সেখানে উন্মুক্ত পড়িয়া রহিয়াছে। যে উপকরণ সব স্থানে পাওয়া যায় না তাহার আলোচনাও আমরা উপরে করিয়াছি।"

এই প্রকারে গ্রামে-গ্রামে সর্বোত্তম শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ আছে এবং প্রত্যেক গ্রামে উহার ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। 'এক ঘণ্টার পাঠশালা'র ভিতর দিয়া গ্রামে-গ্রামে ইহার আরম্ভ ও প্রস্তুতি করা প্রয়োজন। আজ জ্ঞানলাভের সুযোগ সীমাবদ্ধ। জ্ঞানকে যদি ব্যাপক করিতে হয় এবং সকলের জন্য উহার দরজা উন্মুক্ত করিতে হয় তবে এই প্রকারে তাহা সম্ভব হইতে পারে।"

নয়ী তালীমে বয়স্ক-শিক্ষা

গান্ধীজীর উপদেশ অনুসারে ১৯৪৫ সালে নয়ী তালীমের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ করিয়া পূর্ব-বুনিয়াদী, উত্তর বুনিয়াদী ও বয়স্ক-শিক্ষা নয়ী তালীমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়—ইহা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। ১৯৪৪ সালে হিন্দুস্তানী তালীমী সঙ্ঘ বয়স্ক-শিক্ষা সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করিয়া সুপারিশ করিবার জন্য এক উপসমিতি গঠন করেন। উক্ত উপসমিতির সুপারিশসমূহের ভিত্তিতে পরিকল্পনা ও শিক্ষাক্রম রচনা করিবার জন্য এক বয়স্ক-শিক্ষা সমিতি নিয়োগ করা হয়। তাঁহারা একটি শিক্ষাক্রম রচনা করেন। অতঃপর এই নূতন বয়স্ক-শিক্ষার কাজ সেবাগ্রামে আরম্ভ করা হয়। শ্রীমতী শান্তা নরুলকর মহাত্মা গান্ধীর পথ-নির্দেশে এই কাজের সূচনা করেন।

আজকাল বয়স্ক-শিক্ষা সম্বন্ধে অনেকে আগ্রহশীল হইয়াছেন এবং উহার আলোচনা হইয়া থাকে। বহু সংস্থা বয়স্ক-শিক্ষার কার্যক্রম গ্রহণ করিয়া গ্রামে ও সহরের বস্তি অঞ্চলে বয়স্ক-শিক্ষা চালাইয়া থাকেন। প্রচলিত বয়স্ক-শিক্ষার সহিত নয়ী তালীমের বয়স্ক-শিক্ষার পার্থক্য কি তাহা বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক এবং তাহা হইলে নয়ী তালীমের বয়স্ক-শিক্ষার বৈশিষ্ট্য কোথায় তাহা উপলব্ধি করা যাইবে। প্রচলিত বয়স্ক-শিক্ষা যে ধারণা লইয়া আরম্ভ করা হয় তাহা নয়ী তালীমের দৃষ্টিতে ক্রটীপূর্ণ। তাহাতে গ্রাম বা সহরের যে সব লোকের অক্ষর জ্ঞান নাই এবং যাহাদের কখনও স্কুলে যাওয়ার সৌভাগ্য হয় নাই তাহারা অশিক্ষিত এই ধারণা পোষণ করা হয়। এ দেশে বয়স্ক-শিক্ষার কাজ যে সব সংস্থা চালাইয়া থাকেন তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে আক্ষরিক লেখাপড়া শিখানো এবং ঐ জন্য অক্ষরজ্ঞান শিক্ষা হইতেই কাজ আরম্ভ করা হয়। কৃষক সৎপথে থাকিয়া কৃষিকার্যের দ্বারা তাঁহার জীবিকা উপার্জন করেন। কৃষি সম্পর্কে তাঁহার অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান যথেষ্ট আছে। উপরন্তু সংসার সম্বন্ধেও তাঁহার সাধারণ জ্ঞান আছে। মাতা-পিতা, পত্নী, পুত্র-কন্যা প্রভৃতি কাহার সহিত কিরূপ আচরণ করা উচিত, গ্রামে তাঁহার কি ভাবে থাকা উচিত ইত্যাদি বিষয় তাঁহার ভালভাবে জানা আছে। তবে তিনি নিজের নাম স্বাক্ষর করিতে পারেন না। এইরূপ লোককে

অশিক্ষিত বলিয়া মনে করা হইবে কেন? মহাত্মা গান্ধী এরূপ লোককে অশিক্ষিত বলিয়া মনে করিতেন না। আর্যনায়কমজী এক দৃষ্টান্ত দিয়া উহা বুঝাইয়াছেন। তিনি বলেন,—

"আমি সেদিন (১৯৪৯) মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন সভায় গিয়াছিলাম। সেখানে প্রায় ১৩০০ স্নাতক উপাধি লাভ করেন। তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন বিজ্ঞান ও কৃষির গ্রাজুয়েট। মনে করুন, যদি মহীশূর সরকার ইহাদিগকে জমি দিয়া কৃষির দ্বারা জীবন নির্বাহ করিতে বলেন তবে বর্তমান কৃষকদের তুলনায় ইঁহারা কোথায় দাঁড়াইবেন? উভয়ের মধ্যে কাহার উৎপাদন অধিক হইবে? এই প্রশ্নের উত্তর কি তাহা আপনাদের কাছে গোপন নাই। অতএব আপনারাই বুঝুন প্রকৃত শিক্ষিত অর্থাৎ জ্ঞানী, অভিজ্ঞ এবং নিজের প্রয়োজনের বিষয়ে স্বাবলম্বী কে হইলেন?"

গ্রামের যে সব শ্রমনিষ্ঠ লোক লেখাপড়া জানে না তাহারা অশিক্ষিত নহে এই ধারণার ভিত্তিতে বয়স্ক-শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। নয়ী তালীমের প্রৌঢ়শিক্ষার আর একটি মূল সিদ্ধান্ত এই যে অক্ষরজ্ঞান অস্ত্র স্বরূপ। উহার দ্বারা অস্ত্রোপচার করিয়া রোগীর রোগযন্ত্রণার প্রতিকার করা যায়। আবার উহার দ্বারা জীবননাশ করা যায়। সেরূপ অক্ষরজ্ঞানের সাহায্যে মানুষের সদ্‌গুণসমূহকে জাগ্রত ও পুষ্ট করা যায়। মানুষ আবার উহাকে কুপথে চলিবার সহায়ক করিয়া লইতে পারে। এজন্য অক্ষরজ্ঞান প্রকৃত প্রৌঢ়-শিক্ষার আরম্ভ নহে, শেষও নহে। কিন্তু একথার দ্বারা ইহা যেন মনে করা না হয় যে প্রৌঢ়শিক্ষায় লেখাপড়াকে (আক্ষরিকতা) একেবারে অবহেলা করা হয়। এ কথার অর্থ এই যে প্রৌঢ়শিক্ষায় আক্ষরিকতার স্থান মুখ্য নহে। ঠিক সুযোগমত ও সমুচিত পদ্ধতিতে উহা শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। বয়স্ক শিক্ষার্থীদের জীবনের উন্নতির পক্ষে আবশ্যকীয় জ্ঞান শিক্ষা দিতে দিতে উহার ফলে যখন তাহাদের লেখাপড়া শিখিবার প্রয়োজন অনুভূত হইবে, তখন সহজে তাহাদিগকে লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়ার সুযোগ হইবে। প্রকৃত শিক্ষা ব্যতীত বর্ণপরিচয় স্থায়ীও হয় না। লেখা-পড়া কিছু শিখাইয়া দিলেও প্রৌঢ় ছাত্রেরা পরে প্রায় সবই ভুলিয়া যায়। প্রচলিত বয়স্ক-শিক্ষার এরূপ পরিণতি অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে। যদি প্রকৃত জীবন-শিক্ষার সঙ্গে অক্ষর

পরিচয় যোগ করিয়া দেওয়া যায় তবে সাক্ষরতার সদ্ব্যবহার হইবে এবং উহা স্থায়ীও হইবে।

যাহারা লেখাপড়া জানে না, তাহারা অশিক্ষিত নহে বটে কিন্তু তাহাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। জীবনের উন্নতিসাধন করিবার সুযোগ তাহারা পায় না। মানবজীবন কিরূপ হওয়া চাই তাহার কোন আদর্শ তাহাদের সম্মুখে নাই। ঐরূপ বয়স্কদিগকে জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশসাধনের জন্য সহোয্য করা বয়স্ক-শিক্ষার উদ্দেশ্য।

ঈশ্বরের যোজনা অপূর্ণ নহে। সন্তান জন্মগ্রহণ করে, সেইসঙ্গে তাহার জন্য দুগ্ধের ব্যবস্থা তাহার প্রসূতির বুকেই করা থাকে। বিনোবাজী বলেন, সেইজন্য ইহা বুঝিয়া লওয়া উচিত যে কর্মের সঙ্গে সঙ্গে সহজভাবে জ্ঞান লাভের ব্যবস্থাও যুক্ত করিয়া দেওয়া আছে। মানুষ কর্ম করে এবং কর্ম করিতে করিতে সহজভাবে তাহার জ্ঞানলাভ হইতে থাকে। অতএব যিনি বয়স্ক-শিক্ষার কাজ গ্রহণ করিবেন তাঁহার এই ধারণা থাকা আবশ্যক যে কাজ করার ভিতর দিয়া মানুষ সহজভাবে শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। গ্রামের লোক সারাদিন কাজ করে। তাহাদের দৈনন্দিন কাজের মাধ্যমে তাহারা সারাদিন শিক্ষালাভ করে। ঐ শিক্ষালাভ সম্পর্কে আমরা তাহাদের কি ভাবে সাহায্য করিতে পারি তাহাই বয়স্ক-শিক্ষার উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তাহাদের ঐ স্বাভাবিক শিক্ষা-প্রক্রিয়ার মধ্যে যেটুকু অপূর্ণতা থাকে তাহাকে পূর্ণ করা বয়স্ক-শিক্ষার লক্ষ্য।

এজন্য যিনি বয়স্ক-শিক্ষার শিক্ষক হইবেন তাঁহাকে বয়স্ক শিক্ষার্থীর জীবন যাত্রায় অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। কোথায় তাহাদের জ্ঞানের অপূর্ণতা তাহা তখনই তিনি উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বিনোবাজী বলেন, এ কথার অর্থ এমন নহে যে বয়স্কেরা প্রত্যহ আট ঘণ্টা শরীরশ্রম করে, সুতরাং শিক্ষককেও তাহাদের সঙ্গে আট ঘণ্টা শ্রম করিতে হইবে এবং সর্বদা তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে হইবে। তবে বয়স্ক ছাত্রেরা যে কাজ করে সেই কাজ শিক্ষকের হাতে-কলমে শিক্ষা করা চাই। শিক্ষক এইভাবে কাজে অংশ গ্রহণ করিলে তাহাদের জীবনে যে অপূর্ণতা তাহা তিনি বুঝিতে পারিবেন এবং তাহা পূর্ণ করিবার মত শিক্ষাদানের যোগ্যতাও অর্জন করিতে পারিবেন।

বয়স্ক-শিক্ষার এক প্রধান কাজ হইতেছে বয়স্কদের মধ্যে জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করা। গ্রামের মধ্যে যে জড়তা স্বাভাবিকভাবে দেখা যায় তাহার জন্ম তাহাদের মধ্যে নূতন জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা তেমন জাগ্রত হয় না। এজন্য তাহাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার পথে যেসব প্রয়োজন জরুরীভাবে দেখা দিবে সঙ্গে সঙ্গে সে সম্বন্ধে জ্ঞানদানের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হইবে। তবেই তাহাদের আগ্রহ ও জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করা সহজ হইবে। নয়ী তালীমে সকল স্তরে কাজের মধ্য দিয়া শিক্ষা-দানের নীতি গ্রহণ করা হয়। সুতরাং বয়স্ক-শিক্ষায়ও তাহাই করা হয়। কিন্তু ইহাতে তাৎকালিক ব্যবহারিক প্রয়োজনের বিষয় অবলম্বন করিয়া তাহার মাধ্যমেও সুযোগমত শিক্ষাদান করিতে হয়।

অক্ষরজ্ঞান অর্থাৎ লেখা ও পড়া শিখাইবার সময় যাহাতে উহা সরলভাবে ও সহজে শিখানো হয় সেইদিকে বিশেষ নজর দিতে হইবে। পূর্বে বলা হইয়াছে অক্ষরজ্ঞানের দ্বারা বয়স্কদের শিক্ষা আরম্ভ করিবার প্রয়োজন নাই। শ্রবণের মাধ্যমে শিক্ষাদান করিতে হইবে। বয়স্কদের শুনিয়া শিখিবার আগ্রহ পড়া অপেক্ষা বেশী।

বয়স্ক-শিক্ষায় চারিটি মুখ্য বিষয়

সুতরাং বয়স্ক-শিক্ষায় যে চারিটি বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে সে সম্বন্ধে বিনোবাজী বলেন ঃ

> "প্রথমত আমাদের বয়স্ক-শিক্ষার উদ্দেশ্য হইবে পূরক শিক্ষা। দ্বিতীয়ত যিনি শিক্ষাদান করিবেন তিনি লোকের দৈনন্দিন কাজে অংশ গ্রহণ করিবার মধ্য দিয়া নিজের কাজ করিবেন। তৃতীয়ত পড়ানোর উপর অল্প কিছু দৃষ্টি দিতে হইবে, কিন্তু উহার উপর অধিক গুরুত্ব দিতে হইবে না। চতুর্থত যে বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইবে তাহা যেন আজিকার আশু সমস্যা হয়।"

নয়ী তালীমের নীতি অনুসারে কোন উপযোগী হস্তশিল্পের মাধ্যমে শিক্ষাদানের নীতি বয়স্ক-শিক্ষায়ও গ্রহণ করিতে হইবে একথা উপরে বলা হইয়াছে। এজন্য গ্রামের লোক যে কৃষি বা যে গৃহশিল্পের কাজ করিয়া জীবিকা অর্জন করে, শিক্ষার মাধ্যম স্বরূপ তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে।

সেই কাজে তাহার কুশলতা যাহাতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় সেজন্য বুদ্ধিপূর্বক বা বৈজ্ঞানিকভাবে অর্থাৎ কাজের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রত্যেক প্রক্রিয়ার 'কি ও কেন' বুঝিয়া ও তৎসম্পর্কে সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করিতে করিতে তাহাকে অগ্রসর হইতে হইবে। বয়স্ক শিক্ষার্থীদের ঘরে ঘরে যাইবার প্রয়োজন হইবে ও অবসর সময়ে তাহাদিগকে একত্রিত করিয়া শিক্ষাদান করিতে হইবে। প্রকৃত বয়স্ক-শিক্ষার সুব্যবস্থা করিতে হইলে গ্রামের লোকেরা যে কাজ (কৃষি বা হস্তশিল্প) করিয়া জীবিকা অর্জন করে তাহার জন্য গ্রামে একটি গবেষণা-গৃহ থাকা আবশ্যক। সেখানে দুপুরে কাজের বিরতির সময় (সুবিধা হইলে) বা সন্ধ্যায় এক বা দেড় ঘণ্টাকাল বয়স্ক বিদ্যালয় চলিবে। বিদ্যালয়ে শিক্ষাক্রম কিরূপ হওয়া উচিত তাহা বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক।

পূর্ব-বুনিয়াদী শিক্ষায় শিশু-পালন সম্পর্কে মাতা-পিতার কর্তব্য সম্বন্ধীয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হয়। এ কথা পূর্ব-বুনিয়াদী অধ্যায়ে উল্লেখ করা হইয়াছে। উহা বয়স্ক-শিক্ষার এক প্রয়োজনীয় অঙ্গ স্বরূপ গণ্য হওয়া উচিত।

উপরে বলা হইয়াছে যে বয়স্ক-শিক্ষা পূরক শিক্ষা হইবে। সকলেই কৃষিকার্যের দ্বারা জীবিকা অর্জন করে এরূপ একটি গ্রামের লোকদের কথা দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাউক। বয়স্ক-শিক্ষায় তাহাদের কি কি বিষয় শিখাইতে হইবে তাহা দেখা যাউক। প্রথমত কৃষিকার্য সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞানের যে অভাব আছে তাহা পূরণ করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের পক্ষে অন্য যে যে জ্ঞান আবশ্যকীয় তাহা কৃষিশিক্ষা বা কোন পরিপূরক গৃহশিল্পের মাধ্যমে শিখাইতে হইবে। তৃতীয়ত তাহাদের জীবিকা অর্জনের জন্য পরিপূরক কোন গৃহশিল্পের প্রয়োজন হইলে তাহার শিক্ষাদান করা। চতুর্থত লেখা ও পড়া শিক্ষা করিতে হইবে। আর একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে বয়স্ক-শিক্ষাও স্বাবলম্বনের লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া চালাইতে হইবে।

কৃষি সম্পর্কে পূরক স্বরূপ নিম্নলিখিত বিষয়ে শিক্ষালাভের প্রয়োজন হইবে: কৃষির জন্য আবশ্যকীয় পশু-পালন সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, আবহাওয়া, বৃষ্টি, জমির মাটির বিভিন্ন প্রকার ও উহাদের উৎপাদিকা শক্তি; জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিবার উপায়; সেচ ও সার, সার-বিজ্ঞান, কোন্ প্রকারের

সারের কি প্রয়োজনীয়তা, কৃষির বিভিন্ন পদ্ধতি, গাছের ব্যাধিসমূহ, পোকার আক্রমণের নিবারণ ও প্রতিকার, সহকারী কৃষি, ইত্যাদি। এইসব বিষয়ে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের যে অভাব আছে তাহা শিক্ষা করিতে হইবে।

জীবনের পক্ষে যে যে জ্ঞান প্রয়োজন তাহা হইতেছে :

(১) **ব্যক্তিগত** :—(ক) শরীর-বিজ্ঞান সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান ; স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়ম এবং কি ভাবে তাহা পালন করিতে হয়, সুসম খাদ্য ও তাহা ব্যবস্থা করার উপায়, সাধারণ ব্যাধি সমূহের, যথা—ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত, চর্মরোগ ইত্যাদি—উহাদের প্রতিষেধক উপায়, স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়ম, কু-অভ্যাস ও স্বাস্থ্যের উপর তাহাদের কিরূপ প্রতিক্রিয়া।

(খ) লেখা ও পড়া—সপ্তম ভাগ পর্যন্ত পাঠ, মাতৃভাষায় শুদ্ধ চিঠিপত্র লেখা, কাজকর্ম সম্বন্ধীয় পত্রাদির উত্তর দান, দরখাস্ত লেখা, সংবাদপত্র পাঠ, বক্তৃতা দেওয়া ও তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা, ধর্ম-সম্পর্কীয় গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া বুঝা, পুস্তকালয় হইতে ভাল ভাল পুস্তক লইয়া পড়িবার অভ্যাস।

(গ) গণিত—দৈনিক আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখার মাধ্যমে যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ শিক্ষা ; সংখ্যা গণনা, ক্ষেত্রফল বাহির করা, মুদ্রা ও ওজন সম্বন্ধীয় জ্ঞান (কার্য ও ব্যবহারের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ জ্ঞান) ; একর, বিঘা প্রভৃতির অনুপাত, উৎপন্ন ফসলের অনুপাত দেখিয়া একর, বিঘার অনুপাতের জ্ঞানকে দৃঢ় করা।

(ঘ) জীবিকা অর্জনের পরিপূরক উপায় স্বরূপ কোন গৃহশিল্প শিক্ষা করা, যথা—সূতাকাটা, বয়ন, কাঠের কাজ ইত্যাদি ; কারিগরী যন্ত্রশাস্ত্রের জ্ঞান ও উহার মাধ্যমে ঐ সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ।

(২) **পারিবারিক** :—(ক) পারিবারিক আয়-ব্যয়ের বাজেট (আন্দাজ পত্র), পারিবারিক আয়-ব্যয়ের হিসাব রক্ষণ। (খ) গৃহব্যবস্থা—পরিবারের লোকের উপার্জনের প্রকৃষ্ট উপায়, আয় অনুসারে ব্যয় করিবার অভ্যাস ও কৌশল, আয়ের মধ্যেই সমুচিত আহারাদির ব্যবস্থা করার উপায়, সুসম খাদ্যব্যবস্থা ইত্যাদি ; পারিবারিক জীবনে সাফাই-এর প্রয়োজনীয়তা, সাফাই-বিজ্ঞান, বাগিচা, পশু-পালন, সহকারী গৃহশিল্প ইত্যাদির দ্বারা পারিবারিক আয়ের অভাব পরিপূরণ করিবার ব্যবস্থা ও পরিবার স্বাবলম্বী

হইবার উপায়। (গ) যে সব কু-অভ্যাসের ফলে পরিবারের স্বাস্থ্য নষ্ট হয় তৎসম্পর্কে আবশ্যকীয় জ্ঞান, খাদ্য-শস্যাদির সংরক্ষণ, বাড়ীর জল নিকাশী ব্যবস্থা, বাড়ীর আবর্জনা অপসারণ ও উহার সদ্ব্যবহার, পায়খানা নির্মাণ ও ব্যবহার। (ঘ) পালক ও অভিভাবকদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য।

(পূর্ব-বুনিয়াদী শিক্ষা প্রকরণে আলোচিত)

(৩) **সামাজিক** :—(ক) গ্রামের ক্ষেত্রফল, জনসংখ্যা—অসুস্থ, বেকার, শিল্পী, কৃষক, শ্রমিক ইত্যাদির সংখ্যা ; গ্রামের জনসংখ্যার অনুপাতে জমির উৎপাদন, গ্রামের বিভিন্ন ফসল, গ্রাম স্বাবলম্বনের জন্য অতিরিক্ত ফসল উৎপাদন করিবার উপায়, জমির উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার উপায়, গ্রাম উন্নয়নের দৃষ্টিতে কৃষি উন্নতি সাধনের উপায়।

পারিবারিক অর্থশাস্ত্রের সহিত গ্রাম-অর্থশাস্ত্রের সম্বন্ধ, কৃষি ও গৃহ শিল্পের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ—একে অন্যের সহায়তা করিলে আর্থিক উন্নতি ত্বরান্বিত হয়।

বিভিন্ন পশু-পালন ও পশু-পালনের আর্থিক দিক।

গ্রামকে কিভাবে স্বাবলম্বী করা যায় ; গ্রামে উৎপন্ন কাঁচা মাল কি উপায়ে যতদূর সম্ভব পাকা মালে পরিণত করা যায় ; গ্রাম-পরিবার গঠনের আর্থিক, সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক লাভ।

(খ) সামাজিক স্বাস্থ্য :—সামাজিক স্বাস্থ্য ব্যক্তি ও পরিবারের উপর নির্ভর করে। কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি মহামারীর আকারে ছড়াইয়া পড়িবার কারণ ; প্রাথমিক চিকিৎসা (ফাস্ট এড্), গ্রামের রাস্তা, বাজার ইত্যাদির সাফাই, উহাদের জল নিকাশী ব্যবস্থা।

(গ) জেলা ও প্রদেশের সাধারণ জ্ঞান—কৃষি, আবহাওয়া, উৎপন্ন ফসল, খাদ্য-শস্য ইত্যাদির বাজার-মূল্যের উত্থান-পতনের কারণ ; সংবাদ-পত্র পাঠ করিয়া জেলা ও প্রদেশের সংবাদাদি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করার সামর্থ্য।

(ঘ) নাগরিকতা—গ্রাম পঞ্চায়েতের পুরাতন ইতিহাস, সমাজ গঠনের ইতিহাস, উহার কার্য ও সামাজিক জীবনে উহার উপকারিতা।

মতদানের (ভোটদান) অর্থ ও উদ্দেশ্য কি ? মতদাতার যোগ্যতা, বিভিন্ন সংস্থায় ভোটদাতার অধিকার, গণতন্ত্রের অর্থ কি ? লোকনীতি কি ? সাধারণ গণতন্ত্রের সহিত উহার পার্থক্য, প্রদেশের রাজ্যব্যবস্থা ও শাসন পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত জ্ঞান, দেশ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত জ্ঞান; প্রত্যেক সামুদায়িক বিষয়ে একমত হইয়া সিদ্ধান্ত করা ও কাজ করার উপকারিতা।

(৪) **সাংস্কৃতিক** ঃ—বিভিন্ন সামাজিক ব্যবহার, উৎসব, পর্ব ইত্যাদি পালন করিবার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি ? যে ভাবে উহা সাধারণত পালন করা হয়, তাহার আবশ্যকীয় সংশোধন। সংস্কৃতির প্রকৃত অর্থ কি ? ভারতীয় সংস্কৃতির উদ্ভব কি ভাবে হইয়াছে ?

সামুদায়িক প্রার্থনা, সর্ব-ধর্ম সমভাবের অর্থ, সদ্ধর্মের ভাবনা কি ভাবে বৃদ্ধি করা যায় ? ভজন, কীর্তন, সৎ সাহিত্য পাঠ, স্থানীয় ভাষায় বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ পাঠ।

উপরে যে সব বিষয়ের উল্লেখ করা হইল, তাহা হইতে মোটামুটি বুঝা যাইবে যে বয়স্কদিগের পূরক শিক্ষা কি প্রকারে হইতে পারে। অবস্থা ভেদে আবশ্যকমত ইহার সংশোধন বা পরিবর্ধন হইতে পারে। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে বয়স্ক-শিক্ষার কাজ হইতেছে কার্যত পরিপূর্ণ গ্রাম-সংগঠনের কাজ। এজন্য যাঁহারা গ্রাম-সংগঠনের কাজ করিবেন তাঁহাদের প্রত্যেকের বয়স্ক-শিক্ষা দানের যোগ্যতা অর্জন করা উচিত।

বুনিয়াদী শিক্ষা ও উত্তর বুনিয়াদী শিক্ষার নমুনা সৃষ্টি করিয়া যেভাবে দেশের সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছে, নয়ী তালীমের বয়স্ক-শিক্ষার তদ্রূপ কোন নমুনা এখনও সৃষ্টি করিয়া দেশের সম্মুখে রাখা হয় নাই। গ্রামদানী গ্রাম বয়স্ক-শিক্ষার নমুনা সৃষ্টি করিবার খুবই উপযোগী ক্ষেত্র। প্রয়োজন আদর্শনিষ্ঠ, অক্লান্ত ও নিষ্কাম সেবকের।

শিক্ষা-ব্যবস্থায় পরীক্ষার স্থান

ছাত্র কতদূর শিক্ষালাভ করিতে পারিয়াছে তাহার প্রমাণপত্রের প্রয়োজন সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু কিসের উপর ভিত্তি করিয়া ঐ প্রমাণপত্র দেওয়া হইবে এবং কে ঐ প্রমাণপত্র দিবার অধিকারী হইবেন—ইহাই সমস্যা। উপরন্তু প্রমাণপত্র দিবার জন্য ছাত্রগণের কোনরূপ পরীক্ষা লওয়া হইবে কিনা—ইহাও এক প্রশ্ন। প্রমাণপত্র প্রদানকারীর এই নিশ্চিত ধারণা হওয়া প্রয়োজন যে, ছাত্র আদর্শানুরূপ শিক্ষা ও যোগ্যতা লাভ করিয়াছে এবং সেই ধারণা যে কোন এক বিশিষ্ট প্রকারের অনুসন্ধানের ভিত্তিতে হওয়া সম্ভব তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই অনুসন্ধান কি প্রকারের হওয়া উচিত তাহাই প্রকৃত সমস্যা।

বর্তমানে যে পরীক্ষা-পদ্ধতি চলিতেছে তাহাতে এক বৎসর অন্তর অন্তর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে লিখিত বা মৌখিক প্রশ্নোত্তর দ্বারা পরীক্ষা গ্রহণ করা হইয়া থাকে। কিন্তু ছাত্রের যাহা এক বা দুই বৎসর ধরিয়া শিখিবার কথা তাহার পরীক্ষা কয়েক ঘণ্টার প্রশ্নোত্তরের দ্বারা কখনও হওয়া সম্ভব নহে। দ্বিতীয়ত শিক্ষার প্রকৃত অর্থ হইতেছে স্বাবলম্বন, ছাত্রের ব্যক্তিগত ও সামাজিক গুণ সমূহের বিকাশ এবং জীবনযাত্রার উপযোগী অর্জন। প্রচলিত পরীক্ষা-পদ্ধতিতে স্বাবলম্বন বা গুণবিকাশের পরীক্ষা হওয়া সম্ভব নহে। প্রচলিত শিক্ষায় স্বাবলম্বনের স্থান নাই ; উপরন্তু ব্যক্তিগত বা সামাজিক গুণের বিকাশ উহার লক্ষ্য নহে। তবে জীবনযাত্রা উপযোগী হউক বা না হউক, শুষ্ক জ্ঞানার্জনই উহার লক্ষ্য। জ্ঞানলাভ কতদূর করা হইয়াছে তাহার সম্যক ধারণাও ঐ পরীক্ষা পদ্ধতিতে হওয়া সম্ভব নহে। এক বৎসর বা দুই বৎসর ধরিয়া অর্জিত জ্ঞানের পরীক্ষাও কয়েকটি প্রশ্নের লিখিত বা মৌখিক উত্তরের দ্বারা সম্ভব হয় না। এ কারণে প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থায়ও ঐ পরীক্ষা অকেজো বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। ঐ পরীক্ষা-পদ্ধতির ফলে শিক্ষাদানের মান সঙ্কুচিত ও অবনত হইয়াছে। অল্প সময়ের মধ্যে পড়াইয়া ছাত্রকে কোনরকমে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করানোই একমাত্র কর্তব্য বলিয়া মনে করা হইতেছে। উপরন্তু ছাত্রও মনে করিতেছে যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার মত করিয়া কোন মতে পড়া মুখস্থ করা (ক্র্যামিং)

তাহার একমাত্র কর্তব্য। এজন্য এই পরীক্ষা প্রথা অবাঞ্ছনীয় বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। কিন্তু উহা পরিত্যাগ করিয়া উপযোগী কোন নূতন পদ্ধতি গ্রহণ করার মত অভিক্রম এখনও সমাজের মধ্যে গড়িয়া উঠে নাই।

বিনোবাজী এই পরীক্ষা-পদ্ধতির আর একটি গুরুতর ত্রুটির উল্লেখ করিয়াছেন। পরীক্ষায় শতকরা ৩৩ নম্বর পাইলে পাশ বলিয়া গণ্য করা হয়। বিনোবাজী বলেন—

"ইহার অর্থ এই যে ছাত্রকে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহার শতকরা ৬৭ ভাগ ভুলিয়া গেলে বিশেষ কোন ক্ষতি নাই। তাহার অর্থ দাঁড়ায় এই যে ছাত্রকে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা ছাত্রের জীবনের পক্ষে অত্যাবশ্যক নহে। জীবনোপযোগী হইলে উহার কোন অংশ ভুলিলে চলিত না। যেখানে জীবনোপযোগী শিক্ষা দান করা হয় সেখানে শিক্ষার কোন অংশ না শিখিলে বা শিখিয়া ভুলিয়া গেলে চলিতে পারে না। সেখানে পরীক্ষায় ১০০-এর মধ্যে ১০০ নম্বরই পাওয়া উচিত। উপরন্তু প্রচলিত পরীক্ষা-পদ্ধতিতে বাহিরের সংস্থার দ্বারা পরীক্ষা কার্য চালানো হয়। উহার ফলে অনেক সময়ে পরীক্ষার প্রশ্নাদি অনিশ্চিত ও যথেচ্ছ হইয়া থাকে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির আত্মনিয়ন্ত্রন ও স্বাবলম্বনের অধিকার না থাকায় উহাদের অভিক্রম ও মৌলিকতা অর্জনের মনোবৃত্তি জন্মিতে পারে না।"

এখন প্রশ্ন এই যে প্রচলিত পরীক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্তে কিরূপ ব্যবস্থা উপযোগী হইবে। এই প্রশ্নের সমাধান এখন জরুরী হইয়া পড়িয়াছে। কারণ প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় বর্তমান পরীক্ষা-ব্যবস্থা কোনরূপে চলিতেছে বটে কিন্তু নয়ী তালীমের ক্ষেত্রে ঐ পরীক্ষা-পদ্ধতি একেবারে অচল ও অকেজো হইবে। নয়ী তালীম স্বাবলম্বন-শিক্ষা ও স্বাবলম্বনের দ্বারা শিক্ষা। সেখানে ছাত্রের ব্যক্তিগত ও সামাজিক গুণসমূহের বিকাশ হইল কিনা তাহা বুঝিয়া লওয়া সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন। বর্তমান পরীক্ষা-পদ্ধতিতে উহা ঠিকভাবে যাচাই করা সম্ভব হয় না। এজন্য উত্তর বুনিয়াদী শিক্ষার ক্ষেত্রে এই প্রশ্ন অত্যন্ত জরুরী হইয়া উঠিয়াছে।

প্রাচীন ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থায় পরীক্ষা ছিল না। গুরু প্রত্যেক ছাত্রের প্রতি ব্যক্তিগত মনোযোগ দিতেন ও ছাত্র যতক্ষন না পাঠ শিখিয়া

লইত ততক্ষন নূতন পাঠ আরম্ভ করা হইত না। ছাত্র গুরুগৃহে বাস করিত ও শ্রমসাধ্য কাজ করিতে করিতে তাহার চরিত্র ও সামাজিক গুণাবলীর বিকাশ হইত। অধ্যয়ন কালের শেষেও কোন পরীক্ষা ছিল না। ছাত্রের স্নাতকত্ব সম্পূর্ণভাবে গুরুর অভিমতের উপর নির্ভর করিত। এসব কথা প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হইয়াছে। যদিও প্রাচীনকালে স্নাতকত্বলাভের জন্য কোনরূপ পরীক্ষা হইত না তথাপি যে কোন সময়ে স্নাতকের পাণ্ডিত্য যাচাই করিতে পারা যাইত। এজন্য সারা জীবন তাহাকে বিদ্যা কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতে হইত। এখনকার মত পরীক্ষায় পাশ করিবার পর অধীত বিষয় সব ভুলিয়া গিয়াও পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হওয়া চলিত না। ঐ ব্যবস্থা বর্তমান অবস্থায় হুবহু চালু করা হয়তো সম্ভব হইবে না।

সমীক্ষা-পদ্ধতি

নয়ী তালীমের উত্তর বুনিয়াদী স্তরে প্রচলিত পরীক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্তে 'সমীক্ষা-পদ্ধতি' চালু করা হইতেছে। 'সমীক্ষা-পদ্ধতি' কি তাহা উত্তর বুনিয়াদী অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। এখানে সংক্ষেপে উহার পুনরুল্লেখ করা যাইতেছে। এক বা দুই বৎসর অন্তর পরীক্ষার পরিবর্তে শিক্ষক প্রতিদিন, প্রতি সপ্তাহে ও প্রতিমাসে ছাত্রের অধ্যয়ন ও ক্রিয়াকলাপাদি নিরীক্ষণ করিবেন ও ছাত্র সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত গঠন করিতে থাকিবেন। ছাত্রও নিজে নিজের সমীক্ষা করিতে থাকিবে। ছাত্র নিয়মিত ডাইরী লিখিবে। তাহার অধ্যয়ন ও কার্যের পরিকল্পনা লিপিবদ্ধ করিবে। তাহার অধ্যয়ন ও কাজকর্মের বিবরণ লেখার জন্য প্রগতি-খাতা রাখিবে। শিক্ষক সেইগুলি দেখিতে থাকিবেন ও ছাত্রের কল্যাণ ও উন্নতির দৃষ্টিতে তাঁহার মতামত ছাত্রের গোচর করিবেন। ছাত্র বিদ্যালয়-পরিবার, গ্রাম-পরিবার ও অঞ্চল-পরিবারের একজন। ব্যক্তিগতভাবে ও বিভিন্ন মণ্ডলীর মধ্যে ছাত্রের আচরণ ও কার্যাদি কিরূপ হয় তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে। শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েই তাহা লক্ষ্য করিবেন। বিদ্যালয়ের সতীর্থগণ, গ্রামের সঙ্গীরা ও অঞ্চলের পরিচিত ও সহকর্মীরা তাহার সম্বন্ধে কি ধারণা পোষণ করে ও তাহাদের কাছে তাহার স্থান কোথায় এবং তাহাদের নিকট হইতে সে কিরূপ সহানুভূতি ও সহযোগিতা লাভ করে তাহা ছাত্র বুঝিবে ও চিন্তা করিবে এবং নিজেকে

আবশ্যকমত সংশোধন করিতে থাকিবে। শিক্ষকও তাহা লক্ষ্য করিবেন। এইভাবে শিক্ষক ও ছাত্রের সহযোগিতায় 'সমীক্ষা-পদ্ধতি' গড়িয়া উঠিবে। এই পদ্ধতির দ্বারা ছাত্র কতদূর স্বাবলম্বী হইতে পারিয়াছে, তাহার জ্ঞান-বিজ্ঞানের কতদূর উন্নতি হইয়াছে এবং তাহার ব্যক্তিগত ও সামাজিক গুণাবলী কতদূর বিকশিত হইয়াছে তাহা বিদ্যালয় হইতেই ঘোষণা করা যাইবে।

এরূপে ছাত্র প্রমাণপত্র পাইবার যোগ্য কিনা তাহা বিদ্যালয় নির্ণয় করিবে। উহার ভিত্তি হইবে শিক্ষকের নিরীক্ষণ ও ছাত্রের আত্ম-সমীক্ষা। ধৈর্যের সহিত এই পদ্ধতির বিকাশ সাধন করিতে হইবে। তবেই প্রমাণপত্র দিবার উন্নততর পদ্ধতি সুপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হইবে এবং বাহিরের প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত প্রচলিত পরীক্ষার স্থলে আভ্যন্তরীণ, স্বতঃসঞ্চালিত ও সুব্যবস্থিত সমীক্ষা-পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হইবে। মোট কথা, কোন্ ছাত্র প্রমাণপত্র পাইবার যোগ্য তাহা নির্ণয় করিবার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের থাকিবে এবং বিদ্যালয় তাহা বর্তমানে প্রচলিত পরীক্ষার দ্বারা নির্ণয় করিবেন না, উপর্যুক্ত সমীক্ষা-পদ্ধতিতে নির্ণয় করিবেন।

ছাত্রের আত্মসমীক্ষা মহান্ সম্ভাবনাপূর্ণ। এজন্য নিষ্ঠার সহিত উহার প্রয়োগ ও বিকাশ সাধন করিতে হইবে। সম্যকভাবে উহার বিকাশ সাধন করিতে হইলে ছাত্রের দায়িত্ববোধ এরূপভাবে জাগ্রত হওয়া প্রয়োজন, যাহাতে ছাত্র নিজের সম্বন্ধে নিজেই চূড়ান্ত অভিমত প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় এবং উহা ঘোষণা করিবার সৎসাহসও তাহার জন্মে। যতদিন সেই অবস্থায় উপনীত হওয়া না যাইতেছে ততদিন বিদ্যালয়েরই চূড়ান্ত নির্ণয় করিবার দায়িত্ব থাকিবে।

প্রাচীনকালে ছাত্রের স্নাতকত্বের যোগ্যতা সম্পর্কে গুরু সিদ্ধান্ত করিতেন। তখন কোন সরকারী বা বে-সরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ছিল না। গুরু ছাত্র গ্রহণ করিতেন ও ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষাকার্য চালাইতেন। এজন্য চূড়ান্ত নির্ণয় গুরু করিতেন। কিন্তু এখন প্রতিষ্ঠান কর্তৃকই শিক্ষা-কার্য পরিচালিত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় প্রমাণপত্র দিবার দায়িত্ব প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করিতে পারেন। অবশ্য প্রতিষ্ঠান শিক্ষকের অভিমত অনুসারে তাহা নির্ণয় করিবেন।

তবে বিদ্যালয় এই কাজ ঠিকভাবে করিতেছেন কিনা তাহা নিরীক্ষণ ও যাচাই করিবার ভার প্রথম অবস্থায় কোন বাহিরের কর্তৃপক্ষের উপর থাকিতে পারে। তাহাতে আপনা-আপনি সমশ্রেণীর বিদ্যালয়গুলির শিক্ষা-স্তরের উন্নতি হইবে ও উহাদের মধ্যে সমরূপতা আসিবে। পরিণামে কিন্তু পরিপূর্ণ দায়িত্ব বিদ্যালয়েরই উপর ন্যস্ত করিতে হইবে। তবে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে বিদ্যালয় ঠিকভাবে তাহার কর্তব্য সম্পাদন করিবে কিনা। আমাদের মনে হয় এরূপ আশঙ্কা করিবার বিশেষ কোন কারণ নাই। কারণ যখন বিদ্যালয়ের প্রমাণপত্র দিবার চূড়ান্ত অধিকার হইবে তখন ঐ অধিকারের ফলে উহার দায়িত্ববোধ উদ্বোধিত হইবে এবং ঐ দায়িত্ববোধ স্বতঃই উহাকে উহার শিক্ষাস্তরের উন্নতি সাধন করিবার ও সমীক্ষা-পদ্ধতি সঠিকভাবে প্রয়োগ করিবার প্রেরণা দান করিবে। উপরন্তু যে সব ছাত্র উহার নিকট হইতে প্রমাণপত্র পাইবে বাহিরে তাহাদের অযোগ্যতা প্রকাশ পাইলে ব্যবসায়, সরকারী ও সেবার ক্ষেত্রে সেই বিদ্যালয়ের নিন্দা রটিবে এবং ফলে উহার অস্তিত্ব বজায় রাখাও কঠিন হইবে। এরূপে এক স্বয়ংশোধন প্রণালী ক্রিয়াশীল থাকিবে।

যদি বর্তমান পরীক্ষা-পদ্ধতি উঠাইয়া দেওয়া হয় এবং তৎপরিবর্তে আভ্যন্তরীণ সমীক্ষার ভিত্তিতে শিক্ষালয়েই প্রমাণপত্র দেওয়ার প্রথা চালু করা হয় তবে দেশের মধ্যে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রণালী চলিবার পক্ষেও সুবিধা হইবে। কিন্তু এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে উহাতে সরকারী বা বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে কাজ পাইবার বা কাজ দিবার পক্ষে অসুবিধা হইতে পারে। প্রচলিত পরীক্ষার মত কোন পরীক্ষা না থাকিলে প্রার্থীর আবশ্যকীয় যোগ্যতা আছে কিনা তাহা কেমন করিয়া বুঝা যাইবে? বিনোবাজী এই অসুবিধা দূর করিবার উপায় নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে সরকারী বা বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান কর্মী নিয়োগের সময় উহাদের কাজের জন্য যেরূপ যোগ্যতা প্রয়োজন তাহা প্রার্থীদের আছে কিনা তাহা যাচাই করিবার উদ্দেশ্যে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করিলে সেই অসুবিধা দূর হইবে। কিন্তু সব ক্ষেত্রে এরূপ পরীক্ষার আয়োজন করা ব্যয়সাধ্য ব্যাপার হইতে পারে। সেজন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান পরীক্ষার জন্য কর্মপ্রার্থীদের নিকট হইতে পর্যাপ্ত ফি লইতে পারেন। যদি এই ব্যবস্থা হয়, তবে নয়ী তালীমের উৎকর্ষতা

প্রমাণ করিবার প্রকৃত সুযোগ আসিবে এবং বিভিন্ন শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে নিজ নিজ উৎকর্ষতা প্রমাণের জন্য স্বাস্থ্যপ্রদ প্রতিযোগিতা চলিতে থাকিবে। সে ক্ষেত্রে সরকার সকল প্রকারের শিক্ষার জন্য নিরপেক্ষভাবে সাহায্যদান করিবেন এবং কোন বিশেষ পদ্ধতির প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাইবেন না। প্রাচীনকালে শিক্ষা সম্বন্ধে সরকারের এইরূপ মনোভাব ছিল। আজ তাহারই পুনরুদ্ভব সর্বাপেক্ষা কাম্য। তবেই দেশের মধ্যে শিক্ষার সম্যক বিকাশ হওয়া সম্ভব হইবে।

আজকাল সকল দেশেই রাষ্ট্রশক্তি সর্বব্যাপী হইয়া দাঁড়াইতেছে। ভারত উহার ব্যতিক্রম নহে। এজন্য সকল দেশেই শিক্ষার উপর অল্পাধিক সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ছেলেমেয়েদিগকে যাহা শিখানো হইতেছে তাহারা তাহাই শিখিতেছে। যে দলের সরকার সেই দলের আদর্শ ও বৈশিষ্ট্যের অনুরূপ শিক্ষা দিবার প্রচেষ্টা করা হয়। আর সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে কেহ সরকারী বা বে-সরকারী কোন কাজ পাইবার যোগ্য বলিয়া গণ্য হয় না। ইহার ফলে সরকার প্রবর্তিত শিক্ষা বাধ্য হইয়া সকলকে গ্রহণ করিতে হয়। তাহাতে স্বতন্ত্র লোকমত সৃষ্টি হইতে পারিতেছে না। শিক্ষা-স্বাতন্ত্র্য না থাকিলে বিচার-স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ হইতে পারে না আর শিক্ষার সর্বাঙ্গীন ও পূর্ণ বিকাশও হওয়া সম্ভব নহে। প্রচলিত পরীক্ষা উঠাইয়া দিয়া এবং উহার স্থলে কোথাও লোক নিয়োগ করিবার সময় শিক্ষার্থীর প্রয়োজনানুরূপ যোগ্যতা আছে কিনা তাহা যাচাই করিবার জন্য উপরোক্তরূপ বিশেষ পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হইলে শিক্ষা-স্বাতন্ত্র্য গড়িয়া উঠিবার পক্ষে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হইবে। নচেৎ শিক্ষার ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়।

মূল হস্তশিল্প নির্বাচনের নীতি

পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে মূল হস্তশিল্প এমন হওয়া চাই যাহার মাধ্যমে সর্বপ্রকার শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। সে রূপ হইতে হইলে উহা ব্যাপক ও বিবিধ অঙ্গযুক্ত হওয়া আবশ্যক। বিনোবাজী বলেন,

"দেশের বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় শতকরা ৮০টি বিদ্যালয়ে যে

বুনিয়াদী শিল্পের দ্বারা কাজ আরম্ভ করা যাইতে পারে তাহা আমার মতে একমাত্র সুতাকাটা হইতে পারে। ৭ বৎসরের ছেলের কথা ভাবিয়া আমি এই কথা বলিতেছি।”

এখন প্রশ্ন, কেবল সর্ববিধ শিক্ষাদানের সম্ভাবনায় পূর্ণ হইলেই কি যে কোনও শিল্পকে মূল শিল্পস্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে? অথবা উহার অতিরিক্ত কিছুর প্রয়োজন হয়? একবার বিনোবাজীর সম্মুখে এই প্রশ্ন উপস্থিত করা হইয়াছিল। প্রশ্ন উঠিয়াছিল যে মুর্গী-পালন (পোলট্রি) ও মৎস্য-উৎপাদন (ফিসারী) মূল উদ্যোগস্বরূপ লওয়া যাইতে পারে কিনা। কাকা সাহেব কালেলকর অহিংসার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল। তিনি নৈষ্ঠিক নিরামিষাশী। তাহা সত্ত্বেও তিনি মনে করেন যে মৎস্য-উৎপাদন মূল উদ্যোগস্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু বিনোবাজীর অভিমত এই যে মৎস্য-উৎপাদন মূল উদ্যোগস্বরূপে লওয়া উচিত হইবে না। তিনি বলেন যে, মৎস্য-উৎপান শিক্ষার মাধ্যম হইবার পক্ষে অন্য সব বিষয়ে যোগ্য সাব্যস্ত হইলেও মাছ ধরিবার জন্য যে হিংসাত্মক কৌশল অবলম্বন করা হয় তাহা শিখাইতে হইলে ছাত্রদিগকে মিথ্যাচার করিতে শিখাইতে হইবে। তাহা অহিংসা ও সত্য পালনের বিরোধী। সুতরাং এরূপ কাজকে শিক্ষার মাধ্যম করা যায় না। তিনি বলেন,—

“আমি যখন এই কাজের কথা চিন্তা করি তখন ইহার মাধ্যমে বালক-বালিকাদিগকে শিক্ষা দিতে আমি নিজেকে প্রস্তুত করিতে পারি না। কারণ যদি এই কাজের মাধ্যমে শিক্ষা দান করি তবে ছাত্রদিগকে এরূপ শিখাইতে হইবে—এইভাবে একটি বড়শি তৈয়ারি কর। উপরন্তু ইহাও বুঝাইতে হইবে—এইভাবে ঐ বড়শিতে মাংস লাগাও। বড়শিতে আমিষ এইজন্য লাগাইতে হইবে যে মাছ উহা খাইবার জন্য আকৃষ্ট হইয়া আসিবে। অর্থাৎ ইহা মাছকে ঠকাইবার ব্যাপার। মাছকে এরূপ বুঝাইতে হয় যে আমরা তাহাকে কিছু খাইতে দিতেছি। ঐ বেচারী উহা খাইবার জন্য বড়শি মুখের মধ্যে প্রবেশ করাইবে আর আমরা তৎক্ষণাৎ উহাকে টানিয়া উঠাইব। ইহাতে সর্বপ্রকারে অসত্য ও হিংসা আসিয়া যায়। সেজন্য ঐরূপ করা আমার পক্ষে খুবই কঠিন কাজ হইয়া পড়িবে। সুতরাং এইপ্রকারে ছেলেদিগকে শিক্ষা দেওয়া

আমার দ্বারা সম্ভব হইবে না। আমি কিভাবে ছেলেদিগকে বুঝাইব যে এইভাবে ফুসলানো ও ঠকানো মানবীয় সত্যের মধ্যে পড়ে অর্থাৎ তাহা হইলে মানবীয় সত্য ও অন্য সত্য—এইরূপ ভেদ সৃষ্টি করিতে হইবে। একবার না হয় হিংসাকে স্বীকার করিলাম, কিন্তু অসত্যকে স্বীকার করা আমার পক্ষে অসহ্য।"

নয়ী তালীমের পদ্ধতি হইতেছে সমবায়-পদ্ধতি। ইহা পরবর্তী প্রকরণে আলোচনা করা হইবে। সাধারণভাবে মনে করা হয় সমবায়ের অর্থ হইতেছে জ্ঞান ও কর্মের সম্মিলন। কিন্তু মৎস্য-চাষ সম্পর্কে উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে শুধু জ্ঞান ও কর্মের সম্মিলন বলিলে সমবায়-পদ্ধতির পূর্ণ ও সঠিক বর্ণনা করা হইল না। এজন্য বিনোবাজী বলেন,—

"আমাদের সমবায়ে সাধন ও সাধ্য উভয়ের শুদ্ধি থাকা চাই।"

সুতরাং কোন উদ্যোগের মাধ্যমে কেবলমাত্র শিক্ষাদানের পক্ষে সম্ভাবনা-পূর্ণ হইলেই তাহাকে মূল উদ্যোগরূপে নির্বাচন করা চলিবে না। মূল উদ্যোগ শুদ্ধ উদ্যোগ হওয়া চাই। সুতরাং উহা এমন হওয়া চাই যাহার মধ্যে হিংসা ও অসত্য আশ্রয় গ্রহণ করিতে না পারে।

এখানে ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে মুর্গী-পালনকে (পোলট্রি) মূল উদ্যোগ রূপে গ্রহণ করিতে বিনোবাজীর বিশেষ আপত্তি নাই।

নয়ী তালীমে সর্বোত্তম পদ্ধতি—সমবায়

বিনোবাজী তাঁহার 'মূল উদ্যোগ : কাতনা' (মূল হস্তশিল্প : সুতাকাটা) পুস্তিকার প্রস্তাবনায় প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতিসমূহের সহিত নয়ী তালীম পদ্ধতির (যাহাকে তিনি ওয়ার্ধা-পদ্ধতি বলেন) তুলনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে নয়ী তালীম পদ্ধতি অন্য সমস্ত শিক্ষা-পদ্ধতি হইতে ভিন্ন এবং শিক্ষা সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত যে সব গবেষণা ও প্রয়োগ হইয়াছে উহা তাহার অন্তিম পরিণতি। তিনি প্রচলিত চারি প্রকার শিক্ষা-প্রণালীর সহিত উহার তুলনা করিয়াছেন। তাহা হইতেছে : (১) 'কেবল' পদ্ধতি, (২) 'পরিশেষ' পদ্ধতি, (৪) 'সমুচ্চয়' পদ্ধতি, ও (৪) 'সংযোজন' পদ্ধতি।

(১) **কেবল পদ্ধতি** ঃ—আমাদের সাধারণ স্কুল-কলেজে যে শিক্ষা-প্রণালী চলিয়া আসিতেছে তাহাকে বিনোবাজী 'কেবল পদ্ধতি' নাম দিয়াছেন। কারণ তাহাতে কেবলমাত্র বুদ্ধিবিকাশের দিকেই দৃষ্টি দেওয়া হইয়া থাকে। মানুষের ব্যক্তিত্ব (পার্সনালিটি) বিকাশের পক্ষে প্রয়োজনীয় আর কোনদিকে দৃষ্টি দেওয়া হয় না। বাহ্ শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও আত্মা এইগুলি মানুষের ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন অঙ্গ। উহাদের মধ্যে কেবল একটি অঙ্গের (বুদ্ধির) দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয় বলিয়া উহাকে 'কেবল' পদ্ধতি বলা হইয়াছে। তিনি এই পদ্ধতি-সম্পর্কে বলেন,—

> "এই পদ্ধতির বহু দোষের কথা ছাড়িয়া দিলেও শিক্ষা-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে উহার একটি গুরুত্বপূর্ণ দোষ এই যে উহাতে কোনও বাহ্ আধার অবলম্বন না করিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়। তাহার ফলে ঐ জ্ঞান ঠাসিয়া ঠাসিয়া ভরতি করিতে হয়। ফলে উহা ঠিকমত স্মরণ থাকে না ও জীবনের সহিত উহা সমরস হইতে পারে না। ইহা ছাড়া, এই শিক্ষার দ্বারা বেকারত্বও বৃদ্ধি পায়।"

(২) **পরিশেষ পদ্ধতি** ঃ—'পরিশেষ'-এর অর্থ 'পরিশিষ্ট'—যেমন, পুস্তকের পরিশিষ্ট। বিনোবাজী উহাকে 'পরিশেষ' (পরিশিষ্ট) পদ্ধতি বলিয়াছেন। কারণ উহাতে কোন এক হস্তশিল্প শিক্ষা দেওয়া হয় বটে, কিন্তু তাহার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় না। উহাকে পুচ্ছস্বরূপ রাখা হয়। পুস্তকের মূল ভাগের সহিত তুলনায় পরিশিষ্টের যেটুকু মূল্য, এক্ষেত্রে হস্তশিল্পেরও ততটুকু মূল্য দেওয়া হয়। উহাকে নিতান্ত গৌণ বলিয়া গণ্য করা হয়। তিনি বলেন,—

> "ইহা ছাড়া এই পদ্ধতিতে হস্তশিল্পকে মনোরঞ্জনের ব্যাপার বলিয়া অথবা ক্রীড়া বা অলঙ্কারস্বরূপ গ্রহণ করা হয়। শিক্ষার শ্রান্তি দূর করিবার জন্য অথবা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে উহা চালানো হইয়া থাকে।"

(৩) **সমুচ্চয় পদ্ধতি** ঃ—'সমুচ্চয়ে'র অর্থ সমাহার, অর্থাৎ অনেক জিনিস একসঙ্গে স্তূপীকৃতকরণ। স্তূপে ঐ সব বিভিন্ন জিনিসের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিয়া যায়। উহাদের প্রকৃতির কোন পরিবর্তন সাধিত হয় না। সব মিলিয়া কোন একটিমাত্র জিনিস গড়িয়া উঠে না বা উহাতে পরস্পরের সাহায্যে পরস্পরের কোন রূপান্তর সাধিত হয় না। এই পদ্ধতিতে সাধারণ

শিক্ষা ও হস্তশিল্প-শিক্ষার জন্য সমান সময় দেওয়া হয় বটে, কিন্তু একটি শিক্ষার দ্বারা অন্যটির কোন সহায়তা হয় না। হস্তশিল্প-শিক্ষা এক পৃথক ব্যাপার হইয়া থাকে। আর পুস্তকের বিদ্যাশিক্ষাও এক পৃথক ব্যাপার হইয়া থাকে। এজন্য উহাতে ছাত্রের শিল্প-শিক্ষায় বিশেষ কোন আগ্রহ বা রুচি থাকে না। না শিখিলে চলিবে না এইজন্য বাধ্য হইয়া অথবা অসহায়ভাবে উহা শিখিতে হয়। কিংবা যদি ঐ হস্তশিল্প কোন শিক্ষার্থীর উপজীবিকা হইতে পারে এরূপ হয় তবে শিক্ষার্থী উহাকে উপজীবিকার উপায়স্বরূপ গণ্য করিয়া থাকে। সাহিত্যের অলঙ্কার-শাস্ত্রে 'সমুচ্চয়' এক অলঙ্কার। উহাতে আশ্চর্য, হর্ষ, বিষাদ প্রভৃতি বিভিন্ন ভাবকে একসঙ্গে জাগ্রত ও প্রকাশ করা হয়। এরূপ অর্থেও এই পদ্ধতিকে সমুচ্চয় বলা হইয়াছে। কারণ ইহাতে সাধারণ শিক্ষা ও শিল্পের মধ্যে কোন মিল থাকে না। উহার দৃষ্টান্তস্বরূপ বিনোবাজী বলিয়াছেন,—

> "যখন শকুন্তলা বইটি অথবা আফ্রিকার ভূগোল পড়ান হইতেছে তখন হয়তো হস্তশিল্পের জন্য প্রয়োজন হইবে কাষ্ঠশিল্পের বা কাষ্ঠের ভূগোলের তথ্যাদি।" এজন্য ইহাতে এই উভয়ের বিষয় পরস্পরের পূরক হইতে পারে না।

(৪) **সংযোজন পদ্ধতি** :—নয়ী তালীমে শিক্ষাদানের একটি প্রণালী হইতেছে 'কর্ম দ্বারা জ্ঞান।' সংযোজন-পদ্ধতিতে নয়ী তালীমের মাত্র ঐটুকু গ্রহণ করা হইয়াছে। অর্থাৎ হস্তশিল্পকে শিক্ষার এক মাধ্যম স্বরূপ গ্রহণ করা হইয়াছে। উহার অতিরিক্ত গুরুত্ব হস্তশিল্পকে দেওয়া হয় নাই। এইজন্য ইহাকে 'সংযোজন' পদ্ধতি বলা হয়। কারণ 'সংযোজন' শব্দের অর্থ হইতেছে সংযোগ সাধন বা যোগ করিয়া দেওয়া। ইহাতে কর্মের সহিত শিক্ষার যোগ সাধন করা হয় মাত্র।

এক্ষণে নয়ী তালীমে কি পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় তাহা বুঝিলে উহা যে সর্বোত্তম পদ্ধতি তাহা বুঝা যাইবে। বিনোবাজী নয়ী তালীম বা ওয়ার্ধা-পদ্ধতিকে **সমবায় পদ্ধতি** নাম দিয়াছেন। বিনোবাজী বলেন,—

> "সমবায় পদ্ধতিতে কোন এক জীবনব্যাপী ও বিবিধ অঙ্গবিশিষ্ট বুনিয়াদী শিল্পকে শিক্ষার মাধ্যম স্বরূপে গ্রহণ করা হইয়া থাকে। ঐ হস্তশিল্প শিক্ষার একটি উপায় মাত্র নহে। পরন্তু উহা শিক্ষার অবিভাজ্য অঙ্গ।"

বিনোবাজী ইহাকে কেন 'সমবায় পদ্ধতি' নাম দিয়াছেন তাহা বুঝিয়া দেখা যাউক। ন্যায়-শাস্ত্রে সমবায়ের এক সুন্দর উদাহরণ আছে। 'শিক্ষার স্বরূপ' প্রকরণে উহার উল্লেখ করা হইয়াছে। উহা এই—ঘড়া ও মৃত্তিকা এক বস্তু অথবা দুইটি পৃথক বস্তু? যদি বলা হয় উহারা দুই বস্তু তবে উত্তরে বলা যাইতে পারে যে ঘড়া ও মাটি পৃথক করিয়া ফেলা যায় না। সুতরাং উহারা দুই পৃথক বস্তু হইতে পারে না। আর যদি বলা হয় যে উহারা এক বস্তু তবে তাহাও ঠিক হইবে না। কারণ ঘড়াতে যে কাজ হয়, মাটি দ্বারা তাহা হওয়া সম্ভব নহে। মাটিতে জল ভরিয়া আনা যায় না, বা ঘড়ার অন্যান্য কাজ উহাতে চলিতে পারে না। উহা একও নহে আবার ভিন্নও নহে। আবার একও বটে এবং পৃথকও বটে। অর্থাৎ উহাদের একত্ব বা পৃথকত্ব কিছুই নিশ্চিতরূপে নির্ণয় করা যায় না। ইহাকে সমবায় বলে।

উহাদের মধ্যে এমন এক সম্পর্ক আছে যাহা সাধারণভাবে বোধগম্য ভাষায় প্রকাশ করা যায় না বলিয়া উহাকে 'অনির্বচনীয় সম্পর্ক' বলা হইয়া থাকে। নয়ী তালীমে হস্তশিল্প ও বিদ্যা বা জ্ঞানের সঙ্গে অনুরূপ সম্বন্ধ থাকে। হস্তশিল্পও শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। উহারা এক বলিয়া মনে হয়, অথচ উহারা এক নহে। ইহা আরও পরিষ্কার বুঝিয়া লওয়া চাই। নয়ী তালীমে জ্ঞান ও কর্মকে দুইটি পৃথক বস্তু বলিয়া গণ্য করা হয় না। উহারা একই জিনিসের দুই স্বরূপ। নয়ী তালীমে জ্ঞানলাভ ও হস্তশিল্পের কাজ একসঙ্গে এমন ভাবে চলিতে থাকে যে জ্ঞানশিক্ষা চলিতেছে না হস্তশিল্পের কাজ চলিতেছে তাহা ঠিক বলিতে পারা যায় না। যে কোন সময়ে মনে হইতে পারে যে জ্ঞানের প্রক্রিয়া চলিতেছে, কিন্তু কেহ যদি বলে যে না শিল্পের কাজ চলিতেছে তবে তাহাও অস্বীকার করা যাইবে না। উপরে সমবায়-পদ্ধতির যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে তাহাতে ঠিক এরূপই হয়। একও বটে, দুইও বটে। এইজন্য ইহাকে সমবায় বলা হয়। বিনোবাজী বলেন,—

"জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে পার্থক্য করা যায় না। জ্ঞানলাভের প্রক্রিয়া যখন চলিবে তখন সঙ্গে সঙ্গে কর্মেরও প্রক্রিয়া চলিবে। আর কর্মের প্রক্রিয়া যখন চলিবে তখন জ্ঞানেরও প্রক্রিয়া চলিবে। কর্ম ও জ্ঞান একে

অন্যের সহিত এরূপ ওতপ্রোত হইবে যে উহাদিগকে যুক্ত করা হইয়াছে এরূপ কিছু বুঝিবার অবকাশ থাকিবে না। বাহির হইতে জ্ঞান শিক্ষা করিবার কোন প্রশ্নই থাকিবে না। হস্তশিল্পের সাহায্যে জ্ঞানের উন্নতি করা যাইবে এবং জ্ঞানের সাহায্যে শিল্পেরও উন্নতি করা যাইবে। এই হইতেছে আমাদের পদ্ধতি। জ্ঞান ও কর্মকে সেলাই করিয়া জুড়িয়া যে পদ্ধতি রচনা করা যাইবে তাহা আমাদের পদ্ধতি হইবে না।"

নয়ী তালীমে কেবলমাত্র জ্ঞান ও কর্মের সমবায় হয় এমন নহে, উহার সমবায়ের ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত। উহাতে জ্ঞান, কর্ম ও আনন্দের সমবায় হয়। উহাতে যখন হস্তশিল্পের কাজ চলে তখন যেমন ঠিক বুঝা যায় না কাজ চলিতেছে বা জ্ঞানের প্রক্রিয়া চলিতেছে, সেরূপ ইহাও মনে হয় যে উহার দ্বারা হয়তো আনন্দ দানের প্রক্রিয়া চলিতেছে। এজন্য বিনোবাজী নয়ী তালীমের পদ্ধতিকে 'সচ্চিদানন্দ' আখ্যা দিয়াছেন। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাইবে।

বিষয় শিক্ষা দিবার কৌশল

নয়ী তালীমের উৎকর্ষ এই যে উহাতে যখন যে বিষয়ের পক্ষে উপযোগী প্রসঙ্গ আসিবে তখন সেই বিষয় শিক্ষা দিতে হয়। নতুবা বিনা প্রসঙ্গে শিক্ষা দিলে তাহা সাধারণ শিক্ষার ন্যায় বায় আধারহীন হইয়া যায়। তাহা কাল্পনিক জ্ঞানমাত্রে পর্যবসিত হইয়া থাকে। সুতরাং বিষয় শিক্ষা-দানের প্রসঙ্গ তুলিবার বা উপযোগী প্রসঙ্গ খুঁজিয়া বাহির করিবার অথবা ঐরূপ প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে তাহা বুঝিবার ও ধরিয়া ফেলিবার সামর্থ্য ও যোগ্যতা নয়ী তালীম শিক্ষকের প্রধান গুণ। কী প্রকারে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেওয়া যায় এবং কীরূপে উহার জন্য উপযোগী প্রসঙ্গ তুলিয়া শিক্ষণীয় বিষয়ের অবতারনা করা যায় তাহা বিনোবাজী নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তের দ্বারা পরিষ্কার ভাবে বুঝাইয়াছেন।—

বৃষ্টির দিনে ছেলেরা স্কুলে আসিলে প্রথমে তাহাদের জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক যে তাহারা সেদিন শৌচকার্য করিয়া, দাঁত মাজিয়া ও হাতমুখ

ধুইয়া আসিয়াছে কিনা। সেদিন এ বিষয়ে খোঁজ লইতে হইবে এইজন্য যে বৃষ্টির দিনে ভিজিবার ভয়ে অথবা জড়তা বশত ছেলেরা হাত-মুখ ধুইতে ও শৌচাদি করিতে যাইতে চাহে না। এই বিষয়ে শিক্ষকের সজাগ থাকা আবশ্যক। যে অঞ্চলে বৃষ্টি কম হয় এবং অধিক দিন রৌদ্র হয়, সেই অঞ্চলে যেদিন খুব বৃষ্টি হইতে থাকিবে সেইদিন ছেলেদের ছুটি দেওয়া উচিত। ছেলেরা বৃষ্টিতে দৌড়-ঝাঁপ করিয়া বেড়াইবে, আমোদ-প্রমোদ করিবে। শিক্ষকও তাহাদের সঙ্গে দৌড়-ঝাঁপ করিবেন ও খেলিবেন। তিনি ছেলেদিগকে বুঝাইয়া দিবেন যে বৃষ্টি ঈশ্বরের কৃপা। ঐ সময়ে ইংলণ্ডের আবহাওয়া সম্পর্কে জ্ঞান দেওয়ার প্রসঙ্গ আসিয়াছে ইহা যেন শিক্ষক বুঝিতে পারেন এবং তিনি যেন উহার সদ্ব্যবহার করেন। তিনি ঐ সময়ে তাহাদিগকে শিখাইবেন যে আমাদের এখানে বৃষ্টি হইলে ছুটি হয়, কিন্তু ইংলণ্ডে যেদিন রৌদ্র হয় সেইদিন ছেলেদের ছুটি দেওয়া হয়। ছেলেরা সেদিন রৌদ্রে ঘুরিয়া বেড়ায়; কারণ ইংলণ্ডে আকাশ অধিকাংশ দিন মেঘাচ্ছন্ন থাকে। এজন্য রৌদ্র হইলে সেদিন আনন্দ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইবার জন্য সেখানকার ছেলেদের ছুটি দেওয়া হয়। এইভাবে ইংলণ্ডের আবহাওয়া সম্পর্কে জ্ঞান দেওয়া হইবে।

জানালা-দরজা সম্পর্কে জ্ঞান কি ভাবে দেওয়া যায় এবং ঐ প্রসঙ্গে কি ভাবে ল্যাপল্যাণ্ডের অধিবাসীদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে কিছু জ্ঞান দেওয়া যায় তাহা তিনি এইভাবে বুঝাইয়াছেন :—

"যদি ছেলেদের জানালা-দরজা সম্পর্কে শিক্ষা দিতে হয় তবে আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিব, 'জানালার কি প্রয়োজন?' ছেলেরা উত্তর দিবে, 'উহার মধ্য দিয়া আলো ও বাতাস ভিতরে আসে।' তখন আমি জিজ্ঞাসা করিব, 'ঘরের চালে জানালা তৈয়ারি করিয়া দিলে তো আলো-বাতাস পাওয়া যাইতে পারে। তাহাতে কাজ চলিতে পারিবে তো?' তাহারা বলিবে, 'না, বাহিরের প্রকৃতিও দেখিতে পাওয়া চাই।' তখন আমি আবার জিজ্ঞাসা করিব, 'ধর, ঐরূপ জানালা তৈয়ারি করা হইল। কিন্তু উহার দ্বারা ভিতরে-বাহিরে আসা-যাওয়া চলিবে না। তাহা হইলে উহাতে কাজ চলিবে কি?' তাহারা বলিবে, 'না, ভিতরে বাহিরে যাওয়া-আসা করার ব্যবস্থাও থাকা চাই। ইহার জন্য দরজার

প্রয়োজন।' এই প্রকারে যখন তাহারা জানালা ও দরজার প্রয়োজন কি তাহা বুঝিতে পারিবে তখন আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিব, 'এখন বল তো, আমাদের শরীরের এরূপ জানালা দরজা কোন্ কোন্‌টি? চক্ষু, কর্ণ, মুখ, নাসিকা ইত্যাদিকে সংস্কৃতে 'দ্বার' বলা হয়। গীতাতে বলা হইয়াছে 'সর্বদ্বারাণি সংযম্য'—সকল দরজাকে সংযত করিয়া উহাদের উপর পাহারা রাখা প্রয়োজন। 'নব দ্বারে পুরে দেহী' —নয় দরজাওয়ালা নগরে এই আত্মা বাস করিয়া থাকে। মানুষের চক্ষু হইতে জানালা রাখিবার কল্পনা আসিয়া থাকিবে। কিন্তু মানুষের চক্ষু তো খুব ছোট, গরুর চক্ষু বড়। এজন্য লোক গরুর চক্ষু অনুকরণ করিয়া জানালা তৈয়ারি করিতে লাগিল। সংস্কৃতে জানালার নাম 'গবাক্ষ'। গবাক্ষের অর্থ গরুর চক্ষু। ঐরূপ জানালা আঁকিয়া দেখাও।' আমি তাহাদিগকে ঐসব কথা বলিব। ছেলেরা যদি ঐরূপ চক্ষু আঁকিয়া দেখায় তবে উহা চিত্রকলা হইয়া যাইবে। তৎপরে, আমি বুঝাইয়া দিব লোকে ঐ প্রকার জানালার কি কি পরিবর্তন করিয়াছে। তাহা হইবে ইতিহাস। আজকাল এইরূপ জানালা কি কোথাও দেখিতে পাওয়া যাইবে? ইহা বুঝাইবার জন্য আমি তাহাদিগের দৃষ্টি 'ল্যাপ-ল্যাণ্ডে'র দিকে লইয়া যাইব এবং ঐ প্রসঙ্গে সেই দেশের অধিবাসী-দের জীবন তথা তাহাদের সম্বন্ধে অন্য তথ্যাদির কথা বলিব। সার কথা এই যে এইভাবে প্রসঙ্গক্রমে দূর দূর দেশের লোকের জীবন সম্পর্কে তথ্যাদি শিক্ষা দিতে হইবে।"

এক ঘণ্টার পাঠশালা

১৯৫১ সালের নির্বাচনের পরবর্তী সময়ে কিছুকালের জন্য যখন শ্রীযুক্ত রাজাগোপালআচারী মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তখন তিনি মাদ্রাজ রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে এক ঘণ্টার পাঠশালা চালাইবার পরিকল্পনা করেন এবং তাহা চালাইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তজ্জন্য তাঁহাকে ভীষণ বাধা ও বিরোধী আন্দোলনের সম্মুখীন হইতে হয়। অবশেষে ঐ পরিকল্পনা পরিত্যাগ করিতে

হয়। গ্রামের লক্ষ লক্ষ দরিদ্র কৃষক ও শ্রমজীবী পরিবারের বালক-বালিকারা যাহাতে অবিলম্বে শিক্ষার সুযোগ পায় এবং যাহাতে তাহাদের সত্যিকারের কল্যাণ করা যায় সেইজন্যই রাজাজী ঐ পরিকল্পনা করিয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

প্রতি গ্রামে সাধারণ পাঠশালা খোলা হইলেও গরীবদের পক্ষে তাহাদের ছেলেমেয়েদের সারাদিন পাঠশালায় রাখা সম্ভব হয় না। কারণ গরীব ঘরের ছেলেমেয়েদের তাহাদের পিতা-মাতার কাজে সাহায্য করিতে হয়। তাহা না করিলে চলে না। এরূপ অবস্থায় এক ঘণ্টার পাঠশালার ব্যবস্থা হইলে গরীব ঘরের ছেলেমেয়েদের বিদ্যার্জনের সুযোগ হইত। কিন্তু ভুল ধারণার সৃষ্টি হওয়ায় এই কল্যাণকর পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করা সম্ভব হয় নাই। মাদ্রাজের ব্রাহ্মণগণ অধিকাংশই শিক্ষিত। তাঁহারা প্রধানত সহর অঞ্চলে বাস করেন। গ্রামাঞ্চলের অধিবাসী প্রধানত অ-ব্রাহ্মণ। মাদ্রাজে ব্রাহ্মণ অ-ব্রাহ্মণের ঝগড়া রহিয়াছে। এক ঘণ্টা পাঠশালার পারিকল্পনা হওয়ায় গ্রামের লোকের এই ধারণা হইল যে এই পরিকল্পনা দ্বারা সহরবাসীদের জন্য উন্নত শিক্ষা-ব্যবস্থা অক্ষুন্ন রাখিয়া গ্রামবাসী অ-ব্রাহ্মণদিগকে চিরদিন অশিক্ষিত করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

তাঁহাদের এই ভুল ধারণা হইয়াছিল যে এক ঘণ্টার পাঠশালায় কোন কাজ হইবে না। উহা প্রহসন মাত্র হইয়া থাকিবে। এই ধারণা যে ভুল তাহা এক ঘণ্টার পাঠশালার উপকারিতা কি সেই সম্বন্ধে বিচার করিলে বুঝা যাইবে। বিনোবাজী প্রায় ঐ সময়ে (১৯৫৪-৫৫ সাল) এক ঘণ্টার পাঠশালার কথা বলিতে আরম্ভ করেন। তিনি তাঁহার বিভিন্ন ভাষণে ও প্রশ্নোত্তরমূলক আলোচনায় এক ঘণ্টার পাঠশালা সম্পর্কে তাঁহার বিচার কি তাহা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাহাতে বুঝা গিয়াছে যে এক ঘণ্টার পাঠশালা সম্পর্কে যে সব আশঙ্কা করা হয় তাহা অমূলক। এক ঘণ্টার পাঠাশালা নয়ী তালীমের পক্ষে এক মহান কল্যাণকর কল্পনা। এ সম্পর্কে বিনোবাজীর বিচার সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে :—

(১) ছেলেমেয়েরা সারাদিন তাহাদের পিতা-মাতার কাজে সাহায্য করিতে পারিবে। মাত্র এক ঘণ্টার জন্য তাহাদের পাঠশালায় থাকিবার আবশ্যক হইবে। শিক্ষকও প্রায় সারাদিন তাঁহার নিজের কাজ করিবার

জন্য মুক্ত থাকিবেন। শিক্ষক কোন বেতন পাইবেন না। বৎসরের শেষে প্রত্যেক কৃষকের নিকট হইতে তিনি তিন-চারি সের করিয়া খাদ্য শস্যাদি পাইবেন।

(২) প্রশ্ন হইল, এক ঘণ্টার শিক্ষায় কি ছেলেমেয়েরা পর্যাপ্ত শিক্ষা পাইবে? বিনোবাজী বলেন, এক ঘণ্টায় নিশ্চয়ই পর্যাপ্ত শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হইবে। এক ঘণ্টার ক্লাসের কথা যাহা বলা হয় তাহা মাত্র বৌদ্ধিক শিক্ষার জন্য। ছেলেমেয়েরা পিতা-মাতার কাজে সাহায্য করিবার সময় অথবা বাহিরে শিক্ষকের সাহচর্যে মূল শিল্প অভ্যাস করিতে পারিবে। শিক্ষক ঐ গ্রামেই তাহার জীবিকার জন্য কাজ করিবেন এবং অন্যান্য সময় গ্রামবাসীদের সহিত তাঁহার সজীব সম্পর্ক রাখিবেন। উহাতে ছেলেমেয়েরা কিছু কিছু শিখিতে পারিবে। একথা ছাড়িয়া দিলেও এক ঘণ্টা ভালভাবে শিক্ষাদান করা কম ব্যাপার নহে। এই বিদ্যালয়ে ছুটির কোন প্রশ্ন নাই। সাধারণ বিদ্যালয় প্রত্যহ ৫ ঘণ্টা চলে, কিন্তু বৎসরে ৬ মাস ছুটি থাকে। তাহাতে দৈনিক ২॥ ঘণ্টা দাঁড়ায়। তাহার উপর মাঝে মাঝে ছুটির জন্য অধীত বিষয় অনেক ভুলিয়া যাইতে হয়। উপরন্তু নয়ী তালীমের শিক্ষক সাধারণ পাঠশালার শিক্ষক অপেক্ষা অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন। এই সব বিবেচনা করিলে এক ঘণ্টা কম সময় নহে। আমাদের সারাদিনে তিনবার খাইতে ১॥ ঘণ্টার বেশী সময় লাগে না। কিন্তু তিনবারের খাদ্য হজম করিতে বাকি ২২॥ ঘণ্টা লাগে। শিক্ষা সম্বন্ধেও সেইরূপ। বিনোবাজী বলেন,—

"যদি এক ঘণ্টা কাল খুব ভালভাবে পড়ানো যায় তবে এই এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে ছেলেদিগকে এতটা জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে যাহা পরিপাক করিবার জন্য অর্থাৎ যাহার মনন ও অভ্যাস করিবার জন্য তাহাদের অনেক সময় লাগিবে। আমাদের এই কথা বুঝা উচিত যে শিক্ষার উদ্দেশ্য যে কেবলমাত্র জ্ঞান-শিক্ষা (সাধারণত যেরূপ মনে করা হয়) তাহা নহে। ছাত্রদের মধ্যে জ্ঞানলাভের শক্তি সৃষ্টি করাই হইতেছে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। তাহা হইয়া গেলে অর্থাৎ জ্ঞান-পিপাসা জাগ্রত হইলে অবশিষ্ট কাজ সহজ হয় এবং ছাত্র নিজেই তাহা করিয়া লইতে পারে। অতএব এক ঘণ্টা সময় এই কাজের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া মনে করা উচিত।"

নয়ী তালীম ও মূল্য পরিবর্তন

নয়ী তালীম কেবল এক নূতন শিক্ষা-বিচার নহে; পরন্তু উহা এক জীবন-বিচার। নয়ী তালীমের দ্বারা সমাজে নূতন মূল্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে ও তাহার দ্বারা নূতন সমাজ গড়িয়া তুলিতে হইবে। আজ যাহা সমাজের কাছে বহু মূল্যবান, কাল তাহার আর বিশেষ কোন মূল্য থাকিবে না। আবার আজ যাহা সমাজের কাছে তুচ্ছ, কাল তাহা মূল্যবান বলিয়া পরিগণিত হইবে। উদাহরণ স্বরূপ আজ শরীর-শ্রমের কাজকে সমাজে তুচ্ছ বলিয়া মনে করা হয়। নূতন মূল্য প্রতিষ্ঠার ফলে শরীর-শ্রমের কাজ সমাজে সর্বাধিক মর্যাদা লাভ করিবে। ইহার নাম ক্রান্তি (বিপ্লব)। ক্রান্তির প্রকৃত কাজ হইতেছে—সমাজে মূল্যের পরিবর্তন সাধন করা। নয়ী তালীম কী ভাবে এই মূল্য পরিবর্তন সাধনে সাহায্য করিতে পারে? নূতন মূল্য প্রতিষ্ঠার দৃষ্টি সম্মুখে রাখিয়া তদনুকূলে পরিবেশের সৃষ্টি ও ক্ষেত্রের প্রস্তুতি, আয়োজন ও ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং তদনুযায়ী শিক্ষাদানের প্রক্রিয়া চালাইতে হইবে। এজন্য শিক্ষকের মধ্যে নূতন বিচারবোধ জাগ্রত থাকা চাই ও তাঁহার জীবনও তদনুসারে গঠিত হওয়া চাই। ঐ শিক্ষক শিক্ষাদানের মাধ্যমে ঐ নবজীবনের বিচার তাঁহার ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনে ও বুদ্ধিতে ফুটাইয়া তুলিবেন। তবেই নয়ী তালীমের সার্থকতা সম্পাদিত হইবে।

নূতন মূল্যের স্বরূপ

নূতন মূল্য প্রতিষ্ঠার স্বরূপ কি হইবে তাহা জানা আবশ্যক। কারণ তাহার দ্বারা নয়ী তালীমের দিগ্‌দর্শন পাওয়া যাইবে। সমাজের গঠনের মূলে যে ভুল বিচার রহিয়াছে তাহার জন্য যাহাকে সম্মান দেওয়া প্রয়োজন তাহার অসম্মান করা হইতেছে। বিচার-ক্রান্তি হইলে এই বিপরীত ভাবনা দূরীভূত হইবে।

প্রয়োজন অনুসারে পারিশ্রমিক

সমাজের বর্তমান অবস্থায় যাহার যোগ্যতা বেশী তাহার বেতন বেশী আর যাহার যোগ্যতা কম তাহার কম বেতন হওয়া উচিত বলিয়া মনে করা

হয়। কিন্তু আমাদের বুঝা উচিত যে যোগ্যতা অনুসারে বেতন বা পারিশ্রমিকের তারতম্য করা ভুল বিচার। কর্মীর প্রয়োজনের সঙ্গে বেতনের সাক্ষাৎ সম্পর্ক থাকা চাই। যাহার যোগ্যতা কম তাহার যদি ক্ষুধা কম হইত এবং বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদির প্রয়োজন কম হইত তবে তাহাকে কম বেতন দেওয়া অন্যায় হইত না। যাহাকে ত্রিশ টাকা দেওয়া হয় তাহার যদি এক পোয়া চাউল অথবা এক পোয়া পরিমাণ আটার চাপাটির ক্ষুধা হয়, আর যাহাকে দুই হাজার টাকা দেওয়া হয় তাহার যদি আধমণ চাউলের ভাত বা আধমণ আটার রুটির ক্ষুধা হইত তবে ঐ বৈষম্যে কাহারও আপত্তি থাকিত না। কিন্তু তাহা তো নহে। কোন পিতা তাহার সন্তানকে এ কথা বলেন না—'তুমি ছোট, এজন্য তোমাকে কম দুধ দিব। যে ছেলে বড় তাহাকে বেশী দুধ দিব। আর যে ছেলেটি রুগ্ন এবং তাহার বুদ্ধিও কম তাহাকে আরও কম দুধ দিব।' পিতা-মাতা কনিষ্ঠ সন্তানকে সর্বাপেক্ষা বেশী দুধ পান করিতে দেন। উপরন্তু যে অসুস্থ তাহাকে বেশী খাইতে দিতে তাঁহারা প্রস্তুত থাকেন।

সমাজ পিতা-মাতার মত হওয়া চাই এজন্য যোগ্যতা নিরপেক্ষভাবে যাহার যেমন প্রয়োজন তাহার সেরূপ পাওয়া উচিত। কিন্তু কাজ না করিলে কোন সমর্থ ব্যক্তির খাইবার অধিকার থাকিবে না—এই বিচার সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত ও কার্যকরী হওয়া আবশ্যক। সততা সহকারে ও যোগ্যতা অনুসারে কাজ করিলে সমাজের সামর্থ্য অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষ তাহার প্রয়োজন মত সবই পাইবার অধিকারী। তবে পরিবারের মধ্যে যাহারা সমর্থ তাহারা সকলেই তাহাদের যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুসারে কাজ করিবে। পরিবারের একজন কাজ করিবে, উপার্জন করিবে ও অন্যেরা বসিয়া খাইবে এই রীতি দূর করিতে হইবে।

বুদ্ধি ও শ্রমের কাজে পার্থক্য অনুচিত

আজ বুদ্ধির কাজকে অধিক যোগ্যতার কাজ বলিয়া গণ্য করা হয় এবং শরীর-শ্রমের কাজকে কম যোগ্যতার কাজ বলিয়া মনে করা হয়। এজন্য একজন ব্যারিষ্টার এক ঘণ্টা কাজ করিয়া যদি ৫০০ টাকা পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন, অথবা একজন ডাক্তার আধ ঘণ্টা কাজের জন্য যদি

৫০ টাকা গ্রহণ করেন, অথবা একজন অধ্যাপক মাসে ২০ দিন দৈনিক ২ ঘণ্টা অধ্যাপনা করিয়া যদি মাসে ৫০০ টাকা বেতন পান তবে তাহাকে অনুচিত মনে করা হয় না। বরং তাহাতে তাঁহাদের মর্যাদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়! অন্যদিকে একজন কৃষিমজুর রৌদ্র-বৃষ্টিতে মাঠে ১০ ঘণ্টা কঠোর পরিশ্রম করিয়া যদি দৈনিক ২ টাকা পারিশ্রমিক দাবি করেন তবে তাঁহার দাবিকে অনুচিত বলিয়া মনে করা হয়।

উপরন্তু যিনি বুদ্ধির কাজ করেন তিনি শরীর-শ্রমের কাজ করেন না। অন্যদিকে যিনি শরীর-শ্রমের কাজ করেন তাঁহাকে বুদ্ধির কাজ শিক্ষা করার পক্ষে অনুপযোগী বলিয়া মনে করা হয়।

এইভাবে সামাজকে হাত ও মাথায় (হ্যাণ্ড্স্ এ্যাণ্ড হেড্স্-এ) ভাগ করা হইয়াছে। বৌদ্ধিক শ্রমের কাজের মধ্যেও কমবেশী যোগ্যতার বিচার চালু আছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষককে যদি ৫০ টাকা বেতন দেওয়া হয় তবে কলেজের অধ্যাপককে মাসিক ৫০০ টাকা দেওয়া হইবে। কারণ এরূপ ধরিয়া লওয়া হয় যে কলেজের অধ্যাপকের দায়িত্ব বেশী। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তো পাঠশালার শিক্ষকেরই দায়িত্ব সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তাঁহাকে ছোট ছেলেমেয়েদের জীবন গড়িয়া তুলিতে হয়, উপরন্তু তাঁহাদিগের পড়াশুনাও করাইতে হয়।

পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে এরূপ বৈষম্যমূলক বিচার ও আচারের উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশে যে চতুঃবর্ণ ছিল তাহাতে এরূপ অন্যায় বিচার ছিল না। উহার এই বিচার ছিল যে চামার হউক, মেথর হউক অথবা ব্রাহ্মণ হউক যিনি সততার সহিত এবং সেবা বুদ্ধিতে তাঁহার কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করিবেন তিনিই মোক্ষলাভ করিবেন। বিনোবাজী এ সম্পর্কে বলেন,—

> "ব্রাহ্মণগণ সর্বাপেক্ষা বিদ্বান ছিলেন এবং তাঁহারা সর্বাপেক্ষা ত্যাগী হইতেন। ব্রাহ্মণ বলিতেন—'জীবন ধারণের জন্য আমাকে সামান্য কিছু দিলেই চলিবে। কারণ জ্ঞানের দ্বারা আমাদের যে আনন্দলাভ হয় বেচারী বৈশ্যদের তাহা হয় না। এজন্য আমাকে খুব কম দাও।' ইহার অর্থ এই যে যত অধিক বিদ্বান তত অধিক ত্যাগী। কিন্তু আজ ইহার বিপরীত অবস্থা চলিতেছে। আজ বিদ্বান বলেন, 'আমি এম. এ.।

আমেরিকা হইতে আমি ডিগ্রী পাইয়াছি। এজন্য আমাকে বেশী বেতন দিতে হইবে।' ইহা বুঝিয়া উঠা আমার বুদ্ধিতে কুলায় না। সমাজ তাঁহার শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছে এবং সমাজ হইতে তাঁহার শিক্ষার জন্য অনেক খরচ করা হইয়াছে। এজন্য তাঁহার বরং এই বলা উচিত—'আপনারা আমার শিক্ষার জন্য অনেক খরচ করিয়াছেন, অন্য লোকের শিক্ষার জন্য তাহা করেন নাই। আপনাদের নিকট হইতে আমি অনেক কিছু পাইয়াছি, সে কারণে এখন আমাকে কম করিয়া দিন। অন্য ব্যক্তি রহিয়াছেন, যাঁহার ঘরে অনেকগুলি ছেলে-মেয়ে, সংসারের খরচ বেশী এবং তাঁহার শিক্ষার জন্য সমাজ হইতে বেশী খরচও করা হয় নাই। এজন্য তাঁহাকে অধিক বেতন দিন।' এরূপ বলিলে কিছুটা শোভনীয় হইত।

কিন্তু তিনি বলেন, 'আমার শিক্ষার জন্য অনেক খরচ করা হইয়াছে। অতএব আমাকে আরও বেশী বেতন দিন।' ইহা একটু চিন্তা করিয়া দেখিবার বিষয়। 'সমাজ আমার জন্য অনেক খরচ করিয়াছে এজন্য আমার জন্য আরও অধিক খরচ করিতে থাকুন'—এ কিরূপ যুক্তি? বরং এরূপ হওয়া চাই যে পূর্বে বেশী খরচ করা হইয়াছে, এখন কম খরচ করা হউক। ব্রাহ্মণ এরূপ করিতেন এবং কৌপীন পরিধান করিতেন। এজন্য সেই সময়ে তিনি শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। কিন্তু আজ এরূপ চলিতেছে যে যাঁহাকে অধিক সম্মান করিতে চাহিবেন তাঁহাকে অধিক অর্থ দিতে হইবে। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর পদ সমান। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী অপেক্ষা রাষ্ট্রপতি অধিক বেতন পাইয়া থাকেন। অধিক বেতন কেন দেওয়া হইবে? অতীতে এক মূল্যবোধ গড়িয়া উঠিয়াছিল। আমাদিগকে উহা নষ্ট করিতে হইবে। এইজন্য নয়ী তালীমের প্রবর্তন করা হইয়াছে।"

যোগ্যতার তারতম্যে আর্থিক মূল্যের তারতম্য অনুচিত

যোগ্যতার তারতম্য অনুসারে কেন যে উহার আর্থিক মূল্যের তারতম্য হওয়া উচিত নহে তাহা আরও একটু পরিষ্কারভাবে বুঝিয়া লওয়া উচিত। কোন ছোট ছেলে ক্ষেতে কাজ করিলে অল্প কাজ হইবে। পূর্ণবয়স্ক লোক

কাজ করিলে বেশী কাজ হইবে। আবার বৃদ্ধ কাজ করিলে কম কাজ হইবে। এরূপ বয়স কমবেশী অনুসারে কাজের পরিমাণ কমবেশী হইতে পারে কিন্তু উহার মূল্য কমবেশী হওয়া উচিত নহে। যাহা সেবা-পরায়ণতার সহিত ও সততার সহিত সম্পাদিত হয় তাহার মূল্য একই। উহার মূল্যের ইতরবিশেষ হইতে পারে না। বিনোবাজী কয়েকটি উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়াছেন :—

ধরুন, একজন লোক একটি ছোট শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহা ভক্তি সহকারে পূজা করিয়া থাকে। অন্য এক ব্যক্তি একটি বড় শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিল। ইহাতে কি ছোট শিবলিঙ্গের মূল্য কম এবং বড় শিবলিঙ্গের মূল্য বেশী হইবে ? কোন ব্যক্তির দুইটি ফটো লওয়া হইয়াছে। একটি ছোট ও একটি বড়। ছোট ফটোর মধ্যে সেইব্যক্তি নাই এবং বড় ফটোতে তিনি আছেন এরূপ তো নহে। ছোট ফটোর মধ্যে তিনি যতটুকু আছেন বড় ফটোর মধ্যেও তিনি ততটুকু আছেন। গীতা বড় অক্ষরে ছাপানো হইয়াছে, ছোট অক্ষরেও ছাপানো হইয়াছে। বড় অক্ষরে মুদ্রিত গীতার প্রয়োজনীয়তা বেশী এবং ছোট অক্ষরে মুদ্রিত গীতার প্রয়োজনীয়তা কম এরূপ নহে। উভয়েরই যোগ্যতা সমান।

যে সব কাজের দ্বারা সমাজের সেবা বা উপকার হয় তাহাদের মধ্যে ছোট বড় ভেদ নাই। যে ব্যক্তি কাজ করিয়াছে সে সেই কাজে কতদূর হৃদয় ঢালিয়া দিয়াছে ও কতদূর সেবাবুদ্ধি-যুক্ত হইয়া কাজ করিয়াছে তাহা বিবেচনা করিয়া তাহার যোগ্যতা নির্ণীত হওয়া উচিত। কিন্তু তাহার জন্য তাহাকে কত পারিশ্রমিক দিতে হইবে তাহা তাহার প্রয়োজন অনুসারে নির্ণয় করিতে হইবে। যিনি নিষ্কাম সেবাবুদ্ধি লইয়া কাজ করেন তাঁহার নিকট কাজ ছোট-বড় থাকে না। ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হইতেছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সারথী হইয়া ঘোড়াকে দানা-জল খাওয়াইয়া সেবা করিতেন, আবার যখন অর্জুনের ধর্মসংকট উপস্থিত হইয়াছিল তখন তাঁহাকে গীতার উপদেশও দিয়াছিলেন। এ সম্পর্কে বিনোবাজী বলেন,—

"অর্জুন ভগবানকে বলিয়াছিলেন, 'আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে। যদি তুমি আমার সারথী হও তবে ভাল হয়।' ইহাতে ভগবান

অর্জুনকে একথা বলেন নাই, 'তোমার অপেক্ষা আমার যোগ্যতা বেশী। আমি কেমন করিয়া তোমার ঘোড়ার সেবা করিব?' তিনি অর্জুনের ঘোড়ার সেবা করিয়াছিলেন। ভগবান বলিলেন,—আমি তোমার কাজ করিতে পারি। কোন্ কাজ ছোট, কোন্ কাজ বড় তাহা আমি দেখিব না।' কিন্তু পরে কি হইল? যখন অর্জুন দেখিলেন যে যাঁহাদের সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধ করিতে হইবে তাঁহারা সকলেই তাঁহার আত্মীয় স্বজন, তখন তিনি মোহগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। ভগবান চিন্তা করিলেন—ইহাকে আর কে উপদেশ দিবে। সামরিক কলেজের অধ্যাপক আসিয়া কি তাঁহাকে উপদেশ দিবেন? তাই অর্জুনকে উপদেশ দেওয়ার কাজও তিনিই করিলেন। তিনি গীতার উপদেশ দিলেন। তিনি ঘোড়ার সেবাও করিয়াছিলেন। সেই ভগবান কংসের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন আবার গোবরও পরিষ্কার করিয়াছিলেন।"

নয়ী তালীমের শিক্ষক ও ছাত্রগণ যেভাবে জীবনযাপন করিবেন তাহার দ্বারা নয়ী তালীমের প্রকৃত পরীক্ষা হইবে। এজন্য বিনোবাজী বলেন যে যেখানে নয়ী তালীম চলিবে সেখানকার শিক্ষকগণের বেতন একত্রিত করিয়া তাহা তাঁহাদের পরিবারের জনসংখ্যা অনুসারে সমানভাবে বণ্টন করিয়া দেওয়া উচিত। সর্বত্রই এই নীতি প্রযোজ্য হওয়া উচিত।

সাম্যের স্বরূপ

সমাজে যে সাম্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে তাহা কিরূপ সাম্য হইবে সে সম্বন্ধে বুঝিয়া লওয়া প্রয়োজন। সকলে প্রায় সমান-সমান হওয়া চাই। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে গণিতের ন্যায় সমানতা আশা করা যায় না। কারণ কিছু পার্থক্য থাকিবেই। এজন্য আমাদের লক্ষ্য আঙ্গুলের মত হওয়া। পাঁচটি আঙ্গুল একেবারে সমান নহে। আবার তাহারা খুব ছোট-বড়ও নহে। উহাদের মধ্যে সামান্য কিছু পার্থক্য আছে। যে আঙ্গুলগুলি একটু বড় আছে তাহা কাটিয়া যদি একেবারে সমান করা যায় তবে তাহাদের দ্বারা কোন কাজই হইবে না। সেই আঙ্গুলের দ্বারা এক ঘটি জলও উঠানো যাইবে না। প্রত্যেক আঙ্গুলের নিজের বৈশিষ্ট্য আছে, প্রত্যেকের নিজের

বিশেষ গুণ আছে। কিন্তু তাহারা এরূপ হয় না যে একটি আঙ্গুল দুই ইঞ্চি ও আর একটি দুই ফুট। বিনোবাজী বলেন,—

"এই যে সব আঙ্গুল ভগবান দিয়াছেন তাহা হইতে এই শিক্ষা লওয়া উচিত যে সমাজে প্রায়-সমানতা হওয়া চাই।"

মর্যাদা ভোগ্যবস্তুর, পয়সার নহে

আজ সমাজে ভোগ্যবস্তু অপেক্ষা পয়সাকে অধিক মর্যাদা দেওয়া হইয়া থাকে। পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর ইহা আর এক অনিষ্টকর পরিণাম। উৎপাদন মুখ্যত নিজেদের ব্যবহারের জন্য হওয়া উচিত, বিক্রীর জন্য নহে। কিন্তু আজ সমাজে এক অস্বাভাবিক অবস্থা চলিতেছে। উৎপাদন মুখ্যত বিক্রয়ের জন্য করা হইয়া থাকে, ব্যবহারের জন্য নহে। এজন্য প্রয়োজনীয় অধিকাংশ জিনিসই খরিদ করিতে হয়। ইহার ফলে পরসাকে অধিক মর্যাদা ও মূল্য দেওয়া হয়। লোকে পয়সাকেই সম্পত্তি বলিয়া ভ্রম করে। প্রকৃত সম্পত্তি হইতেছে চাউল, গম, মাখন, দুধ, ঘি ইত্যাদি মানুষেয় ভোগ্য দ্রব্যাদি। কিন্তু মানুষ পয়সার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। কেহ গ্রামে যাইয়া পাঁচ টাকার নোট দেখাইলেই গ্রামের লোক তাহার জীবনধারণের অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ছাড়িয়া দেয়। এইভাবে পয়সার মূল্য আমরাই বৃদ্ধি করিয়াছি। বিনোবাজী বলেন,—

"যদি ঐ নোট জ্বালানো হয় তবে তাহাতে সামান্য একটু জলও গরম করা যাইবে না। নাসিকে একটি ছাপাখানা আছে এবং সেখানে কেবল নোট ছাপা হইতেছে। লোকে বলে যে ধনীর হাতে সম্পত্তি আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ধনীদের হাতে সম্পত্তি নাই, মায়া আছে। আমরা সেই মায়ার মধ্যে পড়িয়াছি। যদি আমরা গরীবদের উঠাইতে চাই তবে ঐ মায়াকে দূর করিতে হইবে।"

সমাজে উপর্যুক্তরূপ মূল্য পরিবর্তন সাধন করিবার জন্য ভূদানযজ্ঞ পরিচালিত হইতেছে। এজন্য বলা হয় যে ভূদানযজ্ঞকে নয়ী তালীমের অন্যতম কার্যসূচী স্বরূপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

নয়ী তালীম ও নবসমাজ রচনা

নয়ী তালীমে কর্ম ও জ্ঞানের সমবায় সাধিত হয়, উহাতে স্বাবলম্বনের শিক্ষাও হয়। কিন্তু এই দুইটি মাত্র হইলে যথেষ্ট হইল না। উহার সহিত 'সাম্যযোগ' যুক্ত হওয়া চাই। তবে উহাকে নয়ী তালীম বলা যাইবে। একথা পূর্বে বলা হইয়াছে। এই সাম্য কেবলমাত্র আর্থিক সাম্য নহে। যত প্রকারের ভেদ বা বিষমতা সমাজে রহিয়াছে নয়ী তালীমের দ্বারা তৎসমস্তই দূর করিতে হইবে। সমাজে ঐক্যভাবনা না আসিলে নয়ী তালীম গড়িয়া উঠিতে পারে না। সমাজে বৈষম্য থাকিলে শিক্ষার কোন এক বিশিষ্ট অঙ্গ চলিতে পারে। যেমন ব্যাকরণ শিক্ষা দিবার জন্য যদি কোন বিদ্যালয় থাকে তবে সমাজে বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও সেই বিদ্যালয় সফলভাবে চলিতে পারে। কিন্তু যেখানে লোকশিক্ষার প্রশ্ন সেখানে সমাজের সর্বপ্রকারের বৈষম্য দূর করা নয়ী তালীমের প্রথম কাজ হইবে। নয়ী তালীম কোন শিক্ষা-পদ্ধতির সংশোধিত রূপ নহে। কোন কিছুর সংস্কার সাধনের দ্বারা উহার উদ্ভব হয় নাই। উহা এক পরিপূর্ণ জীবন বিচার। উহা নূতন সমাজ অর্থাৎ অহিংস সমাজ গড়িয়া তুলিতে চাহে। এজন্য (১) হস্ত বা পল্লীশিল্প, (২) ভূমির সমবণ্টন (মালিকানা বিসর্জন), (৩) জাতিভেদ, পন্থভেদ প্রভৃতির নিরাকরণ ও (৪) প্রত্যক্ষ জীবনের মাধ্যমে শিক্ষাদান—এই চতুর্বিধ কার্যক্রম ইহাতে বিহিত হইয়াছে। বিনোবাজী ঐ চতুর্বিধ কার্যক্রম সম্পর্কে বলেন,—

> "ঐ চতুর্বিধ কার্যক্রম হইতেছে এক সম্মিলিত কার্যক্রম। কল্পনার জন্য বা বুঝাইবার জন্য ঐ চারি বিভাগকে পৃথক করা যায়। কিন্তু প্রত্যহ কার্যে উহাদিগকে পৃথক করা যাইতে পারে না।"

নয়ী তালীম অহিংস সমাজ গড়িয়া তুলিবে। অহিংস সমাজে শোষণ থাকিবে না। উহাতে লোকে স্ব-স্ব বিবেক-বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইবে। সুতরাং শাসনের প্রয়োজন থাকিবে না। নয়ী তালীমের কাজ এমনভাবে চলা চাই যাহাতে শাসনমুক্ত সমাজ গড়িয়া উঠিবার দিকে অগ্রগতি লাভ হইতে থাকে।

নয়ী তালীমের কাজ হইবে দেশের সম্মুখে নূতন সমাজের নমুনা উপস্থাপিত করা। কেমন করিয়া উহা করা যাইতে পারে? কিভাবে উহা হইতে পারে তাহা বিনোবাজী বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাহা এই:

"নয়ী তালীমের যে বিত্থালয় চলিবে তাহাতে ভূদান-সম্পত্তিদান প্রভৃতির বিচার, সর্বোদয় বিচার, সাম্যযোগের বিচার এবং অন্য সমস্ত আর্থিক ও সামাজিক বিচারের চিন্তন, মনন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হওয়া প্রয়োজন। ছেলেদের ও শিক্ষকগণের ঐ যে ছোটখাটো সমাজ হইবে তাহাকেও গ্রাম-সমাজের মত করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। বিত্থালয়ের ঐ সমাজ আমাদের ভাবী গ্রাম-সমাজের নমুনা স্বরূপ হইবে। পাঁচ-সাতজন ভাল শিক্ষক, তাঁহাদের পরিবারের আরও দশ-বিশ জন লোক এবং দুই-একশ' ছাত্র—এই হইতেছে স্কুল-সমাজ। তাঁহাদের কাজ করিবার জন্য জমি দেওয়া হইয়াছে, সরঞ্জাম প্রভৃতি সবই দেওয়া হইয়াছে। এখন তাঁহাদের উপর দায়িত্ব দিয়া বলা হইবে- 'তোমরা শিক্ষার কাজ চালাও এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের জীবন নির্বাহের কাজও চালাইয়া লও। কিন্তু যদি তাহারা বলে—আমাদের জীবিকা নির্বাহ করিতে হইবে, আমরা শিক্ষাদানের কাজ করিতে পারিব না, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে তাহারা নয়ী তালীমের 'অ-আ' পর্যন্তও জানে না।"

কিন্তু এখন প্রশ্ন, ঐ ভাবে উৎপাদক শরীর-শ্রম করিয়া স্বাবলম্বী ও সমৃদ্ধিক জীবনের নমুনা প্রদর্শন করার যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক আজ পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে কি? যদি পাওয়া না যায় তবে উপরে যে চিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে তাহা কেবল কল্পনাতেই পর্যবসিত থাকিবে। বিনোবাজী এই সমস্যা সম্পর্কে সজাগ থাকিয়াই ঐ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। এখন পর্যন্ত নয়ী তালীমে যাঁহারা শিক্ষকতা করেন তাঁহারা সাধারণত মধ্যম শ্রেণী হইতে আসিয়াছেন। তাঁহারা আদর্শ দৃষ্টিসম্পন্ন হইলেও শরীরের দিক হইতে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তাঁহাদের নিজেদের পক্ষে অতটা শরীর-শ্রম করা হয় তো সম্ভব নহে। এজন্য যেসব শ্রেণীর লোক শরীর-শ্রমে অভ্যস্ত সেইসব শ্রেণীর মধ্য হইতে শিক্ষক তৈয়ারি করিয়া লইতে হইবে। যেসব শ্রমজীবী শ্রেণীর ছাত্র নয়ী তালীমের বিত্থালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করিতেছে, তাহাদের মধ্য

হইতে শিক্ষক সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা করিতে হইবে। তবেই তাহাদের দ্বারা নূতন সমাজের নমুনা প্রদর্শন করানো সম্ভব হইবে। তাই বিনোবাজী বলিয়াছেন,—

"এজন্য শেষ পর্যন্ত আমাদিগকে শরীর-শ্রমে অভ্যস্ত লোকদের মধ্য হইতে শিক্ষক সৃষ্টি করিতে হইবে। তাঁহাদের বিদ্যা ও সংস্কারের দীপ্তি বৃদ্ধি করিতে হইবে। যখন তাঁহাদের মধ্য হইতে আমরা শিক্ষক সৃষ্টি করিতে পারিব, তখনই উহা আদর্শ শিক্ষক-পরিকল্পনা হইবে। ততদিন পর্যন্ত পুরাতন শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াও নূতন শিক্ষা-ব্যবস্থা পছন্দ করিতেছেন এমন শিক্ষকগণ নয়ী তালীমে যে শিক্ষা দিবেন তাহা নয়ী তালীমের অপরিপক্ক রূপ হইয়া থাকিবে। এজন্য যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, নয়ী তালীমের আদর্শ কোথাও সৃষ্টি করিয়াছেন কি?—তখন আমি এই জবাব দেই যে নয়ী তালীমের আদর্শ প্রদর্শন করিবার যোগ্যতা আমাদের নাই। ঈশ্বরের কৃপায় আমাদের এইটুকু যোগ্যতা হইয়াছে যে আমরা নয়ী তালীমের আদর্শের কল্পনা করিতে পারিতেছি; কিন্তু উহা কার্যে পরিণত করিবার মত যোগ্যতা আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় নাই। আমাদের যে সব ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে তাহাদের যোগ্যতা আমাদের অপেক্ষা বেশী হইবে।"

শিক্ষার স্বরূপ—নিবৃত্ত শিক্ষা

রুশো ছিলেন ফরাসী দেশের সুপ্রসিদ্ধ, প্রভাবশালী ও প্রতিভাবান গ্রন্থকার। রুশো ও ভল্‌টেয়ারকে ফরাসী বিপ্লবের জনক বলা যায়। কারণ, তাঁহাদের লেখার মাধ্যমে যে তেজস্বী, সজীব ও ক্রান্তিকারী বিচার প্রচারিত হইয়াছিল তাহার প্রত্যক্ষ পরিণাম স্বরূপ ফরাসী বিপ্লব সংঘটিত হয়। রুশোর 'সোশ্যাল কণ্ট্রাক্ট' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে অতীব ভাবপ্রবণ ও জ্বালাময়ী ভাষায় আধুনিক গণতন্ত্রের নীতি প্রচার করা হয় ও ফ্রান্সের জনগণকে তাহাদের সার্বভৌম ক্ষমতা গ্রহণ করিবার জন্য উত্তেজনামূলক ভাষায় উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়। অনেকে মনে করেন যে ফরাসী বিপ্লব সংঘটনের পশ্চাতে ঐ গ্রন্থের প্রভাব সর্বাপেক্ষা অধিক ক্রিয়া করিয়াছিল।

উপরন্তু রুশো ছিলেন সেই যুগের (অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ) সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী শিক্ষা-বিজ্ঞানী। তাঁহাকে শিক্ষা-সম্পর্কীয় আধুনিক চিন্তাধারার জনক বলিয়া গণ্য করা হয়। তাঁহার শিক্ষা-বিষয়ক সাহিত্যের প্রভাব শিক্ষার ক্ষেত্রে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল। রুশোর 'এমিল' নামক শিক্ষা-বিষয়ক এক বিখ্যাত গ্রন্থ আছে। এক সভায় ঐ গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে বিনোবাজী শিক্ষার প্রকৃত স্বরূপ কি তাহা ব্যাখ্যা করেন। ইহা ১৯২৩ সাল এবং নয়ী তালীম কল্পনার উদ্ভবের ১৪ বৎসর পূর্বেকার কথা। বিনোবাজী জীবনব্যাপী অধ্যাপনার কাজ করিয়া আসিয়াছেন সত্য, কিন্তু এত পূর্বেও শিক্ষাসম্বন্ধে তাঁহার বিচার কত গভীর ও ক্রান্তিকারী ছিল তাহা ভাবিলে আশ্চর্যবোধ হয়।

রুশো শিক্ষাকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—(১) প্রাকৃতিক শিক্ষা, (২) ব্যক্তিক শিক্ষা এবং (৩) ব্যবহারিক শিক্ষা।

(১) **প্রাকৃতিক শিক্ষা** ঃ—মানুষের অন্তর্নিহিত শারীরিক, মানসিক ও বৌদ্ধিক শক্তির বিকাশসাধন প্রাকৃতিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিপূর্ণ ও সুব্যবস্থিত বৃদ্ধিসাধন, ইন্দ্রিয় সমূহকে সতেজ ও কার্যকুশল করিয়া তোলা, মানসিক বৃত্তি সকলের সর্বাঙ্গীন উন্নতিসাধন এবং স্মৃতি, মেধা, প্রজ্ঞা, ধৃতি, তর্ক প্রভৃতি বৌদ্ধিক শক্তিকে তেজস্বী ও প্রখর করিয়া তোলা প্রাকৃতিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত।

(২) **ব্যক্তিক শিক্ষা** ঃ—মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ সাধন করিয়া অর্থাৎ স্বভাব শিক্ষণ হইতে লব্ধ আত্মবিকাশকে কিভাবে বাহ্য জগতে প্রয়োগ করা যায় সে সম্পর্কে অন্য লোকের নিকট হইতে বাচনিক, সাম্প্রদায়িক বা বিদ্যালয়ের মাধ্যমে যে শিক্ষা লাভ করা যায় তাহাকে 'ব্যক্তিক শিক্ষা' বলা হইয়াছে। ইহা 'প্রাকৃতিক-শিক্ষা' হইতে লব্ধ জ্ঞানকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার শিক্ষা। লোকের নিকট হইতে মৌখিকভাবে বা সামাজিক যোগাযোগ বা ব্যবহারের মাধ্যমে অথবা বিদ্যালয়ে এই শিক্ষা লাভ হইয়া থাকে।

(৩) **ব্যবহারিক শিক্ষা** ঃ—বাহ্যিক পরিস্থিতি ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা হইতে মানুষ যে জ্ঞান প্রাপ্ত হয় রুশো তাহাকে 'ব্যবহার-শিক্ষণ' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

বিনোবাজী বলেন যে শিক্ষাকে যে এরূপ তিনভাগে বিভক্ত করিতেই হইবে এমন কোন বাঁধাধরা নিয়ম হইতে পারে না। কারণ কোন্ বিষয়ের কত বিভাগ করিতে হইবে তাহা উহা দেখিবার বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের উপর নির্ভর করে। রুশো যে দৃষ্টিতে শিক্ষাকে দেখিয়াছেন তাহাতে তিনি উহাকে উক্ত তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। কিন্তু অন্য এক দৃষ্টিমতে শিক্ষাকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। তাহা এই: রুশোর বিচারে শিক্ষার যে তিন ভাগ তন্মধ্যে ব্যবহারিক শিক্ষা ও ব্যক্তিক শিক্ষা বাহির হইতে আসে। আর স্বভাব-শিক্ষা বা প্রাকৃতিক শিক্ষা ভিতর হইতে আসে। সুতরাং শিক্ষাকে **'অন্তঃ শিক্ষণ'** ও **'বহিঃ শিক্ষণ'** এইরূপ দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। কিন্তু যদি আরও গভীরভাবে বিচার করা যায় তবে বুঝা যায় যে শিক্ষাদানের মাধ্যম বাহিরের হইলেও যাহা আমাদের ভিতরে নাই তাহা বাহির হইতে লাভ করা সম্ভব নহে। এখানে যাহা বাহ্য তাহা নিমিত্তমাত্র। সুতরাং যাহাকে বাহ্য শিক্ষণ বলা হয় তাহা অন্য লোকের নিকট হইতে অথবা বিদ্যালয় হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিলে সঠিক বলা হয় না। উহাও অন্তঃশিক্ষণের মধ্যে গণ্য হওয়া উচিত। বিনোবাজী বলেন,—

"প্রকৃতপক্ষে মানুষ এই অনন্ত বিশ্বের প্রত্যেক পদার্থ হইতে এই শিক্ষাই নিরন্তর প্রাপ্ত হইতেছে। উহাতে কখনও কোন বাধা আসে না। সেক্সপীয়রের ভাষায় বলিতে গেলে ঝরণার মধ্যে প্রসাদগুণ সম্পন্ন গ্রন্থ সংগৃহীত আছে, প্রস্তরের মধ্যে দর্শন প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। আর যাহা কিছু পদার্থ আছে সব কিছুর মধ্যে শিক্ষার সার তত্ত্ব পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। বৃক্ষ, বনস্পতি, পুষ্প, নদী, পর্বত, আকাশ, তারকা সবই আপন-আপন ভাবে মনুষ্যকে শিক্ষাদান করিতেছে।.........কিন্তু এই গ্রন্থ-গঙ্গা যতই গভীর হউক না কেন মনুষ্যকে নিজের ঘটিতে উহা হইতে জল উঠাইতে হইবে। এজন্য আমাদের মধ্যে যে প্রকার ও যেটুকু বীজ নিহিত আছে এই বিশ্ব হইতে আমরা কার্যত সেইপ্রকার ও ততটুকু শিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হইব। ইহাই সকলের অনুভূতি। আমরা সকলে বহু বিষয় শিখি, বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করি, বহু বিচার শুনিয়া থাকি এবং বহু পদার্থ দেখিয়া থাকি। কিন্তু উহার কতটুকুই বা আমাদের মনে স্থায়ী হয়?

"সার কথা এই যে, আমরা এই বাহ্য বিশ্ব হইতে যাহা কিছু শিক্ষালাভ করিয়া থাকি তৎসমস্তই আমরা ভুলিয়া যাই এবং সেইস্থলে উহার সংস্কার মাত্রই আমাদের মধ্যে থাকিয়া যায়। সংক্ষেপে শিক্ষার অর্থ হইতেছে প্রাপ্ত জ্ঞান নষ্ট হইয়া যাইবার পর যে সংস্কার অবশিষ্ট থাকে তাহা। এরূপ হইবার কারণ যাহা উপরে বলা হইয়াছে তাহা এই যে, যাহা আমাদের ভিতরে নাই তাহা বাহির হইতে লাভ করা অসম্ভব।"

শিক্ষা বা জ্ঞানের স্বরূপ সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ ঐ একই কথা বলেন। তিনি কর্মতত্ত্বের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে প্রকৃত বিদ্যা বা জ্ঞানের ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন যে জ্ঞান মানুষের অন্তর্নিহিত, উহা বাহির হইতে আসে না। তিনি তাঁহার 'কর্মযোগে' বলিয়াছেন ঃ

"এই জ্ঞান আবার মানুষের অন্তর্নিহিত। কোন জ্ঞানই বাহির হইতে আসে না, সবই ভিতরে। আমরা যে বলি, মানুষ জানে, মনোবিজ্ঞানের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হইবে 'আবিষ্কার করে' (ডিস্কভার)। মানুষ যাহা শিক্ষা করে, প্রকৃতপক্ষে সে উহা আবিষ্কার করে। 'ডিসকভার' শব্দের অর্থ অনন্ত জ্ঞানের খনি স্বরূপ নিজ আত্মা হইতে আবরণ সরাইয়া লওয়া। আমরা বলি, নিউটন মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। উহা (মাধ্যাকর্ষণ) কি এক কোনে বসিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল? না, উহা তাঁহার নিজ মনে অবস্থিত ছিল। সময় আসিল, অমনি তিনি উহা দেখিতে পাইলেন। জগৎ যত প্রকারে জ্ঞানলাভ করিয়াছে এ সমুদয়ই মন হইতে। জগতের অনন্ত পুস্তকাগার তোমার মনে। বহির্জগৎ কেবল তোমার নিজ মনকে অধ্যয়ন করিবার উত্তেজক কারণ উপযোগী অবস্থাস্বরূপ। কিন্তু সকল সময়ই তোমার নিজ মনই তোমার অধ্যয়নের বিষয়। আপেলের পতন নিউটনের পক্ষে উত্তেজক কারণ স্বরূপ হইল। তখন তিনি নিজ মন অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার মনের ভিতরকার পূর্ব হইতে অবস্থিত ভাবপরম্পরারূপ শৃঙ্খলগুলি পুনরায় আর একভাবে সাজাইতে লাগিলেন এবং উহাদের ভিতর আর একটি শৃঙ্খল আবিষ্কার করিলেন। উহাকেই আমরা মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম বলি। উহা আপেল বা পৃথিবীর কেন্দ্রে অবস্থিত কোন পদার্থে ছিল না। অতএব ব্যবহারিক বা পরমার্থিক সমুদয় জ্ঞানই মানুষের মনে। অনেক স্থলেই উহারা আবিষ্কৃত (অনাবৃত)

থাকে না, বরং আবৃত থাকে। যখন এই আবরণ অল্প অল্প করিয়া সরাইয়া লওয়া হয় তখন আমরা বলি 'আমরা শিক্ষা করিতেছি।' আর এই আবিষ্করণ প্রক্রিয়া যতই চলিতে থাকে ততই জ্ঞানের উন্নতি হইতে থাকে। যে পুরুষের এই আবরণ ক্রমশই উঠিয়া যাইতেছে তিনি অপেক্ষাকৃত জ্ঞানী ; যে ব্যক্তির আবরণ খুব বেশী সে অজ্ঞান আর যে মানুষ হইতে উহা সম্পূর্ণ চলিয়া গিয়াছে তিনি সর্বজ্ঞ পুরুষ। প্রাচীনকালে অনেক সর্বজ্ঞ পুরুষ ছিলেন। আমার বিশ্বাস, একালেও অনেক আছেন। আর আগামী যুগসমূহেও অসংখ্য সর্বজ্ঞ পুরুষ জন্মাইবেন। যেমন একখণ্ড চকমকিতে অগ্নি অন্তর্নিহিত থাকে, তদ্রূপ জ্ঞান মনের মধ্যেই রহিয়াছে। উদ্দীপক কারণ ঘর্ষণ স্বরূপ এই জ্ঞানকে প্রকাশ করিয়া দেয়।"

এজন্য বিনোবাজী বলেন যে বাহ্য শিক্ষার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। উহা কোন তাত্ত্বিক পদার্থ নহে। উহা অভাবাত্মক ক্রিয়ামাত্র। কিন্তু এরূপ বলিলেও সঠিক বলা হইল না। তথাপি উহাতে কিছু ফাঁক থাকিয়া যায়। কারণ বাহ্য শিক্ষা একেবারে যে অভাবাত্মক অর্থাৎ মিথ্যা তাহা নহে। কারণ যাহাকে বাহ্য শিক্ষণ বলা হইয়াছে তাহার জন্য কিছু বাহিরের নিমিত্ত, অবলম্বন বা আধার চাই। বাহ্য অবলম্বন ব্যতীত কেবল-মাত্র ভিতরে ভিতরে শিক্ষাসংস্কার জন্মিতে পারে না। এজন্য বাহ্য শিক্ষা আছে বা উহা ভাবাত্মক ইহা যেমন বলা চলে না, সেরূপ উহা একেবারে নাই অর্থাৎ উহা একান্ত অভাবাত্মক ইহাও বলা চলে না। এজন্য বিনোবাজী বলেন যে, এরূপে ইহা এক 'ডাইলেমা' (পরস্পর বিপরীত দুই বিষয়ের উপস্থিতি) হইয়া দাঁড়ায়। এই অবস্থায় শিক্ষার এই বাহ্যিক আধারের সহিত অন্তরের শিক্ষার কি সম্বন্ধ তাহা বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। নচেৎ শিক্ষার প্রকৃত স্বরূপ কি তাহা ভালভাবে উপলব্ধি করা যাইবে না।

এরূপ 'ডাইলেমা' (বিপ্রতিপত্তি) অথবা 'বাদ' নূতন কোন বস্তু নহে। অন্যান্য শাস্ত্রেও এরূপ বাদের কথা আছে। বেদান্ত ও ন্যায়শাস্ত্রে এরূপ বাদের কথা তৎতৎ শাস্ত্রজ্ঞ ছাড়া অনেকেরই জানা আছে। যথা—বেদান্তে সুখের সহিত বাহ্য পদার্থের কি সম্বন্ধ? এবং ন্যায়-শাস্ত্রে মৃত্তিকার সহিত মৃত্তিকা নির্মিত ঘটের কি সম্পর্ক? এই দুইটি প্রশ্ন সম্বন্ধে যে বাদের উদ্ভব হইয়া থাকে তাহা অনেকের জানা আছে। তাহা

হইতেছে এই : সুখ সম্বন্ধে যদি বলা যায় বাহ্য পদার্থে সুখ বিদ্যমান আছে তবে ঠিক বলা হয় না। কারণ যে বাহ্য পদার্থ অন্য সময়ে সুখদায়ক হয়, মনের অবস্থা বিকৃত থাকিলে তাহাতে সুখ পাওয়া যায় না। অন্যদিকে যদি বলা যায় যে বাহ্য পদার্থে সুখ নাই, সুখ এক মানসিক ভাবনা মাত্র, তবে তাহা বলাও সঠিক হইবে না। ন্যায়শাস্ত্রে মৃত্তিকা নির্মিত ঘটের ব্যাপারও ঐরূপ। মৃত্তিকা ও ঘট সম্বন্ধে অনুরূপ বাদ উঠিয়া থাকে। যদি বলা হয় মাটি ও ঘট একই জিনিস, তবে উহার প্রতিবাদে বলা যাইবে যে তাহা হইলে শুধু মাটিতে জল ভরা হউক। পক্ষান্তরে যদি বলা হয় মাটি ও ঘট পৃথক বস্তু, তবে তাহার প্রতিবাদে বলা যাইতে পারে যে তাহা হইলে মাটি ও ঘটকে পৃথক করিয়া রাখা হউক এবং যাহার মাটি তাহাকে তাহা দেওয়া হউক। আর ঘটের মালিককে ঘট দেওয়া হউক এবং ঐ ঘটে জল ভরা হউক। তাহা কি সম্ভব ?

এই অবস্থায় যদি খোলাখুলিভাবে বলিতে হয় তবে বলা উচিত যে ইহাদের মধ্যে সম্বন্ধ যে কি তাহা বলিতে পারা যায় না। কিন্তু তাহা বলিলে অজ্ঞতা প্রকাশ পায় এজন্য শাস্ত্রকারেরা ভব্য ভাষায় ঐ দুই-এর সম্পর্কের নাম দিয়াছেন 'অনির্বচনীয় সম্পর্ক'। শিক্ষাশাস্ত্রের উপর্যুক্ত বাদ সম্পর্কেও 'অনির্বচনীয় সম্পর্ক' বলা যাইতে পারে। উহাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে এরূপ বলা হইলেও ভাবাত্মকতা সম্বন্ধীয় সূক্ষ্ম বিচারে তারতম্যের (তুলনার) দৃষ্টিতে মাটিকে তাত্ত্বিক বা ভাবাত্মক এবং ঘটকে অভাবাত্মক (অস্তিত্বহীন) বা মিথ্যা বলা হইয়াছে। সেইরূপ তারতম্যের দৃষ্টিতে অন্তঃশিক্ষাকে ভাবাত্মক ও বাহ্য শিক্ষাকে অভাবাত্মক বলা হইয়াছে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে তারতম্য বিচারে বাহ্য শিক্ষণকে মিথ্যা বলা হইয়াছে। কিন্তু কার্যত উহা একেবারে অভাবাত্মক (অস্তিত্বশূন্য) বা মিথ্যা নহে। নচেৎ শিক্ষা বিষয়ে বাহিরে কিছুই করিবার থাকে না। শিক্ষার জন্য কোন পাঠ্যক্রমও তৈয়ারি করিবার প্রশ্ন থাকে না। শিক্ষা সম্পর্কীয় সমস্ত আন্দোলন মূর্খতার প্রকাশমাত্র হইয়া দাঁড়ায়। তারতম্য অর্থাৎ তুলনার দৃষ্টিতে উহাকে অভাবাত্মক বা মিথ্যা বলা হইয়াছে বটে কিন্তু উহার অর্থ এই নহে যে উহা কোন কার্য নহে। প্রকৃতপক্ষে উহা কার্য তো বটেই। বিনোবাজী বলেন,—

"কিন্তু আমি যে ইহাকে অভাবাত্মক বলিয়াছি তাহার অর্থ এই যে উহা হইতেছে অভাবাত্মক কার্য।"

কিরূপে ইহা অভাবাত্মক কার্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে। শিক্ষা কোন স্বতন্ত্র তত্ত্ব সৃষ্টি করে না। শিক্ষার লক্ষ্য যাহা তাহা ভিতরেই রহিয়াছে। কিন্তু অনেক কারণে উহা আপনা আপনি প্রকাশ পাইতে পারে না। শিক্ষার প্রকৃত কাজ সেই সব প্রতিবন্ধাত্মক কারণ দূর করা। ভিতরে যাহা রহিয়াছে তাহার প্রকাশ ও বিকাশের প্রতিবন্ধকতা নিবারণ করে বলিয়া ইহার উপযোগিতা স্বীকার করিতেই হইবে। এজন্য উহার ভাব বা অস্তিত্ব যে নাই তাহা নহে। উহার অস্তিত্ব অল্প কিছু আছে।

এতদূর বিশ্লেষণ করিয়া এই বিষয় বুঝিবার কি প্রয়োজন আছে? আজ ইহা বুঝিবার প্রয়োজন এইজন্য যে আমাদের যে শিক্ষা-পদ্ধতি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা অত্যন্ত অস্বাভাবিক এবং যাহা হওয়া উচিত তাহার বিপরীত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শিক্ষার এই তত্ত্ব ভালভাবে উপলব্ধি করা হয় নাই বলিয়া যে শিক্ষার অস্বাভাবিক পদ্ধতি গড়িয়া উঠার পথ হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং ইহা উপলব্ধি করিলে বর্তমানের অস্বাভাবিক পদ্ধতি সংশোধনের পক্ষে প্রেরণাদায়ক হইবে এবং কি ভাবে উহার সংশোধন করা দরকার তাহাও বুঝা যাইবে। বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি যে কিরূপ অস্বাভাবিক তাহা বিবৃত করিয়া বিনোবাজী বলেন,—

> "ছেলেদের স্মরণশক্তি তীব্র দেখিলেই উহাদিগকে খুব বেশী করিয়া কণ্ঠস্থ করিবার জন্য উৎসাহ দেওয়া হইয়া থাকে। পিতার এইরূপ মনে হয় যে ছেলেদের মস্তিষ্কের মধ্যে যতটা বেশী প্রবেশ করাইতে পারা যায় ততটা প্রবেশ করানো হউক। বিদ্যালয়ের শিক্ষা-পদ্ধতিতেও এই রীতি অবলম্বন করা হয়। কিন্তু পক্ষান্তরে যদি ছাত্রের বুদ্ধি কম হয় তবে নিশ্চয়ই তাহাকে ইচ্ছাপূর্বক উপেক্ষা করা হইয়া থাকে। বুদ্ধিমান বলা হয় এরূপ ছাত্র কলেজে পৌঁছানোর সময় পর্যন্ত কোন রকমে ঠিকমত চলিয়া থাকে। কিন্তু পরে তাহারা প্রায়ই পিছাইয়া যাইতে থাকে। যদি কলেজে পিছাইয়া না পড়ে তবে পরে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রায়ই অকেজো বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। ইহারা প্রায়ই

অকেজো বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। ইহার একমাত্র কারণ এই যে তাহার কোমল বুদ্ধির উপর অতিরিক্ত বোঝা চাপানো হইয়া থাকে। ঘোড়াটি বেশ চটপটে। ঠিকমত চলিতেছে। সুতরাং উহাকে খোঁচা মারিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু তা না করিয়া ঘোড়া তো বেশ চটপটে, অতএব লাগাও চাবুক। তাহাতে কি হইবে বুঝুন। তাহাতে ঘোড়া ভড়কাইয়া খাদে গিয়া লাফাইয়া পড়িবে এবং মালিককেও খাদে নিক্ষিপ্ত করিবে। এই মূর্খতাপূর্ণ জঙ্গলী পদ্ধতি অন্তত জাতীয় বিদ্যালয়সমূহে বন্ধ হওয়া উচিত।"

উপরের আলোচনায় বুঝিতে পারা যায় যে যাহা ভিতরে নাই তাহা শিক্ষায় বাহির হইতে লাভ করা সম্ভব নহে। যাহা ভিতরে সুপ্ত থাকে তাহাকে জাগ্রত করাই হইতেছে শিক্ষার একমাত্র কার্য। শিক্ষা স্বতন্ত্র কিছু সৃষ্টি করিতে পারে না। এখন প্রশ্ন হইতেছে—ভিতরে কী সুপ্ত থাকে ? এবং তাহার আধারই বা কি ? একই তত্ত্ব কি সকলের মধ্যে সুপ্তাবস্থায় থাকে ? তবে সকলকে সমানভাবে শিক্ষিত করিয়া গড়িয়া তোলা সম্ভব হয় না কেন ?

প্রত্যেক মানুষের আত্মা আছে। আত্মা এক। একই আত্মা সকলের মধ্যে। আত্মা অনন্ত গুণ ও শক্তিতে ভরা। আত্মা অনন্ত বিকাশশীল। মানুষের বিকাশের অর্থ আত্মার সুপ্ত গুণাবলীকে জাগ্রত ও বিকশিত করা। শিক্ষাতত্ত্বের মূলে এই মৌলিক কল্পনা রহিয়াছে। ইহাই শিক্ষার প্রধান আধার। শিক্ষার উদ্দেশ্য হইতেছে আত্মার অনন্ত গুণাবলীর বিকাশসাধন করা ও উহার অনন্ত শক্তিকে জাগ্রত করা। এজন্য বিনোবাজী বলেন,—

"সব শাস্ত্র, সব কলা, সব সদগুণ বীজ স্বরূপ মানুষের মধ্যে স্বয়ং-সিদ্ধ হইয়া থাকে। উহা দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই না বলিয়াই যে উহা বীজ নহে এমন কথা নহে।"

বিনোবাজীর গীতা-প্রবচনে গীতার অষ্টম অধ্যায়ের আলোচনা হইতে আমরা শিখিয়াছি যে মানুষের জীবন বহু সংস্কারে ভরা। জীবনের অর্থ সংস্কার-সঞ্চয়। সংস্কার দুই রকমের—ভাল ও মন্দ। শিক্ষার লক্ষ্য জীবনে ভাল সংস্কার গড়িবার পক্ষে অনুকূল ক্ষেত্র প্রস্তুত করা এবং ভাল সংস্কার সঞ্চয় করাইয়া দেওয়া।

সারা জীবন আমরা আহার, বিহার, কাজ-কর্ম, আচার-ব্যবহার ইত্যাদির মাধ্যমে ভাল ও মন্দ উভয়বিধ সংস্কার সঞ্চয় করিতেছি। এই দৃষ্টিতে আমরা সারা জীবনই শিক্ষা লাভ করিয়া থাকি। যদি ভাল সংস্কার সঞ্চয়কে শিক্ষা বলা হয় তবে মন্দ সংস্কার সঞ্চয়কে কুশিক্ষা বলা যাইতে পারে কি? না, তাহা নহে। উহা শিক্ষাই নহে। উহা শিক্ষার বিপরীত। শিক্ষা ও জীবনযাত্রার দ্বারা জীবনে নানারূপ সংস্কার সঞ্চয় করিয়া যখন আমরা ইহলোক ত্যাগ করিয়া যাই তখন আত্মার কিছু কিছু শক্তি ও গুণ জাগ্রত ও বিকশিত, কিছু বিকাশোন্মুখ, কিছু বিকাশের অনুকূল এবং অবশিষ্ট অবিকশিত অবস্থায় আত্মায় নিহিত থাকিয়া যায়। পরবর্তী জন্মের শিক্ষায় পূর্বজন্মের বিকশিত গুণাবলী অতি সহজে জাগ্রত ও বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া উঠে। বিকাশোন্মুখ গুণাবলী ও জাগরণোন্মুখ শক্তিসমূহ অল্প আয়াসে বিকশিত ও জাগ্রত হয়। উপরন্তু যে সব গুণের বিকাশ বা শক্তির জাগরণের জন্য চেষ্টা করা হইয়াছে, সে গুলির বিকাশ ও জাগরণের জন্য প্রভূত প্রযত্ন করিলে হয়তো উহারা জাগ্রত ও বিকশিত হইতে পারিবে। শিক্ষার মৌলিক তত্ত্ব-বিচারে এই সব কল্পনা করা হইয়া থাকে।

এই অবস্থায় শিক্ষার জন্য একরূপ প্রচেষ্টা ও যত্ন করিলেও বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্নরূপ ফলোদয় হইতে পারে। সুতরাং সকলের মধ্যে একই আত্মা বিদ্যমান এবং সকলের আত্মার সমান বিকাশ সাধিত হইতে পারে বটে কিন্তু একই জীবনে সকলের সমান বিকাশ না হইতে পারে। সুযোগের ও প্রযত্নের বিভিন্নতা এবং পূর্বজন্মের অর্জিত সংস্কারের ভেদবশত এরূপ হইয়া থাকে। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই সব কল্পনা 'পশচুলেট্' অর্থাৎ 'গৃহীত তত্ত্ব' স্বরূপ মানিয়া লইতে হয়।

কেহ কেহ এরূপ মনে করেন যে মনুষ্য স্বভাবত দুর্বল ও নীতিবিহীন। শিক্ষার দ্বারা তাহাকে শক্তিমান ও নীতিমান করিয়া গড়িয়া তোলা হয়। অর্থাৎ মূলত মানুষ যেন পশুর মত এবং শিক্ষার দ্বারা তাহাকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তোলা হয়। সকলের মধ্যে একই আত্মার অস্তিত্ব এবং মানুষের আত্মার সমান বিকাশশীলতা মানিয়া লইলে ঐরূপ কল্পনা যে ভ্রান্ত তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। মানুষের মধ্যে পূর্ণতা তত্ত্ববীজরূপে স্বতঃসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। সত্যাগ্রহের ক্ষেত্রেও মানুষের আত্মার অস্তিত্ব, একত্ব ও পূর্ণত্বে

বিশ্বাসই সত্যাগ্রহের একমাত্র আধার। নচেৎ অহিংসার কোন স্থান থাকে না। আত্মার অস্তিত্ব মানিয়া লইলে তবে মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তন করিতে পারা যাইবে এই বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার উদ্ভব হওয়া সম্ভব। এরূপ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা না থাকিলে অহিংসা তথা সত্যাগ্রহের কোন স্থান থাকে না।

শিক্ষা-পদ্ধতি ও সহজ শিক্ষা

পূর্ব অধ্যায়ে শিক্ষার স্বরূপ কি সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি কিরূপ অস্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাও পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। এক্ষণে শিক্ষা কিরূপে দেওয়া উচিত ও পাওয়া উচিত সে সম্বন্ধে আলোচনা করা আবশ্যক।

শিক্ষা এমনভাবে দেওয়া যাইতে পারে যাহাতে তাহা ছাত্রের কাছে শাস্তি বলিয়া মনে হইতে পারে। শিক্ষা দিবার পদ্ধতি বা ব্যবস্থা এমনও হইতে পারে যাহাতে কর্তব্যবোধে শিক্ষা গ্রহণ করা হইতেছে শিক্ষা গ্রহণ-কালে ছাত্রের মনে এরূপ বোধ জাগ্রত হইতে পারে। আবার শিক্ষা গ্রহণ আনন্দদায়ক বলিয়াও বোধ হইতে পারে। যে শিক্ষা-পদ্ধতি এতদিন চলিয়া আসিয়াছে তাহা অনেক ক্ষেত্রে ছাত্রের নিকট শাস্তি বলিয়া বোধ হয়। শিক্ষালয় যেন জেলখানা এবং শিক্ষক যেন উহার কর্তা এরূপ মনে হয়। অর্থাৎ শিক্ষালয় ছেলেমেয়েদিগকে বাঁধিয়া বা আবদ্ধ করিয়া রাখিবার জায়গা। যেখানে এতদূর না হয় সেখানে শিক্ষা গ্রহণ করা কর্তব্য বলিয়া শিক্ষা লওয়া হইতেছে এরূপ ভাব শিক্ষাদানের পদ্ধতি ও ব্যবস্থার ফলে ছাত্রদের মনে উদিত হয় এবং উহার কুফলস্বরূপ শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়। যে শিক্ষা-প্রণালীর পরিণামে শিক্ষা শাস্তি বা কর্তব্য বলিয়া মনে হয় তাহাকে বিনোবাজী কোন শিক্ষা-পদ্ধতি বলিয়া স্বীকার করিতে রাজী নহেন। তিনি উহাকে বলেন, 'শিক্ষার অভাব'।

বিনোবা বলেন, শিক্ষাদান ও গ্রহণ এমনভাবে হওয়া উচিত যাহাতে শিক্ষা গ্রহণ করা হইতেছে এরূপ বোধই যেন না থাকে। খেলার দ্বারা ব্যায়াম হয়। কিন্তু বালকেরা যখন খেলে তখন কেবলমাত্র আনন্দ অনুভব

করিয়া থাকে। অথচ খেলার মাধ্যমে বালকের ব্যায়াম হইয়া যায়। তাই বিনোবাজী বলেন,—

"খেলার অর্থ 'আনন্দ' বা 'মনোরঞ্জন'। উহা ব্যায়ামরূপী কর্তব্য হইয়া দাঁড়াইতে পারে না। সকল প্রকার শিক্ষা সম্পর্কে এরূপ হওয়া চাই। 'শিক্ষা এক কর্তব্য' এরূপ কৃত্রিম ভাবনা অপেক্ষা শিক্ষার অর্থ আনন্দ এই স্বাভাবিক ও উৎসাহদানকারী ভাবনা সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক। কিন্তু আজ আমাদের ছেলেদের মধ্যে কি এই মনোভাব দেখিতে পাওয়া যায়? 'শিক্ষা আনন্দস্বরূপ' এই ভাবনা তো দূরের কথা, 'শিক্ষা এক কর্তব্য' এই ভাবনাও আজ প্রায় দেখা যায় না। আজকালকার ছাত্রদের মধ্যে দাসসুলভ এই ভাবনা প্রচলিত হইয়াছে যে 'শিক্ষা মানে শাস্তি'।"

শিক্ষা সহজভাবে হওয়া চাই। সহজভাবে যাহা হয় তাহা অজ্ঞাতসারে হয়। আমাদের দেহ সঞ্চালনের ক্রিয়াদি অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাস, পরিপাক প্রভৃতি ক্রিয়া সহজভাবে হয়। তাই শ্বাস-প্রশ্বাস যে চলিতেছে অথবা হজম যে হইতেছে এ বোধ আমাদের থাকে না। রোগের অবস্থায় ঐ সব ক্রিয়া সহজে বা স্বাভাবিকভাবে হয় না। তখনই এই বোধ আসে যে শ্বাস-প্রশ্বাস চলিতেছে বা পেটের মধ্যে হজম বা বদ-হজমের ক্রিয়া চলিতেছে। সহজভাবে শিক্ষা গ্রহণ করার প্রকৃষ্ট উদাহরণ শিশুর মাতৃভাষা শিক্ষা। শিশু ব্যাকরণ কাহাকে বলে জানে না। অথচ মাতৃভাষায় কথা-বার্তা বলিতে বলিতে ও মাতৃভাষায় লিখিতে ও পড়িতে শিখিতে শিখিতে সহজভাবে অজ্ঞাতসারে তাহার ব্যাকরণ শিক্ষাও হইয়া যায়। কারণ বালক কখন বলে না—'মা আয়া।' বিনোবাজী বলেন,—

"'ব্যাকরণ' এই শব্দটি সে জানুক এবং ব্যাকরণের পরিভাষাও সে বুঝুক, কিন্তু ব্যাকরণের মুখ্যকার্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।"

এজন্য শিক্ষার উপায় ও লক্ষ্য কি অর্থাৎ সাধন ও সাধ্যের পার্থক্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া শিক্ষারক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া উচিত—যেন সাধনকে সাধ্যের গুরুত্ব দেওয়া না হয় এবং সাধ্যকে গৌণ স্থান দেওয়া না হয়। তর্কশাস্ত্রের উদাহরণ লওয়া যাক। তর্কশাস্ত্র পাঠ করিবার উদ্দেশ্য হইতেছে কোন বিষয় ব্যবস্থিতভাবে বিচার করিতে পারা ও নির্ভুল অনুমান বাহির

করিতে পারা। তর্কশাস্ত্রে পঞ্চাবয়ব বাক্য বা সিলজিজ্‌ম্‌ রচনা করিতে শিখিলে ব্যবস্থিতভাবে যুক্তিতর্ক ও নির্ভুল অনুমান করিবার কৌশল আয়ত্ত করা যায়। কিন্তু সিলজিজ্‌ম্‌ না জানিলেও প্রত্যেক মানুষের তর্কশক্তি থাকে। ছেলেদের মধ্যে তো মূলত তর্কশক্তি রহিয়াছে। আলোর তেজ যদি কম হইয়া আসিতে থাকে তবে ছেলেরাও অনুমান করিয়া লয় যে লণ্ঠনের তেল নিঃশেষ হইয়া আসিতেছে। তাই শিক্ষা ব্যবস্থা এরূপ হওয়া উচিত যাহাতে ছাত্রেরা তাহাদের অন্তর্নিহিত তর্কশক্তি ব্যবহার করিবার সুযোগ বার বার পাইতে থাকে।

সিলজিজ্‌ম্‌ শিখিবার জন্য অপেক্ষা করা উচিত নহে। সিলজিজ্‌ম্‌ অবশ্য শিখিতে হইবে কিন্তু তাহা খুব অল্প বয়সে সম্ভব নহে। সিলজিজ্‌ম্‌ শিখিলে তর্কশক্তি মার্জিত ও প্রখর হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার জন্য অন্তর্নিহিত তর্কশক্তির বার বার অনুশীলনের দ্বারা উহাকে যতদূর সম্ভব বিকশিত করার চেষ্টা ছাড়া উচিত নহে। ব্যাকরণের পরিভাষা ও নিয়মাবলী শিখিবার পূর্বে বালকেরা শুদ্ধ বাক্য বলিতে ও লিখিতে শিখিবে। ইহাই শিক্ষার পদ্ধতি হওয়া উচিত। অর্থাৎ শিক্ষার ক্ষেত্রে সাধ্য-সাধন ব্যাপারটি ভালভাবে উপলব্ধি করিয়া অগ্রসর হওয়া উচিত। সাধনকে সাধ্যের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাকে প্রয়োজনাতিরিক্ত গুরুত্ব দান করা উচিত নহে।

উপরে বলা হইয়াছে যে ছাত্রদের সহজ শিক্ষা পাওয়া উচিত। এজন্য শিক্ষকও সহজ শিক্ষা দিবার যোগ্য হওয়া চাই। বিনোবাজী বলেন যে, যিনি প্রকৃত শিক্ষক তিনি শিক্ষা দেন না। তাঁহার নিকট হইতে শিক্ষা আপনা-আপনি লাভ হইয়া থাকে। যিনি সহজ শিক্ষক হইতে চান তাঁহার মনে এরূপ ধারণা কখনও আসিবে না যে শিক্ষার কার্য বালককে সুযোগ্য নাগরিক করিয়া গড়িয়া তোলা। শিক্ষক কিছু গড়িয়া তুলিতেছেন এরূপ মনোভাব সহজ শিক্ষার মূলোচ্ছেদকারী। এজন্য বিনোবাজী বলেন,—

> "এরূপ শিক্ষা (সহজ শিক্ষা) সম্ভব করিতে হইলে সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকের মনে গুরুগিরির এরূপ অস্পষ্ট ভাবনাও যেন স্থান না পায়—'আমি ছাত্রগণকে শিক্ষাদান করিতেছি'। শিক্ষক নিজে অনন্য ও সহজ শিক্ষক না হইলে ছাত্রগণের সহজ শিক্ষা লাভ হওয়া সম্ভব নহে।"

বিশেষ কোন শিক্ষা-পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া শিক্ষা দেওয়াও সহজ শিক্ষণের পক্ষে ক্ষতিকর হইয়া থাকে। এজন্য বিনোবাজী এ সম্পর্কে তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন,—

"যদি আপনাদিগকে ইহা বলা হয় যে আমরা ফ্রোয়েবেল, পেষ্টালাঁজী অথবা মন্টেসরীর পদ্ধতিতে শিক্ষা দান করিতেছি তবে আপনারা সানন্দে ইহা মনে করিবেন যে ইহা কথার ভ্রম মাত্র, ইহা শব্দ-শিক্ষণ, ইহা কোন পদ্ধতির অর্থহীন অনুকরণ, ইহা প্রেত, ইহাতে প্রাণ নাই। শিক্ষার অর্থ বীজগণিতের কোন ফরমুলা (সূত্র) নহে যে উহা প্রয়োগ করিলেই উত্তর তৈয়ারি হইয়া যাইবে। বর্তমানে যে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে তাহা শিক্ষাই নহে এবং ঐ শিক্ষা দিবার বর্তমান পদ্ধতিও প্রকৃত পদ্ধতি নহে। 'যাহা ভিতরে আছে তাহা সহজভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে'—এই প্রকারে যাহা প্রকট হয় তাহাকেই শিক্ষা বলা যায়।"

এজন্য তিনি বলেন যে সহজ শিক্ষায় ত্রুটি থাকিলেও তাহা চলিতে পারে। কিন্তু বিশিষ্ট পদ্ধতির দাস হইয়া বাঁধাধরা নিয়মে যে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে তাহা জ্ঞান নহে। তাহা অজ্ঞান। তাহা কিছুতেই বরদাস্ত করা যায় না। প্রচলিত কথায় যাহাকে শাস্ত্র (যথা—শিক্ষা-শাস্ত্র, অলঙ্কার-শাস্ত্র, নাট্য-শাস্ত্র ইত্যাদি) বলা হইয়া থাকে তাহার বিশেষ কোন গুরুত্ব বিনোবাজী দেন না। তাঁহার মতে—প্রচলিত শাস্ত্রের অর্থ, 'ব্যবস্থিত অজ্ঞান'। তিনি বলেন যে প্রকৃত শাস্ত্রের গীতার ভাষায় এরূপ দাবী করিতে পারা চাই—'এতদ্ বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত' অর্থাৎ—অর্জুন! ইহা জানিয়া বুদ্ধিমানও কৃতকৃত্য হইয়া যাইবে। যে শাস্ত্র এরূপ দাবী করিতে পারে না তাহা মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার এক 'সুব্যবস্থিত যন্ত্র' ছাড়া আর কিছু নহে। প্রচলিত শাস্ত্রের এরূপ দাবী করিবার কিছু নাই। কারণ, নাট্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কি সেক্স্পীয়র অতবড় নাট্যকার হইয়াছিলেন? কিংবা, কেহ অলঙ্কার-শাস্ত্র পাঠ করিয়া কি প্রতিভাবান কবি বা কাব্যরসিক হইয়াছেন? তিনি বলেন,—

"নূতন শব্দ-সৃষ্টি ছাড়া 'শাস্ত্র' ও 'পদ্ধতি' শব্দের আর অধিক কিছু অর্থ নাই বা গুরুত্ব নাই। ইহা কেবল ভ্রম। 'যাস্তেষাং স্বৈরকথাস্তা এব ভবন্তি শাস্ত্রানি'—ভর্তৃহরির অত্যন্ত মর্মস্পর্শী উক্তি এই যে, শ্রেষ্ঠ

পুরুষগণের স্বৈর (যথেচ্ছ) কথা-সমূহ শাস্ত্র হইয়াছে। শিক্ষা-শাস্ত্রের ক্ষেত্রে ইহা প্রকৃত অর্থে খাটে।"

বিনোবাজী বলেন, শিক্ষার প্রকৃত স্বরূপ অনির্বচনীয়। তিনি বলেন,—

"যাহা বিনা পদ্ধতিতে পদ্ধতিযুক্ত বা ব্যবস্থিত হইয়া উঠে, যাহা কোন গুরু প্রদান করিতে পারেন না, অথচ যাহা দেওয়া হইয়া থাকে তাহা শিক্ষার অনির্বচনীয় স্বরূপ। এজন্য দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন মহাত্মাগণ বলিয়াছেন, 'কিরূপে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে তাহা আমরা জানি না— ন বিজানীম্' (কেন উপনিষদ)। শিক্ষা-পদ্ধতি, পাঠ্যক্রম, সময় পত্রক—এই সব হইতেছে অর্থশূন্য শব্দ। ইহাতে আত্মবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নাই। জীবনযাপনের ক্রিয়া সমূহের ভিতর দিয়াই শিক্ষা লাভ করা আবশ্যক। জীবনযাপনের ক্রিয়া ছাড়া শিক্ষা নামক কোন স্বতন্ত্র ক্রিয়া গড়িয়া উঠিলে শরীরের মধ্যে কোন বি-জাতীয় দ্রব্য প্রবেশ করিলে যেমন অনিষ্টকর পরিণামের সম্ভাবনা হয় সেইরূপ মনের উপর ঐ শিক্ষারও বিষাক্ত ও রোগযুক্ত প্রভাব পড়িয়া থাকে। কর্মের ব্যায়াম না করিলে জ্ঞানের ক্ষুধা জাগে না। সুতরাং এই অবস্থায় যাহা বিজাতীয়রূপে ভিতরে প্রবেশ করে তাহা পরিপাক করিবার শক্তি পঞ্চেন্দ্রিয়ের থাকে না। যদি কেবল পুস্তক মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলে মানুষ জ্ঞানী হইতে পারিত তবে পুস্তকালয়ের আলমারীগুলি জ্ঞানবান হইয়া যাইত। বলপূর্বক প্রবেশ করানো জ্ঞানের ফলে বদহজম হইয়া 'বৌদ্ধিক শূলের' আক্রমণ হয় এবং তাহাতে মানুষের নৈতিক মৃত্যু সংঘটিত হইয়া থাকে।"

'পূর্ণাৎ পূর্ণম্' পদ্ধতি

বাঁকুড়া জেলায় ভূদান পদযাত্রা করিতেছিলাম। তখন খাতড়া থানায় কাঁসাই পরিকল্পনার কাজ চলিতেছিল। তাহার ঠিক পাশ দিয়া আমরা যাইতেছিলাম। আমাদের একজন সহযাত্রী পূর্ব-দিন সেখানে গিয়া জলাধার নির্মাণের কাজ ভালভাবে দেখিয়া আসিয়াছিল। চলিতে চলিতে সে সেই

সম্বন্ধে সাথীদের কাছে গল্প করিতে লাগিল। জলাধার নির্মাণ তাহার ভালভাবে দেখা হইয়াছে। অতঃপর সে পরিকল্পনার অন্যান্য অংশ ক্রমে ক্রমে দেখিয়া লইবে এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, নদী-পরিকল্পনা কি মোটামুটি তাহা সে বুঝিয়াছে কিনা। সে বলিল যে, অন্যান্য সব অংশ দেখিয়া বুঝিয়া লইলে তবে সে পরিকল্পনাটি বুঝিতে পারিবে। অন্যান্য সহযাত্রীরাও পরে সময়ও সুযোগ হইলে ঐভাবে পরিকল্পনার বিভিন্ন অংশ ক্রমে ক্রমে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। আমি বলিলাম,—

"সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটি কি তাহা প্রথমে মোটামুটি বুঝিয়া লইয়া পরে ক্রমে উহার বিভিন্ন অংশ দেখিলে ও বুঝিলে ঠিকমত জ্ঞানলাভ হইবে।" আমি তাহাদিগকে সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিলাম :—

"কাঁসাই নদী বরফ-গলা জলে পুষ্ট হয় না। বর্ষার সময় উহার অববাহিকা হইতে বৃষ্টির জলের বিপুল স্রোত আসিয়া নদীতে পড়িতে থাকে, তখন নদীতে বন্যা হয় ও নদীর দুকূলের বহু গ্রাম ঐ বন্যায় প্লাবিত হইয়া যায়। বহু জমির আবাদ নষ্ট হইয়া যায় এবং তজ্জন্য বহু লোককে বিবিধ প্রকারে দুর্দশা ভোগ করিতে হয়। এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হইলে ঐ বন্যা নিবারিত হইবে এবং যে বন্যার জল শত শত গ্রাম ও লক্ষ লক্ষ লোকের অশেষ ক্ষতিসাধন করিত তাহা সঞ্চয় করিয়া লক্ষ লক্ষ একর জমিতে জল সরবরাহ করিয়া চাষের উন্নতিসাধন করা হইবে। উহার জলস্রোতের শক্তির দ্বারা সস্তায় বিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়া কল-কারখানাও চালানো যাইবে। নদীর উপরের দিকের অববাহিকার মুখের কাছাকাছি ঐ দেখ বিরাট জলাধার নির্মাণ করা হইতেছে। উহাতে অববাহিকা হইতে আগত অধিকাংশ জল অবরুদ্ধ করা হইবে। অবশিষ্ট কিছু জল নদীপথে ক্ষীণস্রোতে বহিতে দেওয়া হইবে। তাহাতে কাহারও কোন ক্ষতির সম্ভাবনা থাকিবে না।

"জলাধারের সম্মুখ দিকের বাঁধে বড় বড় স্লুইস গেট নির্মাণ করা হইবে। তাহার দ্বারা প্রয়োজন মত জল ছাড়া ও বন্ধ করা যাইবে। জলাধারের ঐ মুখ হইতে প্রধান তিনটি খাল তিনদিকে কাটিয়া লওয়া হইতেছে। একটি যাইতেছে এই জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমার দিকে এবং আর দুইটি

যাইবে মেদিনীপুর জেলার দিকে। প্রধান খাল হইতে বহু শাখা-প্রশাখা খাল নির্মাণ করা হইবে এবং প্রধান খাল ও শাখা-প্রশাখা খালের বিভিন্ন অংশে মাঝে মাঝে 'স্লুইস গেট' বসানো হইবে যাহাতে প্রয়োজন মত জল দেওয়া বা বন্ধ করা যায়। ঐ সব শাখা-প্রশাখা খালের দ্বারা লক্ষ লক্ষ একর জমিতে চাষের জন্য প্রয়োজন মত জল দেওয়া হইবে।

"দামোদর পরিকল্পনায় অবরুদ্ধ জল হইতে উৎপন্ন শক্তিকে কাজে লাগাইয়া সস্তায় বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হইতেছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে যে সব নদী-পরিকল্পনার কাজ হইতেছে ঐ সকলের মোটামুটি চিত্র এরূপ। এখন পরিকল্পনার বিভিন্ন অংশের নির্মাণকার্য দেখিলে এবং ঐ সব নির্মিত হইবার পর বিভিন্ন অংশের কার্যাদি দেখিলে কাঁসাই ও অন্যান্য নদী-পরিকল্পনা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ হইবে।"

সকল বিষয়ে এরূপ পদ্ধতিতে শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভ করা উচিত। বিনোবাজী ইহাকে 'পূর্ণাৎ পূর্ণম্' পদ্ধতি নাম দিয়াছেন। শিক্ষাদান পূর্ণ হইতে পূর্ণের দিকে অগ্রসর হইবে, 'অংশ' হইতে পূর্ণের দিকে নহে।

বিনোবাজী বলেন যে শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের কাজ এইভাবে অগ্রসর হওয়া উচিত। অর্থাৎ প্রথমে অস্পষ্ট হইলেও সমগ্র বিষয়সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করিয়া লওয়া উচিত। অতঃপর বিভিন্ন অংশের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় লাভ করা উচিত। উহাতে জ্ঞান অস্পষ্ট হইতে স্পষ্ট এবং স্পষ্ট হইতে সুস্পষ্ট হইতে থাকিবে। এইভাবে অগ্রসর হইলে সকল স্তরে সমগ্রের জ্ঞান লাভ হইতে থাকিবে। কিন্তু প্রথমে সমগ্রের একটি মোটামুটি ধারণা লাভ না করিয়া বিভিন্ন অংশের জ্ঞানলাভ করিতে করিতে অগ্রসর হইলে তাহাতে অন্তিমে সমগ্রের জ্ঞানলাভ হইবে বটে, কিন্তু তাহা অধিক কষ্টসাধ্য প্রক্রিয়া হইবে। উপরন্তু এভাবে অর্জিত জ্ঞান সুস্পষ্ট ও গভীর হইবে না।

বিনোবাজী কয়েকটি উপমা দিয়া জ্ঞানলাভের এই ধারাকে প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পূর্ণাবয়ব মানুষই জন্মগ্রহণ করে। এমন হয় না যে জন্মিবার সময় ২।১টি আঙ্গুল জন্মিল। এরূপ হয় না যে প্রথমে একটি চক্ষু ও একটি কর্ণ জন্মিবে এবং পূর্ণ বয়সে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গবিশিষ্ট মানুষ দেখিতে পাওয়া যাইবে। জন্মের সময় পূর্ণাবয়ব মানুষ এবং পূর্ণ বয়সেও

পূর্ণাবয়ব মানুষ। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বর্ধিত ও পরিপুষ্ট হয় মাত্র। বীজ হইতে ক্ষুদ্র চারা গাছ যখন জন্মায় তখন তাহা মূল, শিকড়, কাণ্ড, পাতাবিশিষ্ট গাছ। উহা ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ একটি গাছ। উহা পূর্ণভাবে বর্ধিত না হইলেও উহা সমস্ত অঙ্গাদি বিশিষ্ট পূর্ণাবয়ব গাছ। সুতরাং প্রাকৃতিক বিকাশের গতিও ঐরূপ। অর্থাৎ উহা অংশ হইতে সমগ্র বা অপূর্ণ হইতে পূর্ণের দিকে নহে। শিক্ষা অন্তরের বিকাশ। উহার বিকাশেও প্রাকৃতিক বিকাশের ক্রম অনুসৃত হওয়া বিধেয় অর্থাৎ উহা পূর্ণ হইতে আরম্ভ হওয়া উচিত। ইহা সহজ ও স্বাভাবিক বিকাশ-ক্রম।

বিনোবাজী শিক্ষার এই বাঞ্ছিত বিকাশ-ধারাকে শ্রুতির ভাষায় 'পূর্ণাৎ পূর্ণম্' নাম দিয়াছেন। 'পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে' অর্থাৎ পূর্ণ হইতে পূর্ণ নিষ্পন্ন হয়। প্রাকৃতিক বিকাশের গতি লক্ষ্য করিলে শ্রুতির এই বচন অনর্থক মনে হইবে না। বরং বুঝা যাইবে যে উহা সমুচিত বিকাশের সঠিক বর্ণনা। তিনি ঠিকই বুঝাইয়াছেন যে আরম্ভে ইহা ছোট পূর্ণ ও অন্তিমে ইহা বড় পূর্ণ। আরম্ভে ইহা ছোট বৃত্ত এবং অন্তিমে ইহা বড় বৃত্ত। এমন নহে যে আরম্ভে অর্ধবৃত্ত পরে উহা পূর্ণবৃত্ত। স্বরাজের ক্ষেত্রেও এরূপ ছোট পূর্ণ ও বড় পূর্ণের কথা। গ্রাম-স্বরাজ ছোট পূর্ণ এবং সমগ্র দেশের স্বরাজ বড় পূর্ণ। সেই প্রসঙ্গে বিনোবাজী একটি সুন্দর উপমা দিয়াছেন। পদ্ধতির ক্ষেত্রেও উহা প্রযোজ্য। তাহা এই :—

বাবা বড় বড় মণ্ডা আনিয়াছেন। মা পরিবেশন করিতেছেন। মা বাবার থালায় একটি গোটা মণ্ডা দিলেন। আর ছেলের থালায় একটি মণ্ডা ভাঙ্গিয়া তাহার এক টুকরা দিলেন। কারণ ছেলে গোটা মণ্ডাটা খাইতে পারিবে না। কিন্তু ছেলে শুনিবে কেন? বাবার থালায় গোটা মণ্ডা আর তাহার থালায় টুকরা? সে গোটা মণ্ডা পাইবার জন্য বায়না ধরিল। মা ছিলেন বুদ্ধিমতী ও প্রত্যুৎপন্নসম্পন্না। তিনি ছেলের থালা হইতে টুকরাটি তুলিয়া লইলেন এবং ঘরের ভিতরে গিয়া গোপনে সেই টুকরাটি পাকাইয়া একটি পূর্ণ গোল মণ্ডা তৈয়ারি করিয়া লইয়া তাহা ছেলের থালায় দিলেন। ছেলে সন্তুষ্ট হইল। বাবার থালায় পূর্ণ মণ্ডা এবং ছেলের থালায়ও পূর্ণ মণ্ডা। একটি বড় এবং একটি ছোট। গ্রাম-স্বরাজ ছোট

পূর্ণ মণ্ডা এবং দেশের স্বরাজ বড় পূর্ণ মণ্ডা। সেরূপ শিক্ষার আরম্ভে ক্ষুদ্র পূর্ণ শিক্ষা এবং শিক্ষার পরিণতিতে বড় পূর্ণ শিক্ষা।

'অস্পষ্ট' হইতে 'স্পষ্ট' ইহার অর্থ কি তাহা বুঝাইবার জন্য বিনোবাজী একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।—

"প্রত্যূষে ৫টার সময় সম্মুখের গাছ ধোঁয়াটে দেখায়। সম্পূর্ণ গাছ দেখিতে পাওয়া যায় বটে কিন্তু তাহা অস্পষ্ট দেখায়, ৫॥টার সময় কিছুটা স্পষ্ট দেখা যাইতে থাকে। ঐ সময়েও পূর্ববৎ সমস্ত গাছটা দেখা যায়। কিন্তু কিছু স্পষ্ট। সূর্যোদয়ের পরও সম্পূর্ণ গাছ দেখা যায়, কিন্তু তখন অত্যন্ত স্পষ্ট। ৫টার সময় গাছের এক-চতুর্থাংশ দেখিতে পাওয়া গেল, ৫॥টার সময় অর্ধেক এবং সূর্যোদয়ের পর সম্পূর্ণ দেখা গেল এরূপ হয় না। তিন বারেই সম্পূর্ণ গাছ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু প্রথমে অস্পষ্ট-সম্পূর্ণ, দ্বিতীয় বারে স্পষ্ট সম্পূর্ণ এবং তৃতীয় বারে অতি স্পষ্ট সম্পূর্ণ দেখা যায়। সূর্যের আলোর কমবেশীতে অস্পষ্ট, স্পষ্ট ও অতিস্পষ্ট এই পর্যায়ে বিকাশ হইয়াছে।"

বিনোবাজী 'অপূর্ণ হইতে পূর্ণ' এবং 'পূর্ণ হইতে পূর্ণ' এই দুই-এর কি পার্থক্য তাহা একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়াছেন :—

> "মনে করুন, আমরা সমুদ্র উপকূলে দাঁড়াইয়া আছি। এখন সমুদ্রে জাহাজ ইত্যাদি কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। কিছুক্ষণ পরে সমুদ্রে একটি জাহাজ দেখিতে পাওয়া গেল। অর্থাৎ জাহাজের শুধু উপরের অংশ দেখিতে পাওয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে জাহাজের মধ্যভাগ দেখা গেল। এখন তো সম্পূর্ণ জাহাজ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে বটে কিন্তু দূরে আছে বলিয়া অস্পষ্ট দেখাইতেছে। অতঃপর উহা যতই কাছে আসিতে থাকিবে ততই উহা স্পষ্ট হইতে থাকিবে। সর্ব-প্রথমে যখন জাহাজ দেখা গেল তখন হইতে সম্পূর্ণ দেখিতে পাওয়া পর্যন্ত দর্শনকে 'অপূর্ণ হইতে পূর্ণ' আর উহার পরবর্তী দর্শনকে 'পূর্ণ হইতে পূর্ণ' বলা যাইবে।"

বিনোবাজী ভূগোল শিক্ষাদানের দৃষ্টান্ত দিয়া কিভাবে ছাত্রদের জ্ঞান 'পূর্ণ হইতে পূর্ণের দিকে' লইয়া যাওয়া যায় আবার 'অপূর্ণ হইতে পূর্ণের দিকে' লইয়া যাওয়া যায় তাহা বুঝাইয়াছেন :—

"একজন শিক্ষক ছাত্রগণকে ভারতের ভূগোল পড়াইতেছেন। তিনি প্রথমে তাহাদিগকে ভারতের পূর্ণ নক্সা দেখাইলেন। অতঃপর তাহাদিগকে বিভিন্ন প্রদেশ দেখাইলেন। তাহার পর সব প্রদেশের নদীগুলি দেখাইলেন। উহার পর প্রত্যেক প্রদেশের ঐতিহাসিক, ধর্ম-সম্বন্ধীয়, ব্যবসায়-সংক্রান্ত যে সব প্রধান প্রধান স্থান আছে তাহা দেখাইলেন এবং এইভাবে প্রদেশসমূহের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তথ্যাদি বুঝাইলেন। ইহাতে ছাত্রদের জ্ঞান 'পূর্ণ হইতে পূর্ণের' দিকে লইয়া যাওয়া হইল।

"অন্য একজন শিক্ষকও ছাত্রগণকে ভারতের ভূগোল পড়াইতেছেন। কিন্তু তিনি প্রথমে ছাত্রগণকে একটি জেলার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় শিক্ষা দিলেন। পরে অন্য জেলাগুলিরও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সব জ্ঞাতব্য বুঝাইলেন। এইভাবে ছাত্রগণকে একটি প্রদেশের সমস্ত জ্ঞাতব্য শিক্ষা দেওয়া হইল। কিন্তু অন্যান্য প্রদেশ সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান শূন্য থাকিয়া গেল। পরে শিক্ষক এরূপ ক্রমে অন্যান্য প্রদেশের সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম বিষয়ের জ্ঞাতব্য বুঝাইলেন। অবশেষে ছাত্রগণের ভারতের জ্ঞাতব্য সব বিষয়েরই জ্ঞান হইয়া গেল। ভারতের ভূগোল পড়ানো সম্বন্ধে বলিতে হইলে বলা যায় যে এই শিক্ষক ছাত্রদের জ্ঞান 'অপূর্ণ হইতে পূর্ণের' অভিমুখে লইয়া যাইতেছেন।"

যদি এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় তবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কিরূপ অসুবিধার উদ্ভব হইতে পারে তাহার এক দৃষ্টান্ত দিলে বুঝা যাইবে। শিক্ষক ভারতবর্ষের ভূগোল পড়াইতেছেন। তিনি অপূর্ণ হইতে পূর্ণের দিকে অগ্রসর হওয়ার পদ্ধতি অনুসরণ করিতেছেন। কয়েকটি প্রদেশের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তথ্য তিনি ছাত্রদিগকে পড়াইয়াছেন। কিন্তু তখনও আসাম সম্বন্ধে পড়ানো হয় নাই। এমন সময় আসামে ভীষণ বন্যা হইল। বন্যাক্লিষ্ট নর-নারীদের দুর্দশার জন্য দেশব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি হইল। কিন্তু ঐ সব ভূগোলের ছাত্র জানিবে না কোথায় ঐ আসাম। আজকাল মাঝে মাঝে ছাত্র, বা পাশকরা যুবকদের এবম্প্রকার অজ্ঞতার কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ইহা যে অপূর্ণ হইতে পূর্ণের অভিমুখে শিক্ষাধারার পরিণাম সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শিল্পকলার ক্ষেত্রেও পূর্ণ হইতে পূর্ণের দিকে লইয়া যাওয়ার পদ্ধতি শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি বলিয়া গণ্য করা হয়। বিনোবাজী বলেন,—

'মডেলিং' (মাটির মূর্তি প্রভৃতি তৈয়ারির কলা) সম্বন্ধীয় এক পুস্তকে মূর্তিকে অপূর্ণ হইতে পূর্ণের দিকে লইয়া যাওয়ার পদ্ধতি স্পষ্টভাবে নিষেধ করা হইয়াছে। উক্ত পুস্তকে লেখক নিজের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে আরম্ভের সময় মাটির যে কোন আকার করা হয় হউক কিন্তু যদি শেষে অভীষ্ট আকার আসিয়া যায় তবে ঠিকই হইবে—এরূপ ধারণা লইয়া কখনও যেন কাজ করা না হয়। বরং এইভাবে নির্মাণ-কার্য করিতে হইবে যাহাতে আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত কোনও সময়ে যদি কেহ উহাকে দেখেন তবে তিনি যেন বুঝিতে পারেন যে কোন্ মূর্তি তৈয়ারি করা হইতেছে। এরূপ হইলে তবেই মূর্তিতে কলার সঞ্চার হইবে।"

সুতরাং পূর্ণ হইতে পূর্ণ, অস্পষ্ট পূর্ণ হইতে অতি স্পষ্ট পূর্ণ ইহা শিক্ষা বিকাশের আদর্শক্রম হওয়া উচিত।

বিদ্যালয়-পরিবার

প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতিতে জীবনের সহিত শিক্ষার প্রত্যক্ষ যোগ থাকে না। তাহাতে দুই প্রকারের কুফল হয়,—(১) বিচার নির্জীব হয় ও জীবন বিচারশূন্য হয় এবং (২) পরস্পর সম্পর্ক রহিত দুইভাগে জীবন বিভক্ত হইয়া যায়ঃ যথা, (ক) প্রত্যক্ষ জীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অলিপ্ত থাকিয়া শিক্ষা গ্রহণের কাল ও (খ) শিক্ষার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া জীবনের দায়িত্ব পালনের কাল।

ব্যবহারিক জীবনের সহিত শিক্ষার কোন যোগ না থাকায় বিদ্যালয় একমাত্র বিচারশিক্ষার ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়ায়। আর ব্যবহারিক জীবনযাপন ও জীবনক্রিয়া সম্পন্ন করিবার ক্ষেত্র হয় একমাত্র পরিবার। যদি প্রত্যক্ষ জীবনক্রিয়ার মাধ্যমে বিচারশিক্ষা হয় এবং বিচারকে প্রত্যক্ষ জীবনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার সুযোগ থাকে তবে সেই বিচার সজীব ও তেজস্বী হয়। নচেৎ বিচার নির্জীব হইয়া পড়ে। অন্যদিকে পরিবারের মধ্যে জীবনযাপনের

যে ক্রিয়াদি চলিয়া থাকে তাহার সহিত শিক্ষার কোন সম্পর্ক না থাকায় জীবন-ক্রিয়ার পশ্চাতে বিচারের অভাব ঘটিতে থাকে ও জীবন ক্রমশ বিচারশূন্য হইয়া পড়ে। একদিকে নির্জীব বিচার ও অন্যদিকে বিচারশূন্য জীবনের সৃষ্টি হইয়া থাকে। জীবন ও বিচারের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে না।

নয়ী তালীমে যে পাঠ্যক্রম অনুসরণ করা হয় তাহার দ্বারা ইহার কিছুটা প্রতিকার হয় বটে, কিন্তু তাহাই যথেষ্ট নহে। উহার সঙ্গে সঙ্গে আবশ্যকীয় জীবনক্রমের ব্যবস্থা থাকা উচিত। বিনোবাজী এই প্রসঙ্গে বলেন,—

"ইহার উপায় এই যে একদিক হইতে বাসগৃহের মধ্যে বিদ্যালয়ের প্রবেশ হওয়া চাই এবং অন্যদিক হইতে বিদ্যালয়ের মধ্যে বাসগৃহের প্রবেশ হওয়া প্রয়োজন। সমাজ-বিজ্ঞানকে বিদ্যালয়প্রতিম পরিবার গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং শিক্ষা-বিজ্ঞানকে পরিবারপ্রতিম বিদ্যালয় নির্মাণ করিতে হইবে।"

'শালীন কুটুম্ব' অর্থাৎ শিক্ষাদানকারী পরিবার বা শিক্ষালয়-প্রতিম পরিবার কিরূপ হওয়া উচিত তাহার কিছু আভাস পূর্ব-বুনিয়াদী প্রকরণে আলোচনা করা হইয়াছে। গৃহের পরিবেশ এমন হওয়া উচিত, যাহাতে সহজভাবে শিশু ও বালকদের সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধিত হইতে পারে। সেজন্য পিতা-মাতার আচরণ এমন হওয়া উচিত যাহাতে তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া বালক-বালিকাদের সৎ আচরণের অভ্যাস হয়। পিতা-মাতা বা বাড়ীর অন্যান্য যাঁহারা বড় তাঁহাদের নিজেদের বিচারশীল হওয়া উচিত। তাঁহারা জীবনযাপনের প্রত্যেক ক্রিয়ার 'কি ও কেন' ছোটদিগকে বুঝাইয়া দিবেন ও বুঝাইয়া দিতে সদা আগ্রহশীল থাকিবেন। তাঁহারা ছোটদের মনে ঐ সব জানিবার ও বুঝিবার জন্য কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা জাগ্রত করিবেন ও তাহাদের শত প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিবেন। এইভাবে চলিলে গৃহও শিক্ষালয়ে পরিণত হইবে।

বিদ্যালয় ছাত্রাবাস বা গুরুগৃহের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠা উচিত। অর্থাৎ আবাসিক বিদ্যালয়েরই প্রয়োজন। উহাই বিনোবাজীর ভাষায় 'পাঠশালা পরিবার'। ঐরূপ আবাসিক বিদ্যালয় হউক অথবা অনাবাসিক বিদ্যালয় হউক, উভয়ের পাঠ্যক্রম যে নয়ী তালীমের ব্যবস্থানুরূপ হইবে তাহা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু ঐরূপ আবাসিক বিদ্যালয়ের জীবনক্রম কিরূপ

হওয়া উচিত তাহা জানা প্রয়োজন। বিনোবাজী তাহার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলেন যে উহা নিম্নপ্রকার হইবে :—

(১) প্রত্যুষে উঠিবার পর ও রাত্রে শয়নের পূর্বে এই দুইবার প্রার্থনা। কারণ ঈশ্বর-নিষ্ঠা সংসারে সার বস্তু।

(২) আহার সাত্ত্বিক হওয়া চাই। অর্থাৎ গরম মশলা, লঙ্কা, অধিক তৈল প্রভৃতি নিষিদ্ধ পদার্থ বর্জিত হওয়া আবশ্যক। কারণ আহার-শুদ্ধির সহিত চিত্ত-শুদ্ধির নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে। আহার কিরূপ হওয়া উচিত তাহা বিচারের সময় বিনোবাজী আহার সম্বন্ধে এখন যে বিচার সর্বসমক্ষে রাখিতেছেন তাহা স্মরণীয়। আহার সম্বন্ধে তাঁহার বিচারই ঠিক। তিনি বলেন যে কিরূপ খাদ্য খাওয়া উচিত—ইহা অপেক্ষা কি পরিমাণ খাদ্য খাওয়া উচিত তাহার উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। যাহাকে সাত্ত্বিক খাদ্য বলিয়া গণ্য করা হয় তাহা যদি অপরিমিত ভোজন করা হয় তবে তাহা অ-সাত্ত্বিক খাদ্য ভোজন অপেক্ষাও অনিষ্টকারক হয়। ভোজনের পরিমাণের উপর সংযম রাখাই আহার সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা বড় কথা। অতএব ছাত্রদের অপরিমিত আহার সম্বন্ধে সর্বদা সতর্ক হওয়ার অভ্যাস থাকা প্রয়োজন।

(৩) নিজেরা রান্না করা চাই। ইহা স্বাবলম্বী জীবনের এক অঙ্গ। বাহিরের কোন পাচকের দ্বারা রান্না করানো উচিত নহে। যিনি দেশ-সেবার কাজ করিবেন ও যিনি ব্রহ্মচারী এই উভয়ের পক্ষে খাদ্য পাক করা সম্পর্কে স্বাবলম্বী হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

(৪) শৌচাগার সাফ করার কাজ নিজেদের হাতে লওয়া চাই। কারণ সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় যে কাজকে আজ নীচ বলিয়া গণ্য করা হয় সেই কাজকে ঘৃণার চক্ষে না দেখা ও তাহা স্বয়ং করিবার অভ্যাস করা অস্পৃশ্যতা পরিহারের অন্তর্ভুক্ত হইতেছে। শৌচাগার সাফ করার কাজকে একমাত্র মেথরের কাজ বলিয়া গণ্য করার মনোভাব দূর হওয়া উচিত।

(৫) তথাকথিত অস্পৃশ্যদের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজনের ব্যবস্থা থাকা চাই।

(৬) স্নানাদি প্রাতঃকালেই করিয়া লওয়ার অভ্যাস হওয়া উচিত। তবে প্রাতঃস্নান সহ্য না হইলে পৃথক কথা। ঠাণ্ডা জলেই স্নান করা উচিত।

(৭) রাত্রে শুইবার পূর্বে হাত, পা, মুখ ইত্যাদি ধৌত করিয়া অর্থাৎ প্রাতঃকর্মের মত সায়ংকর্ম করিয়া তবে শয়ন করা কর্তব্য। ইহাতে নিদ্রা ভাল হয় ও ব্রহ্মচর্যের পক্ষে সুবিধা হয়।

(৮) গৃহশিল্পের কাজে দৈনিক তিন ঘণ্টা সময় দেওয়া কর্তব্য। শরীর-শ্রম না করিলে অধ্যয়ন তেজস্বী হয় না।

(৯) তিন ঘণ্টা গৃহশিল্পে শরীর-শ্রম এবং গৃহকৃত্য ও স্বকৃত্য করিবার পর ব্যায়ামের বিশেষ প্রয়োজন না হইতে পারে। তথাপি প্রয়োজন বোধে খোলা হাওয়ায় খেলা, বেড়ানো বা অন্য কোন বিশেষ ব্যায়াম করা যাইতে পারে।

(১০) গৃহশিল্পের জন্য তিন ঘণ্টা ছাড়া স্থতা কাটিবার জন্যও পৃথক আধ ঘণ্টা সময় প্রত্যহ নিয়মিতভাবে দেওয়া কর্তব্য। স্থতাকাটাকে প্রার্থনার মত আবশ্যিক নিত্যকর্ম বলিয়া গণ্য করা উচিত। তকলীতে কাটারও অভ্যাস করা উচিত। তকলীতে স্থতাকাটার অভ্যাস থাকিলে ভ্রমণের সময়েও এই নিত্যকর্ম চালু রাখার পক্ষে সুবিধা হয়।

(১১) পরিধেয় খাদিই হওয়া উচিত। অন্যান্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদি যতদূর সম্ভব স্বদেশী হওয়া উচিত।

(১২) রোগী-সেবা ভিন্ন অন্য কোন কারণে রাত্রি জাগরণ নিষিদ্ধ। নিদ্রার জন্য আড়াই প্রহর বা ৭॥০ ঘণ্টা সময় রাখা চাই।

(১৩) অধিক রাত্রিতে ভোজন করা নিষিদ্ধ। সন্ধ্যার পূর্বে ভোজন সমাপ্ত হওয়া উচিত। স্বাস্থ্য, কাজকর্মের ব্যবস্থা ও অহিংসা—এই তিন দৃষ্টিতে এই নিয়ম আবশ্যক।

শিক্ষক কিরূপ হওয়া উচিত

আজ আমাদের দেশে শিক্ষার যে প্রহসন চলিতেছে তাহাতে শিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত এ সম্বন্ধে মনন-চিন্তন করা যেরূপ প্রয়োজন সেরূপ শিক্ষক কিরূপ হওয়া উচিত সে সম্বন্ধেও গভীরভাবে বিচার করা দরকার। বিনোবাজী এ সম্পর্কে বোধহয় সর্বাপেক্ষা গভীর ও সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়াছেন। এজন্য

শিক্ষক সম্পর্কে তাঁহার বিচার বুঝিলে সে সম্বন্ধে সকলের ধারণা পরিষ্কার হইবে। শিক্ষকের যোগ্যতা সম্পর্কে তাঁহার সুচিন্তিত অভিমত এই :—

"আপন ছাত্রদের প্রতি শিক্ষকগণের অনন্যনিষ্ঠা থাকা প্রয়োজন। বিদ্যার্থীগণের মনে এরূপ ধারণা জন্মানো আবশ্যক যে তাহাদের উন্নতি ও বিকাশ ব্যতীত শিক্ষকের জীবনে অন্য কোন বিষয়ে অভিরুচি নাই। যদি এরূপ মনোবৃত্তি ও নিষ্ঠা শিক্ষকের থাকে তবে তাঁহার যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ জ্ঞান আছে তাহা তিনি ছাত্রদিগকে দান করিবেন এবং তাহাতে তিনি এমন আনন্দ লাভ করিবেন যেমন আনন্দ মাতা সন্তানকে স্তন্য পান করাইবার সময় পাইয়া থাকেন। জ্ঞান ও বাৎসল্য শিক্ষকের মুখ্য গুণ হওয়া আবশ্যক। যদি এরূপ গুণ শিক্ষকের থাকে তবে বর্তমান পরিস্থিতিতেও তিনি কিছু করিতে পারিবেন। তাঁহার নিষ্ঠা যেন বিভাজিত না হয়। এজন্য আমার মতে যিনি বানপ্রস্থ গ্রহণ করিয়াছেন কেবল তিনিই শিক্ষক হইতে পারেন। আমাদের দেশে বানপ্রস্থাশ্রম এক স্বতন্ত্র আশ্রম ছিল। ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যা শিক্ষার আশ্রম ও গৃহস্থাশ্রম নাগরিকের আশ্রম ছিল। বানপ্রস্থাশ্রম শিক্ষকের আশ্রম এবং সন্ন্যাসাশ্রম আত্মজ্ঞান ও বিশ্বোদ্ধারের আশ্রম। ইহার মধ্যে বানপ্রস্থীর শিক্ষক হইবার অধিকার আছে।"

শিক্ষকের কেন বানপ্রস্থী হওয়া চাই তাহা বুঝা আবশ্যক। শিক্ষাদান কার্যে অনন্যনিষ্ঠ হইতে হইলে চারি আশ্রমের মধ্যে বানপ্রস্থাশ্রমই সর্বাপেক্ষা উপযোগী। কারণ ব্রহ্মচর্য আশ্রমে নিজেকেই বিদ্যার্জন করিতে হয়। গৃহস্থাশ্রমে গৃহস্থ তথা নাগরিকের দায়িত্ব পালন করিতে হয়। এজন্য অনন্যনিষ্ঠা সম্ভব নহে। সন্ন্যাসাশ্রমে আত্মজ্ঞান ও সকলের মোক্ষের বিষয় লইয়া থাকিতে হয়। উহা সমগ্র বিশ্বের জন্য। এজন্য সন্ন্যাসাশ্রমীর কেবল বিদ্যার্থীদের হিতের চিন্তা আসিতে পারে না। সুতরাং একমাত্র বানপ্রস্থাশ্রমেই বিদ্যার্থীর জন্য অনন্যনিষ্ঠা আসা সম্ভব। বিনোবাজী বলেন যে তিনি বহু বৎসর যাবৎ এই বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ইহা হইল একদিক।

অন্য একটি দিক আছে যাহার জন্য শিক্ষকের পক্ষে বানপ্রস্থাশ্রমের একান্ত প্রয়োজন। তাহা হইতেছে এই যে শিক্ষকের অভিজ্ঞ হওয়া প্রয়োজন।

যাঁহার জ্ঞান জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে লব্ধ বা পুষ্ট নহে তাঁহার জ্ঞান অস্পষ্ট, ধোঁয়াটে। তাহা অন্যকে সম্প্রদান করিবার যোগ্য নহে। বিশেষত নয়ী তালীমের জন্য যাঁহার জ্ঞান জীবনের অভিজ্ঞতার দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়াছে এরূপ শিক্ষকেরই প্রয়োজন। কারণ নয়ী তালীমের চরম লক্ষ্য হইতেছে নূতন সমাজ রচনা, সামাজিক ক্রান্তিসাধন। একবার নূতন সমাজ রচনা করিলেই যে কাজ হইয়া গেল তাহা নহে। কারণ বিনোবাজী বলেন,—

"যে নূতন সমাজ আমরা গঠন করিয়াছিলাম তাহা তো পুরাতন হইয়া গিয়াছে এবং এই কারণে পুনরায় নূতন সমাজ গঠনের কাজ বাকি থাকিয়া যাইতেছে। নয়ী তালীমের অর্থ এই—নিত্য নূতন সমাজ রচনা করিবার শিক্ষা। এই শিক্ষা এরূপ অভিজ্ঞ জ্ঞানীগণের হাতে থাকা উচিত, যাঁহাদের অপরকে দিবার মত অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান আছে।"

রাজাজীও (শ্রীযুক্ত রাজা গোপালাচারী) এরূপ কথা বলিয়াছেন। এক সময়ে যখন নয়ী তালীমের কথা আলোচনা হইতেছিল তখন রাজাজী বলিয়া ছিলেন—"নয়ী তালীম এমন বিশেষ শিক্ষা যাহার জন্য অভিজ্ঞ শিক্ষকগণের আবশ্যকতা থাকিবে।" ঐ সময়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে মাদ্রাজে নয়ী তালীম চালানো যাইবে না কেন। তাহার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে তিনি রাজকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর নয়ী তালীমের শিক্ষক হইবেন। তিনি রাজকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া নিজে নয়ী তালীমের শিক্ষক হইয়া বসেন নাই বটে, কিন্তু তিনি শিক্ষকের যোগ্যতা সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন তাহা ঠিক। এই জন্যই বিনোবাজী একাধিকবার বলিয়াছেন যে রাজনীতি পড়াইবার জন্য পণ্ডিত নেহরুর আসা চাই। ব্যবসা-বাণিজ্যের বিষয়ে অধ্যাপনার জন্য বিড়লাজীর আসা চাই। এরূপ অন্যান্য বিষয়েও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণই সেই সেই বিষয়ের যোগ্য শিক্ষক হইতে পারেন। বিনোবাজী চাহেন যে কিছু পরিণত বয়স হইলেই তাঁহারা যেন অবসর গ্রহণ করিবার পর বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণ করিয়া শিক্ষার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি বলেন,—

"কোন নেপোলিয়ন থাকিলে তিনি তাঁহার বীরত্ব কাহিনী লোককে শুনাইবেন ও যুদ্ধ সম্পর্কে নিজের অভিজ্ঞতার কথা তাহাদের সম্মুখে

বর্ণনা করিবেন। যাঁহার যুদ্ধের কোন অভিজ্ঞতা নাই তিনি ছাত্রদিগকে পরাক্রমী করিয়া গড়িয়া তুলিবেন কিরূপে? সত্যনিষ্ঠা বজায় রাখিয়া কোটি কোটি টাকার ব্যবসা করিয়াছেন এরূপ কোন ব্যবসায়ী যদি শিক্ষক হন তবেই তিনি ছেলেদিগকে ব্যবসা সম্পর্কে অভিজ্ঞতাসিদ্ধ জ্ঞান শিক্ষা দিবেন। কিন্তু যিনি নিজে ব্যবসা করেন নাই এবং যিনি কেবলমাত্র বাণিজ্য কলেজ হইতে পাশ করিয়া আসিয়াছেন তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ে কি শিক্ষা দিবেন? বিভিন্ন প্রকারের পুরুষার্থ প্রয়োগের ক্ষেত্রে কাজ করিয়া যাঁহারা অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন কেবলমাত্র তাঁহারাই ছেলেদের শিক্ষা দিবার অধিকারী।"

কিন্তু তাহা তো হইতেছে না বরং বিপরীতই হইতেছে। যাঁহার রাজনীতি সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা নাই এমন বিশ-বাইশ বৎসরের যুবক রাজনীতি পড়াইতেছেন, আর যিনি ব্যবসা-বাণিজ্য কোনদিন করেন নাই এমন তরুণ যিনি সম্ভ কলেজ হইতে বাহির হইয়াছেন, তিনি বাণিজ্য কলেজে অধ্যাপনা করিতেছেন। এরূপ শিক্ষকগণের নিকট হইতে কী প্রকারে জ্ঞান-লাভ হইতে পারে? উপরন্তু শিক্ষকগণকে নিজেদের ঘর-সংসারও দেখিতে হয়। এজন্য অনন্যনিষ্ঠা রাখা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। বিনোবাজী বলেন,—

"এজন্য তাঁহারা পুস্তকের জ্ঞানই শিক্ষা দিতে পারেন। অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান তাঁহারা প্রদান করিতে পারেন না। এই দুই দৃষ্টিতে দেখিলে মনে হয় যে বানপ্রস্থই শিক্ষকের প্রকৃত আশ্রম।"

শিক্ষার লক্ষ্য

মানুষ ও পশুর মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য আছে সে সম্বন্ধে সজাগ থাকিয়া এবং সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া যদি মানুষের বিকাশের ব্যবস্থা করা হয় তবেই মানুষের সর্বাঙ্গীন বিকাশের প্রকৃত দিগ্দর্শন করা সম্ভব হয়। বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রে মানুষ পশুকে কতদূর ছাড়াইতে পারিয়াছে তাহা হইবে মানুষের বিকাশের কষ্টিপাথর। মানুষের আত্মা আছে। পশুরও আছে। তবে পশুর আত্মার বিকাশ হয় না। কিন্তু মানুষের আত্মা অনন্ত বিকাশশীল। মানুষের

আত্মার যত বিকাশ হয় তত অধিক ব্যক্তিকে সে আপনার বলিয়া ভাবে ও তদ্রূপ আচরণ করে। কোন মানুষের আত্মার বিকাশ যদি গ্রাম পর্যন্ত হয় তবে সে নিজের গ্রামের সকল মানুষকে আপনার বলিয়া ভাবে ও তাহাদের সহিত নিজ পরিবারের লোকের মত আচরণ করে। কিন্তু পশুর আত্মার বিকাশ হয় না বলিয়া পশু নিজের দেহকেই শুধু আপনার বলিয়া ভাবে। সে অন্য কাহাকেও আপনার বলিয়া ভাবিতে পারে না। কোন্ মানুষের বিকাশ কতদূর হইয়াছে তাহা বুঝিতে হইলে পশুর সহিত সেই মানুষের ভাবনা ও আচরণের তুলনা করিয়া দেখিতে হয়। তবে ঠিকমত বুঝা যায় কোন্ মানুষের আত্মার বিকাশ কতদূর সাধিত হইয়াছে।

শিক্ষার ক্ষেত্রেও সেইরূপভাবে দেখিতে হইবে যে মানুষ পশুকে ছাড়াইয়া কতদূর অগ্রসর হইবার শিক্ষা পাইতেছে। বিনোবাজী পশুর সহিত মানুষের যে তিন বিষয়ে পার্থক্য আছে তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ও তাহার সহিত তুলনা করিয়া মানুষের শিক্ষার আদর্শ কি হওয়া উচিত তাহা দেখাইয়াছেন। তাহা হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে আদর্শ শিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত।—

ভগবান মানুষকে তিনটি দান দিয়াছেন: (১) বাণী, (২) কর্মেন্দ্রিয় ও (৩) সহানুভূতিশীল হৃদয়। পশুর তুলনায় মানুষের এই তিন শক্তি ও গুণকে কতদূর বিকশিত করাইয়া তাহাকে অগ্রগতি দান করা হইতেছে, তাহা পশুর সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে ও বুঝিলে বুঝিতে পারা যায় যে শিক্ষার ব্যবস্থা ঠিকমত করা হইয়াছে কিনা।

মানুষের বাণী আছে। পশু, পক্ষী প্রভৃতিরও বাণী আছে; কিন্তু উহা বিকশিত বা বিকাশশীল নহে। মানুষ বাণীর দ্বারা নিজের ভাবনা ও বিচার প্রকাশ করিতে পারে। কিন্তু পশু, পক্ষী তাহা পারে না।

বিনোবাজী বলেন, "বাণীর সদ্ব্যবহারের শিক্ষা বিদ্যালয়ে হওয়া আবশ্যক।" বাণীর সাহায্যে মানুষ নানাপ্রকারের ভাষা, যথা—মাতৃভাষা, ইংরেজী, হিন্দী ইত্যাদি শিখিয়া থাকে। বিনোবাজী বলেন যে বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা করিলে যে বাণীর শিক্ষা হইল এমন নহে। ভাষার শিক্ষা এক বস্তু, বাণীর শিক্ষা অন্য বস্তু। বিনোবাজী বলেন,—

"বাক্ সংযম সাধিত হইলে তবে বলা যায় যে বাক্ সম্পর্কীয় শিক্ষা লাভ হইয়াছে। বাণীর মাধ্যমে সকলের সহিত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়া

থাকে। বাণীতে ব্যর্থ-শব্দ প্রকাশ পায় না, বাণীতে সত্য বচনই ব্যক্ত হয়। বাণীর দ্বারা হরিনাম করা হয়। নিজের বাক্যের দ্বারা অন্যের হৃদয়ের সন্তোষ বিধান হওয়া চাই। পরিমিত পরিমাণে মৌন অবলম্বন করা চাই, অনর্থক যেন কথা বলা না হয়। যখন এই সকল শিক্ষালাভ হইবে তখন বলা যাইতে পারে যে বানীর শিক্ষালাভ হইয়াছে।"

ভগবান মানুষকে হাত-পা দিয়াছেন, বানর ইত্যাদি পশুকেও তাহা দিয়াছেন। কিন্তু বানর তাহার হাত-পায়ের দ্বারা সেবা করিতে পারে না; শুধু খাওয়ার কাজে তাহা ব্যবহার করিতে পারে। বানর বীজ বপন করিতে বা ফসল উৎপাদন করিতে পারে না। কিন্তু মানুষ দুই হাতে সৃষ্টির সেবা করিতে পারে। এইখানে মানুষের বিশেষত্ব। যদি শিক্ষা-ব্যবস্থায় এইরূপ সেবাকর্ম শিখিবার ব্যবস্থা না থাকে তবে সেই শিক্ষা ত্রুটিপূর্ণ। আজকার শিক্ষা-ব্যবস্থায় এই সেবাকর্ম শিক্ষা দেওয়া হয় না। বিনোবাজী বলেন,—

"বিদ্যার্থীরা নিজেদিগকে উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য অনেক কিছু শিক্ষা করিয়া থাকে; কিন্তু অবশেষে সবই ব্যর্থ বলিয়া পরিগণিত হয়।"

ভগবানের তৃতীয় দান হইতেছে সহানুভূতিশীল হৃদয়। বিনোবাজী বলেন,—

"কাহারও দুঃখ দেখিলে হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হয়। প্রাণীদেরও সহানুভূতি আছে। ঘোড়া ও কুকুরের মধ্যেও আমরা সহানুভূতি দেখিতে পাই। তবে তাহাদের প্রেম তাহাদের পালকদেরই প্রতি থাকে। ইহাও পশুদের এক বড় গুণ। কিন্তু এক প্রাণী অন্য প্রাণীর প্রতি দয়া ও ক্ষমা প্রদর্শন করে না। বাঘ যখন হরিণ শিকার করে তখন হরিণের দুঃখ হয় কিন্তু বাঘ সুখী হয়। বাঘ হরিণকে সহানুভূতির চক্ষে দেখে না। কিন্তু মানুষের এরূপ হয় না। মানুষ করুণাময় হৃদয় লাভ করিয়াছে। ইহা এক বড় দান মানুষ পাইয়াছে। উহার সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে সার-অসার বিচার করিবার বুদ্ধিও দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ মনুষ্যকে বিবেকময় ও করুণাময় অন্তঃকরণ দান করা হইয়াছে। কাজের শিক্ষায় এবম্বিধ হৃদয়ের বিকাশসাধন করিবার কোন ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না। শিক্ষায় এরূপ কোন সুযোগ নাই যাহাতে ছাত্রদের

করুণার বিকাশ হয়। বিবেক-বুদ্ধির দ্বারা ধর্মাধর্ম নির্ণয় হইয়া থাকে। কিন্তু এরূপ বিবেকের বিকাশসাধনেরও শিক্ষা দেওয়া হয় না। বালকের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে উহার মধ্যে বিবেক আসিয়াই থাকে। কিন্তু উহার বুদ্ধির বিকাশের সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা প্রচলিত বিদ্যালয়গুলিতে নাই। যে শিক্ষা-ব্যবস্থায় এই তিন প্রকার শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে তাহা আদর্শ-শিক্ষা।”

প্রচলিত শিক্ষার তিন দোষ

ইংরেজ শাসনের সময় আমাদের দেশে শিক্ষায় যে সব দোষ আসিয়াছে তাহা এত ভয়ানক যে বিনোবাজী উহাকে আয়ুর্বেদের ত্রি-দোষের ন্যায় মারাত্মক বলিয়া বিবেচনা করেন। এজন্য তিনি আয়ুর্বেদের অনুকরণে বর্তমান শিক্ষার দোষকেও 'ত্রি-দোষ' আখ্যা দিয়াছেন। তিনি বলেন,—

“আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রানুসারে বায়ু, পিত্ত ও কফের প্রকোপে যেরূপ রোগীর মৃত্যু সংঘটিত হইয়া থাকে শিক্ষার এই ত্রি-দোষও সেইরূপ ভয়ানক। এরূপ শিক্ষা না দেওয়াই শ্রেয়। খারাপ খাদ্য খাওয়া অপেক্ষা কিছুই না খাওয়া ভাল। কিছু না কিছু খাইতে হইবে বলিয়া বিষ তো খাইতে পারা যায় না?” বিনোবাজী শিক্ষার ত্রি-দোষ সম্পর্কে বলেন,—

“ইংরেজ রাজত্বের ফলে এ দেশে এক বড় দুর্ঘটনা এই হইয়াছে যে কিছু লোক ইংরেজী শিক্ষা (যাহাকে উচ্চ শিক্ষাও বলা হয়) পাইয়াছেন আর বাকি লোক সে শিক্ষা পান নাই। তাহার ফলে বিদ্বান ও অবিদ্বান এই দুই শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছে। আর যে শিক্ষা তাঁহারা পাইয়াছেন তাহা স্বদেশী শিক্ষা নহে তাহা বিদেশী। ফলে ভেদ ও সংঘর্ষ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

“দ্বিতীয় দুর্ঘটনা এই যে যাঁহাদের ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া হইল তাঁহাদের জীবনমানও উন্নত করা হইল। উহা এ দেশের সভ্যতার বিরোধী। এদেশে বিদ্যা ও জ্ঞানের সহিত ত্যাগ যুক্ত হইয়াছিল এবং ইহা মনে করা হইত যে যাঁহারা বিদ্যালাভ করিতে পারেন নাই তাঁহারা যদি আনন্দ উপভোগ করেন তবে তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। কারণ

তাঁহারা অজ্ঞানী। কিন্তু জ্ঞাণীর ভোগী হওয়া ঠিক নহে। কিন্তু বর্তমান কালের বিদ্বান বিদ্যানন্দ নহেন। তাঁহারা অন্য প্রকারের আনন্দ উপভোগে তৃপ্ত হইয়া থাকেন। বিদ্যার সহিত উচ্চ জীবনমান অর্থাৎ ভোগ ও অর্থকে যুক্ত করা হইয়াছে। ইহাতে বিদ্যার অপমান করা হইয়াছে।

"তৃতীয় দুর্ঘটনা এই যে বিদ্যার সহিত কর্মযোগকে যুক্ত করা হয় নাই। পরিণামস্বরূপ বিদ্বান কর্ম না করিয়াও আনন্দ-ভোগ কামনা করেন ও শরীরশ্রমকে নীচ কাজ বলিয়া ভাবেন। ইহার অর্থ এই যে উৎপাদন করার বুদ্ধি তাঁহাদের নাই, কেবল ভোগ করিবার বুদ্ধি তাঁহাদের আছে।"

আজকালকার শিক্ষক বুদ্ধিজীবী নহেন

শিক্ষকতার কাজে রুচি আছে এমন এক শিক্ষিত যুবকের সহিত অন্য এক ব্যক্তির কাল্পনিক কথোপকথনের বর্ণনা করিয়া বিনোবাজী আজকালকার শিক্ষকের মনোবৃত্তি কিরূপ তাহা পরিষ্কারভাবে দেখাইয়াছেন। ঐ ব্যক্তি মাত্র পড়াইবার কাজ জানেন। পড়ানো ছাড়া জগতের অন্য সব কিছু সম্পর্কে তিনি অনভিজ্ঞ। জীবনধারণের পক্ষে অনিবার্য কোন কাজই তাঁহার জানা নাই। অথচ তাহা শিক্ষা করিবার অভিরুচিও তাঁহার নাই এবং তাহা শিক্ষা করিতেও পারেন না। তিনি যে কোন কাজ জানেন না ইহাতে তাঁহার লজ্জা নাই, বরং তাহাতে তিনি কিছুটা গৌরব ও গর্ব অনুভব করেন। তাহাতে বিনোবাজী বলেন যে আজকার শিক্ষকের অর্থ হইতেছে এই :—

"(১) জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য যে সব কাজের প্রয়োজন তাহার একটিও যিনি করেন না, (২) কোন কাজে নূতন কিছু শিক্ষা করিতে যিনি স্বভাবত অসমর্থ এবং কোনরূপ ক্রিয়াশীলতায় যিনি বিমুখ, (৩) কেবল শিক্ষকতা করিতে পারেন এই দম্ভে যিনি পূর্ণ, (৪) যিনি গ্রন্থকীট এবং (৫) যিনি অলস।"

এরূপভাবে মাত্র বিদ্যালয়ে পড়ানোর কাজ করিয়া যাঁহারা জীবনযাপন করেন তাঁহাদিগকে সাধারণ কথায় 'বুদ্ধিজীবী' বলা হইয়া থাকে। কিন্তু বিনোবাজী বলেন,—

"তাঁহারা বুদ্ধিজীবী নহেন। গৌতম বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য, জ্ঞানেশ্বর প্রভৃতিই বুদ্ধিজীবি অর্থাৎ যাঁহারা বুদ্ধিজীবনের জ্যোতি জাগ্রত করিয়া দেখাইয়াছেন।" তিনি বলেন যে তাঁহারা মৃতজীবি।—

"যিনি ইন্দ্রিয়ের দাস ও যাঁহার দেহের প্রতি তীব্র আসক্তি রহিয়াছে, তিনি বুদ্ধিজীবী হইতে পারেন না। বুদ্ধির পতি হইতেছে আত্মা। পতিকে ত্যাগ করিয়া যে বুদ্ধি দেহ দ্বারের (ইন্দ্রিয়ের) দাসী হইয়াছে সেই বুদ্ধি হইতেছে ব্যাভিচারিণী বুদ্ধি। যাঁহার বুদ্ধি এরূপ ব্যাভিচারিণী তাঁহার জীবন মৃত্যুর মত। যে ব্যক্তি এই ব্যাভিচারিণী বুদ্ধির দ্বারা জীবনধারণ করেন তিনি হইতেছেন 'মৃতজীবী'। কেবল শিক্ষকতা করিয়া যিনি জীবন যাপন করেন তিনি বিশেষ অর্থে মৃতজীবী। কেবলমাত্র শিক্ষাদান কার্যের দ্বারা যাঁহারা জীবনধারন করেন তাঁহা-দিগকে মনু 'মৃতকাধ্যাপক' বা বেতনভোগী-শিক্ষক নাম দিয়াছেন এবং শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ায় তাঁহাদের অংশ গ্রহণ নিষিদ্ধ করিয়াছেন। তিনি ঠিকই করিয়াছেন। কারণ শ্রাদ্ধে তো মৃত পূর্বপুরুষদের স্মৃতি সঞ্জীবিত করিতে হয়। সুতরাং যাহারা প্রত্যক্ষ জীবনকে 'মৃত' করিয়া ফেলিয়াছে শ্রাদ্ধ ক্রিয়ায় তাহাদের কী উপযোগিতা আছে?"

নয়ী তালীমে পূর্ণ-গুণবিকাশের দৃষ্টি

নয়ী তালীমে কোন উপযোগী কাজের মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হয় বলিয়া উহাকে কর্মপ্রধান এবং উহার তুলনায় পুরাতন শিক্ষাকে জ্ঞানপ্রধান বলা হয়। উপরন্তু নয়ী তালীমকে হস্তশিল্পপ্রধান এবং উহার তুলনায় পুরাতন শিক্ষাকে পুস্তকপ্রধান বলা হয়। বিনোবাজী বলেন যে নয়ী তালীমের এই বিশ্লেষণ অপূর্ণ। নয়ী তালীমের উদ্দেশ্য মনুষ্যের পূর্ণ বিকাশ, অর্থাৎ মানুষের পূর্ণ গুণবিকাশ। নয়ী তালীমে কেবল যে কর্মকুশলতা লাভ হয় তাহা নহে,

উহাতে জ্ঞান লাভও হয়। উহাতে কর্মশক্তি ও জ্ঞানশক্তি উভয়ই লাভ হয়। ইহা বলিলেও নয়ী তালীমের পরিপূর্ণ ধারণা দেওয়া হয় না। কারণ মানুষের বহুগুণের মধ্যে কর্মশক্তি ও জ্ঞানশক্তি মাত্র দুইটি। সকল গুণগুলির বিকাশ সাধন করা প্রকৃত-শিক্ষা বা নয়ী তালীমের লক্ষ্য। নয়ী তালীমে এই দুইগুণ ছাড়া অন্যান্য আভ্যন্তরীণ গুণের বিকাশের যে প্রয়োজন তাহা বিনোবাজী কয়েকটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়াছেন। তিনি বলেন,—

"বলা হয় যে আমরা ছেলেদিগকে সুতাকাটা শিখাই এবং তাহার দ্বারা তাহাদের জ্ঞান শিক্ষা দিয়া থাকি। কিন্তু আমাদের কাজ মাত্র ইহা হওয়া উচিত নহে। আমাদের ইহাও দেখিতে হইবে যে উহার দ্বারা ছেলেদের আন্তরিক বিকাশ হইতেছে কিনা। উহাদের আলস্য দূর হইয়াছে কি? উহাদের মধ্যে কি শ্রমশীলতা আসিয়াছে? তাহারা কি সর্বপ্রকারে ভয়শূন্য হইয়াছে? তাহারা কি সত্যবাদী, সংযমী ও সেবাপরায়ণ হইয়াছে? আমাদিগকে এই সমস্ত লক্ষ্য করিতে হইবে।"

বিনোবাজী আরও বলেন যে শিক্ষার মাধ্যমে গুণবিকাশ করাই যে শিক্ষার মুখ্য লক্ষ্য এ সম্পর্কে আরম্ভ হইতেই সজাগ থাকিতে হইবে। নচেৎ পুরাতন শিক্ষাপদ্ধতির দোষ নয়ী তালীমের মধ্যেও প্রবেশ করিবে। যেমন, এত গুণ্ডী সূতা কাটিতে হইবে বলিয়া কোনরকমে তত গুণ্ডী সূতা কাটাইয়া লইলেই যে কাজ হইয়া যাইবে তাহা নহে। দেখিতে হইবে যে তাহার দ্বারা ছাত্রদের মধ্যে আত্মশক্তি প্রকাশ পাইতেছে কিনা। শিক্ষার দ্বারা 'বিনয়' গুণ ছাত্রদের মধ্যে বিকশিত হওয়া চাই। বিনোবাজী বলেন,—

"সংস্কৃতে শিক্ষাকে বিনয় বলা হয়। কারণ বিনয় অন্যান্য গুণের প্রবেশ-দ্বার। উহার দ্বারা অন্যান্য বিকাশও সাধিত হইয়া থাকে।"

যে বিনীত, নম্র সে যেখানে গুণ দেখিতে পাইবে, যেখানে যে জ্ঞান শিক্ষার সুযোগ পাইবে ও যেখানে যাহা কিছু ভাল দেখিবে, তাহাই গ্রহণ করিবে। বিনোবাজী বলেন,—"এই গুণগ্রাহিতা বিনয়ের মুখ্য লক্ষণ।"

সর্বোপরি ছাত্রদের মধ্যে আত্মজ্ঞান জাগ্রত হওয়া চাই। বিনোবাজী বলেন যে—নিজের সত্যস্বরূপ কি তাহার জ্ঞান হইলে তবে তাহা হইবে প্রকৃত শিক্ষা। অর্থাৎ দেহ হইতে আত্মা পৃথক—এই জ্ঞান লাভ হওয়া চাই। আমি দেহ নহি, আমি দেহ হইতে পৃথক, আমি সত্যস্বরূপ,—

এই জ্ঞান হওয়া চাই। আমার শরীর অপরিষ্কার হইতে পারে। কিন্তু তাহাতে 'আমি' অপরিষ্কার হইয়া যাই না—এই জ্ঞানের আভাস ছেলেদের মধ্যে প্রবেশ করাইতে পারিলে তাহাদের মধ্যে আত্মজ্ঞান জাগ্রত করার ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতে পারে। কিভাবে তাহা করা যাইতে পারে তাহা বিনোবাজী বুঝাইয়াছেন। তিনি বলেন,—

"যদি কাহাকেও অপরিচ্ছন্ন দেখা যায় তবে তাহাকে আমি ইহা বলিব —তুই তো পরিচ্ছন্ন, কিন্তু তোর শরীরে একটু ময়লা লাগিয়া গিয়াছে। তুই ওটা সাফ করে ফেল।"

এইভাবে মানুষের অন্তর্নিহিত সমস্ত গুণের বিকাশ সাধন করাই নয়ী তালীমের লক্ষ্য।

জ্ঞানলাভের উপায় ও লক্ষণ

ছাত্র নিজেই জ্ঞান অর্জন করিবে। কেহ তাহার উপর জ্ঞান চাপাইয়া দিবে না। শিক্ষকের প্রধান কাজ হইবে ছাত্রের মনে জ্ঞানের পিপাসা উদ্রেক করা। জ্ঞানপিপাসা জাগ্রত হইলে ছাত্র স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া জ্ঞান আহরণ করিতে থাকিবে। ইহাই জ্ঞানদানের প্রকৃত উপায়। যদি এইভাবে জ্ঞানার্জন করা হয় তবে প্রকৃত জ্ঞানলাভ হইতে পারে। এইভাবে জ্ঞান অর্জিত হইলে ছাত্রের ব্যক্তিত্বের প্রকৃত বিকাশ সাধিত হইবে। জ্ঞানলাভের লক্ষণ ছাত্রের মুখের ভাবে প্রকাশ পাইবে। গুরু-নিরপেক্ষভাবে শিষ্য নিজের কর্তব্য সম্পাদন করিতে করিতে জ্ঞানলাভ করিতেছে, এরূপ দৃষ্টান্ত উপনিষদে বর্ণিত আছে। ছাত্র গুরুগৃহে বিদ্যা-লাভের জন্য গেল। গুরু তাহাকে গরু চরাইবার কাজ দিলেন। শিষ্য গরু চরাইবার কাজ করিতে করিতে জ্ঞানলাভ করিতে লাগিল। গাভী বা বলদ হইতে তাহার জ্ঞানলাভ হইতে লাগিল। বনের মধ্যে গরু চরাইতে হইত। সেখানে পক্ষীকুল হইতে এবং কখন বা বনের বৃক্ষরাজি হইতে তাহার জ্ঞানলাভ হইতে লাগিল। এইভাবে তাহার জ্ঞানলাভ হওয়ার ফলে তাহার মুখের ভাব তেজঃপূর্ণ হইয়া উঠিল। গুরু তাহার

মুখের ভাব দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার শিষ্যের জ্ঞানলাভ হইয়াছে। উপনিষদের এই বর্ণনার অর্থ এই যে, কার্য সম্পাদন করিবার প্রয়োজনেই জ্ঞানের প্রয়োজন হয় এবং তখন নিজে নিজেই সেই জ্ঞান অর্জন করিতে পারা যায়। কাজ করিবার সময় প্রকৃতির সৃষ্টির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হইয়া যায় ও প্রকৃতি হইতে বিবিধ প্রকারের জ্ঞানলাভ হয়। নয়ী তালীমেও অনুরূপভাবে শিক্ষালাভ হইয়া থাকে। ছাত্রেরা নিজেরা চাষ-আবাদ করিয়া খাদ্যশস্যাদি ও তরিতরকারী উৎপাদন করে। সূতাকাটা হইতে বস্ত্র বয়ন পর্যন্ত প্রত্যেক কার্য নিজেরা করিয়া বস্ত্র উৎপাদন করে। তাহারা নিজেদের হাতে গম, জোয়ার ভাঙ্গিয়া আটা প্রস্তুত করে, নিজেরা ধান ভানিয়া চাউল প্রস্তুত করে। তাহারা রান্না ও ঘরের সব কাজ নিজেরা করিয়া লয়। তাহারা রোগীদের সেবা করে। কোন কোন স্থানে তাহারা ঘানি চালাইয়াও তৈল উৎপাদন করিয়া লয়। কোন কোন স্থানে মাটির জিনিসপত্রও নিজেরা তৈয়ারি করে। তাহারা জমাখরচ নিজেরা লিখিয়া থাকে। এইসব কাজ করিতে করিতে তাহারা নানারূপ জ্ঞানলাভ করিতে থাকে। উপরে উপরে দেখিলে মনে হইবে যে ছেলেরা কেবল কাজ করিতেছে। কিন্তু তাহা নহে। তাহারা ভিতর হইতে জ্ঞানলাভও করিতেছে। নয়ী তালীমের সকল কেন্দ্রে এতটা নাও হইতে পারে। কিন্তু সেবাগ্রাম প্রভৃতি দুই-চারিটি কেন্দ্রে নমুনাস্বরূপ যে এরূপ হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, এই শিক্ষায় কর্ম ও জ্ঞানের সমন্বয় হইয়া যায়। কর্মের মাধ্যমে জ্ঞানলাভ হয় এবং জ্ঞানের মাধ্যমে কর্ম সম্পন্ন হয়। জ্ঞান ও কর্মের মিলনের ফলে চিত্তের বিকাশ হয়। তাই বিনোবাজী বলিয়াছেন—,

"আমাদিগকে ছাত্রদের উপর জ্ঞান চাপাইতে হইবে না। তাহাদের মধ্যে জ্ঞানের পিপাসা জাগ্রত করিতে হইবে এবং জ্ঞান অর্জন করিবার শক্তি উৎপন্ন করিতে হইবে।"

বুদ্ধি তেজস্বী হইলে তবেই জ্ঞানলাভ করিবার শক্তি উৎপন্ন হয়। বুদ্ধিকে তেজস্বী করিবার উপায় কি? বিনোবাজী বলেন,—

"উন্মুক্ত বাতাসে কিছু দৈহিক পরিশ্রম করা বুদ্ধি তেজস্বী কারবার প্রধান উপায় বলিয়া মনে করি। উত্তপ্ত ভূমি যেরূপ বৃষ্টির জন্য উন্মুখ

হইয়া থাকে, শ্রমের ফলে বুদ্ধিও সেইরূপ জ্ঞান গ্রহণ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া থাকে।"

এইভাবে জ্ঞান অর্জিত হইলে তাহা মানুষের ব্যক্তিত্বের অঙ্গীভূত হইয়া যায়। ক্ষুধার্ত মানুষ খাদ্য গ্রহণ করিলে তাহা ঠিকমত পরিপাক হইয়া রস-রক্তে পরিণত হয় ও দেহে মিশিয়া যায়। তাহার ফল তাহার সমগ্র দেহে ও চোখেমুখে প্রকাশ পায়। কি প্রকারের কি পরিমাণ খাদ্য হইয়াছে—ইহা বিচার্য নহে। খাদ্য খাইয়া কি ফল হইয়াছে তাহাই বিচার্য। জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে কোন্ জ্ঞান কতটা শিখিল—ইহা বিচার্য নহে। যে জ্ঞান ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে তাহার দ্বারা শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের কোন উন্নতি সাধিত হইয়াছে কিনা তাহাই বিচার্য। উহা ছাত্রের দেহে ও মুখচোখের ভাবে প্রকাশ পাইবে। এজন্য বিনোবাজী পরীক্ষা-প্রথাকে আদৌ পছন্দ করেন না। পরীক্ষার জন্য যে জ্ঞান অর্জন করা হয় তাহা গভীর রেখাপাত করে না। খাদ্য ঠিকমত পরিপাক না হইলে যে অবস্থা হয়, এক্ষেত্রেও সেরূপ হয়। তাই বিনোবাজী বলেন,—

"সুতরাং নিজের অভিজ্ঞতার ফলে আমি পরীক্ষাকে কোন মূল্য দেই না। পেট পরিষ্কার করিবার জন্য যেরূপ জোলাপের আবশ্যক হয়, পরীক্ষাও ঠিক সেইরূপ হইয়া থাকে। পরীক্ষা দেওয়া হইলেই সমগ্র জ্ঞান নিঃশেষ হইয়া যায়। এজন্য শিক্ষাবিজ্ঞানের দ্বারা রচিত এই পরীক্ষার ছলনায় পড়িবার কোন প্রয়োজন নাই।"

প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিতে হইলে উপযুক্ত জ্ঞান আহরণ করিতে হইবে এবং যে জ্ঞান আবশ্যক নহে তাহা বর্জন করিতে হইবে। আর অনাবশ্যক জ্ঞান যদি কিছু গ্রহণ করা হয়ও তবে তাহা ভুলিয়া যাইতে হইবে। জগতে অসীম জ্ঞানের ভাণ্ডার পড়িয়া রহিয়াছে। একজন মানুষ যদি সবই আয়ত্ত করিতে চায় তবে সে তো পাগল হইয়া যাইবে। এজন্য অনেক বিষয় এড়াইবার প্রয়োজন আছে। সুতরাং প্রকৃত জ্ঞানলাভের জন্য জ্ঞান ও অজ্ঞান উভয়েরই প্রয়োজন আছে। এইজন্য ঈশোপনিষদে অজ্ঞান ও অবিদ্যার মহিমা কীর্তন করা হইয়াছে। কেবলমাত্র জ্ঞান অর্জনে রত থাকিলে তাহার ফল অন্ধকারময়। অন্যদিকে আদৌ জ্ঞানলাভ না করা অর্থাৎ কেবল অজ্ঞান বা অবিদ্যাও অন্ধকারময়। প্রকৃত জ্ঞানলাভের উপায় হইতেছে

জ্ঞান ও অজ্ঞান—উভয়কে গ্রহণ করা। বিদ্যা ও অবিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান ও ও অজ্ঞান উভয়ের সংযোগে অমৃতত্ব লাভ হয়। বিনোবাজী জ্ঞানপ্রাপ্তি সম্পর্কে আরও একটি কথা বলিয়াছেন—

"ছাত্র যাহা পুনঃ পুনঃ পড়িয়া মুখস্থ করিয়া রাখে তাহা যদি ঠিক সেইরূপ আবৃত্তি করে, তবে তাহা আমার পছন্দ হয় না। উহাকে আমি গ্রামোফোন বলিয়া থাকি। উহা তো যন্ত্র হইয়া গেল। আমি তাহাকে চেতন বলিতে পারি না। চেতন হইলে কিছু ছাড়িয়া দিত ও কিছু যোগ করিত।

"বিদ্যাং অবিদ্যাং চ যস্ তস্ বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥"

"বিদ্যা ও অবিদ্যা—এই উভয়ের সংযোগে যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন তিনি অবিদ্যার দ্বারা মৃত্যুর হাত হইতে মুক্তি পাইয়া বিদ্যার দ্বারা অমৃত লাভ করেন।"

নয়ী তালীম পদ্ধতি নহে বিচার

কয়েকটি স্থানে, বিশেষ করিয়া সেবাগ্রামে নয়ী তালীমের পরীক্ষামূলক যে কার্য চলিয়াছে, তাহার যাহা কিছু ফল পাওয়া গিয়াছে, তাহা নয়ী তালীমের নমুনা স্বরূপ দাঁড়াইয়াছে। ভারতের সকল প্রদেশ হইতে শিক্ষার্থীরা সেবাগ্রামে আসিয়া নয়ী তালীমের শিক্ষালাভ করিয়াছে। কিন্তু হুবহু ঐ নমুনা অনুসারে সর্বত্র কাজ চালাইতে হইবে এরূপ যেন মনে করা না হয়! এরূপ করিলে উহা এক তন্ত্রে পরিণত হইবে। তন্ত্র হইয়া দাঁড়াইলে উহা এক বিপজ্জনক জিনিস হইয়া পড়িবে। উহা প্রাণহীন হইয়া যাইবে। সুতরাং তালীমী সঙ্ঘের দ্বারা সেবাগ্রামে যে অভিজ্ঞতালব্ধ ফল পাওয়া গিয়াছে সেই নমুনাকে পথপ্রদর্শকরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। উহার ফলাফল সম্পর্কে চিন্তা করা চাই। বুদ্ধি স্বাধীন থাকা চাই এবং প্রত্যেক স্থানে স্বতন্ত্র পরীক্ষা হওয়া চাই। তবেই উহা জীবনীশক্তিসম্পন্ন হইয়া থাকিবে এবং উত্তরোত্তর উহার বিকাশ হওয়া সম্ভব হইবে। উহা যেন

তন্ত্র বা বিশিষ্ট পদ্ধতিস্বরূপ গড়িয়া না উঠে। কারণ নয়ী তালীম এক বিচার। বিনোবাজী বলেন,—

"ভারতবর্ষ প্রাচীনকালে ব্রহ্মবিচার লাভ করিয়াছিল। তাহা এক ব্যাপক বিচার। তাহা হইতে অদ্বৈত উপাসনার উদ্ভব হয় এবং দ্বৈত উপাসনারও উদ্ভব হয়। বিশিষ্ট অদ্বৈত উপাসনার উদ্ভব হয় এবং শুদ্ধ অদ্বৈত উপাসনারও উদ্ভব হয়। যেমন ঐ এক ব্যাপক ব্রহ্মবিচার হইতে কয়েক প্রকার উপাসনার উদ্ভব হইয়াছে সেইরূপই ইহা এক ব্যাপক শিক্ষাবিচার। এই ব্যাপক শিক্ষণবিচার বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইতে হইতে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু উহাদের মূল একই থাকিবে।"

নয়ী তালীমের পশ্চাতে ত্রিবিধ নিষ্ঠা

বিনোবাজীর বিচারে নয়ী তালীমের পক্ষে যে ত্রিবিধ নিষ্ঠা একান্ত আবশ্যক তাহা হইতেছে :—(১) অহিংসা, (২) বিচারের ব্যাপকতা ও সেবাক্ষেত্রের বিশিষ্টতা ও (৩) উৎপাদক শ্রম-আধারিত জীবনযাত্রা।

(১) **অহিংসা**—শুধু বিচারে বা ভাবনায় অহিংসা পছন্দ করিলে বা অহিংসার প্রতি প্রেম থাকিলে চলিবে না। ব্যবহারে অহিংসা প্রকট হওয়া চাই এবং অন্তিম ব্যবহারে পর্যন্ত উহা প্রকট থাকা চাই। জগতে এমন কেহ নাই যিনি অহিংসা পছন্দ করেন না বা অহিংসার প্রতি যাঁহার প্রেম নাই। কিন্তু অন্তিম শ্রদ্ধা কোথায় তাহা দেখা দরকার। তবেই বুঝা যাইবে অহিংসার প্রতি যথার্থ প্রেম আছে কিনা। দেখা যায় প্রথম ব্যবহারে অহিংসার প্রয়োগ করা হয়, কিন্তু তাহা সফল না হইলে পরবর্তী ব্যবহারে অহিংসা বর্জন করা হয়। অর্থাৎ অন্তিম শ্রদ্ধা আজও হিংসার উপর রহিয়াছে এরূপ দেখা যায়। গৃহে, রাষ্ট্রে, সমাজে ও অন্তঃরাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে এরূপ চলিতেছে। এজন্য বিনোবাজী বলেন,—

"এই বিচার আজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে চালু রহিয়াছে। গৃহে উহা (হিংসা) তাড়না, গভর্ণমেণ্টের ব্যাপারে উহা দণ্ড, সমাজে উহা

বহিষ্কার এবং অন্তঃরাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে উহা সেনার রূপ গ্রহণ করে। গৃহ হইতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রের সমস্যার প্রতিকারের জন্য অন্তিমে হিংসারই আশ্রয় লওয়া হয়।”

মাতা-পিতা ছেলেকে বুঝায়। না বুঝিলে ধমকায় বা প্রহার করে। উহাতে যে ছেলের প্রতি প্রেম থাকে এবং ছেলের ভাল হউক এই ভাবনা থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু না বুঝিলে যদি তাড়না বা প্রহার করা হয় তবে ছেলের পক্ষে বুঝিতে পারা আরও কঠিন হইয়া পড়ে। ইহা উপলব্ধি করা উচিত। বুঝাইবার পক্ষে যদি কোন অকেজো উপায় থাকে তবে তাহা হইতেছে তাড়না। শিক্ষা সম্পর্কে ঐ একই নীতি প্রযোজ্য। প্রেম শুধু ছেলের প্রতি থাকিলে চলিবে না, শেষ পর্যন্ত প্রেম ও শ্রদ্ধা, অহিংসা ও অহিংস সাধনের প্রতি থাকা চাই। তবে অহিংসা পছন্দ করা হয় কিনা তাহার প্রকৃত পরীক্ষা হইবে। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে যেখানে অহিংস প্রণালীর প্রতি শ্রদ্ধা থাকে সেখানে শেষ পর্যন্ত কি করিতে হইবে তাহা বুঝা চাই। বিনোবাজী তাহা পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়াছেন। তিনি বলেন :—

“যেখানে অহিংসার প্রতি শ্রদ্ধা থাকে সেখানে ছেলে যদি বুঝিতে না পারে তবে তাহাকে অধিক প্রেমের সহিত বুঝানো হয়। তাহাতেও বুঝিতে না পারিলে আরও অধিক সৌম্য উপায়ে বুঝানো হয়। এইভাবে সৌম্যতম উপায় পর্যন্ত যাওয়া হয়। মারপিট করিয়া যে কাজ হইতে পারিবে না তাহা প্রেমপূর্বক সেবা করিলে হইতে পারে। এবং তাহাতে না হইলে উহার জন্য প্রেমপূর্বক অধিক ত্যাগ করিলে নিশ্চয় হইবে। এই প্রকারের ফল যাহাতে হয় সেজন্য উত্তরোত্তর সৌম্য উপায় এবং অবশেষে সৌম্যতম উপায় নিশ্চয়ই কার্যকরী হইবে। এই প্রকার শ্রদ্ধা পোষণ করিবার নাম অহিংসা।”

বিনোবাজী এই কথা সমগ্র সমাজের জন্য বলিতেছেন। রাষ্ট্রক্ষেত্রে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, সামাজিক ক্ষেত্রে, পরিবারের মধ্যে সর্বত্র এই নিয়মে চলা উচিত। ভূদানযজ্ঞের ক্ষেত্রেও তিনি এই কথা বলিতেছেন এবং নিজেই উহার প্রয়োগ করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন,—

“আজ আমি ভূদানযজ্ঞের জন্য ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রেমের সহিত লোককে বুঝাইতেছি। লোকে জিজ্ঞাসা করে ‘যদি উহতে ফল না হয় তবে কোন

উগ্র উপায় অবলম্বন করা হইবে কি?' যদি তাহাতেও না হয় তবে আরও তীব্র উপায়ের কথা ভাবা হয়। অহিংসার গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়াও এরূপ চিন্তা করা হয়। অহিংসার অর্থ কাহাকেও মারপিট না করা। কিন্তু এরূপ চিন্তা করা হয় যে এই কাজের জন্য অধিকাধিক তীব্র উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। আমি ইহাকে হিংসক চিন্তা বলিয়া গণ্য করি। অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপারে এরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু অহিংসার ক্ষেত্রে ঐরূপ হইলে উহা নামে মাত্র অহিংসা হইবে। ঐ অহিংসা বিচারসহ হইবে না। এজন্য অহিংসায় সৌম্য, সৌম্যতর ও সৌম্যতম এরূপ ক্রমে উপায় সম্বন্ধে চিন্তা করিবার রীতি হওয়া উচিত। অহিংসার অর্থ কেবলমাত্র মারপিট না করা নহে। তাহা হইলে তো ইহা এক নেগেটিভ (অভাবাত্মক) বস্তু হইয়া যায়। অহিংসায় চিন্তন প্রক্রিয়াই ভিন্ন—এই কথা আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত।"

(২) **বিচারের ব্যাপকতা ও সেবাক্ষেত্রের বিশিষ্টতা**—মনুষ্যের হস্ত, পদ, কর্ণ, চক্ষু প্রভৃতির শক্তির একটা সীমা আছে। এজন্য মনুষ্য তাহার আশপাশে প্রত্যক্ষভাবে কার্য করিতে পারে এবং প্রত্যক্ষ সেবা-কার্যও করিতে পারে। প্রত্যক্ষ সেবাকার্যের ক্ষেত্র সীমাহীন ভাবে বিস্তৃত হইতে পারে না। কিন্তু মানুষের চিন্তনশক্তির এরূপ কোন সীমা থাকে না। মানুষের চিন্তন বিশ্বব্যাপক হইতে পারে। কিন্তু তাহার বিশ্বব্যাপক চিন্তন ও তাহার সীমাবদ্ধ প্রত্যক্ষ কার্যের মধ্যে যেন কোন বিরোধ না থাকে। উহাই আমাদের জীবন-আদর্শ হওয়া উচিত। এজন্য বিচারের দিক হইতে আমাদের আদর্শ বিশ্বহিত হওয়া উচিত। সুতরাং তাহা বিশ্বব্যাপী হইবে কিন্তু আমাদের প্রত্যক্ষ সেবাকার্যের ক্ষেত্র হইবে সঙ্কুচিত এবং উহা বিশ্বহিতের অবিরোধী হওয়া চাই। তাই বিনোবাজী বলেন,—

"আমরা আশপাশের লোককে এরূপ ভাবে সেবা করিব যাহাতে দূরের লোকের কোনও ক্ষতি না হয়। বরং তাহাদের হিত হয়। বিশ্বহিতে অবিরোধ ও আশপাশের লোকের সেবা—ইহা আমাদের জীবনের রহস্য।"

মহাপুরুষদের জীবনধারা এইরূপই হইয়াছে ও হইয়া থাকে। ভগবান বুদ্ধের সেবাক্ষেত্র ছিল ভারতবর্ষ, কিন্তু তাঁহার বিচার তো ছিল

'জয়-জগৎ'। নয়ী তালীমে মানুষকে এই আদর্শে গড়িয়া তুলিবার ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। তবেই নয়ী তালীমের সার্থকতা। এজন্য বিনোবাজী বলেন :—

"বিচারে ব্যাপকতা ও কর্মযোগে বিশিষ্টতা ইহা নয়ী তালীমের দ্বিতীয় নিষ্ঠা।"

(৩) **শ্রম-আধারিত জীবন**—যে নূতন সমাজ রচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য সে সমাজে প্রত্যেকেই তাহার নিজের শরীর পোষণের জন্য শরীর-শ্রম করিবে। বর্তমান সমাজে কেহ যদি সততার সহিত বৌদ্ধিক কাজ করিয়া জীবন যাপন করে তবে তাহাকে সৎ মনুষ্য বলিয়া গণ্য করা হয়। সমাজে আজ কেহ উকীল, কেহ ব্যবসায়ী কেহ অধ্যাপক, কেহ মন্ত্রী, কেহ কৃষক ইত্যাদি। এসব কাজ সমাজের পক্ষে হিতকর সন্দেহ নাই। এই সব কাজ সততার সহিত করিলে তাহাকে সজ্জন ও সেবক বলিয়া গণ্য করা হয়। ইহাতে দোষ নাই। কিন্তু শুধু পুরাতন সমাজের এই আদর্শ অনুসারে মানুষ গড়িয়া তোলা নয়ী তালীম-এর ব্রত নহে। উহার ব্রত হইল নূতন সমাজ রচনার জন্য এমন মানুষ গড়িয়া তোলা, যাহার আদর্শ হইবে সমাজে অন্য কাজ যাহা করা হয় হউক, কিন্তু প্রত্যেকের নিজ শরীর রক্ষা ও পোষণের জন্য উৎপাদক শ্রম করা। নচেৎ তাহাকে অন্যকে শোষণ করিয়া জীবনধারণ করিতে হইবে। যীশুখৃষ্ট ইহাকে 'ব্রেড লেবার' এবং ভগবত গীতা ইহাকে 'যজ্ঞ' নাম দিয়াছেন। বিনোবাজী ইহাকে তাঁহার সাম্যসূত্রে 'শ্রমসঞ্জাত বারিনা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বিনোবাজী বলেন,—

"যিনি এই তত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করিবেন না তিনি নয়ী তালিমকেও সম্পূর্ণভাবে মানিবেন না। কোন শ্রমশিল্পের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া তো শিক্ষা-পদ্ধতির একেবারেই মামুলী বিষয়। কিন্তু যদি শরীর শ্রমের দ্বারা আমাদের জীবিকা উপার্জন না করি তবে তাহাতে আমাদের অন্যের কাঁধের উপরে বসিয়া জীবন নির্বাহ করা হইবে। সে ক্ষেত্রে আমরা হিংসা হইতে মুক্ত হইতে পারিব না। নয়ী তালীমের মূলে এই বিচার রহিয়াছে।"

জ্ঞানলাভে সমাজ-সেবা ও প্রকৃতি নিরীক্ষণ

এখনও পর্যন্ত অনেকে মনে করেন যে শিক্ষক ও ছাত্র যদি কোন সমাজ সেবার কাজ করেন, তবে শিক্ষক ও ছাত্ররূপে তাঁহাদের কর্তব্যচ্যুতি ঘটে। অর্থাৎ উহাতে ছাত্রের শিক্ষালাভ ও শিক্ষকের শিক্ষাদানে ক্ষতি হয়। এজন্য শিক্ষকগণ বা ছাত্রদের পক্ষে ভূদানযজ্ঞের কাজ করা ঠিক হইবে না এরূপ মনে করা হয়। ইহা ভুল বিচার। সমাজ-সেবার কাজে বহু মূল্যবান জ্ঞানলাভ করা যায়। সমাজ-সেবার কাজে যে সময় ব্যয়িত হয় তাহাতে বিদ্যালয়ের কাজে কিছু ক্ষতি হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু সমাজ-সেবার কাজে যে জ্ঞান লাভ হয় তাহার দ্বারা সেই ক্ষতি তো পুরণ হয়ই উপরন্তু অধিক কিছু জ্ঞান লাভ হয়। এজন্য শিক্ষার দৃষ্টিতে শিক্ষক ও ছাত্রদের পক্ষে ভূদান-গ্রামদানের কাজে অংশ গ্রহণ করা কর্তব্য। গ্রামে গিয়া লোককে বুঝাইলে যদি কাজ হয় তবে শিক্ষকের পক্ষে গ্রামে না যাওয়া ও লোকজনকে না বুঝানো নিষ্ঠুরতা ও আলস্যের পরিচায়ক। এজন্য এই প্রসঙ্গে বিনোবাজী বলিয়াছেন,—

> "নিষ্ঠুর এইজন্য যে গরীবদের কাজে একটু কষ্ট স্বীকার করিলে কার্যোদ্ধার হইয়া যায়। তাহা সত্ত্বেও ঐটুকু করিবার জন্য আমরা প্রস্তুত নহি। আর আলস্য এইজন্য যে, যে ক্ষেত্রে একটু ঘোরাঘুরি করিলে হয়, একটু পরিশ্রম করিলে হয়, সেক্ষেত্রে সেইটুকুও পরিশ্রম করিতে আমরা রাজি হই না। ইহা ছাড়া উহাতে শিক্ষণ দৃষ্টির অভাব আছে বলিয়া ধরা যাইবে।"

শিক্ষকের পক্ষে সমাজ-সেবার আবশ্যকতা

নয়ী তালীমের লক্ষ্য এই যে গ্রামের সমস্ত ছেলেমেয়েকে বুনিয়াদী শিক্ষা দিতে হইবে। কিন্তু আজ সাধারণ গ্রামের অবস্থা এরূপ যে বহু ছেলেমেয়েকে অভুক্ত বা অর্ধভুক্ত অবস্থায় বিদ্যালয়ে আসিতে হয়। কিংবা ঐ কারণে তাহারা বিদ্যালয়ে আসিতেই পারে না। এই অবস্থায় তাহাদিগকে কি শিক্ষা দেওয়া যাইবে? যাহাদের পেটে অন্ন নাই তাহাদিগকে সুসম খাদ্য গ্রহণ করিবার বা পর্যাপ্ত দুগ্ধ পান করিবার উপকারিতা সম্বন্ধে শিক্ষাদান করা লজ্জাকর ব্যাপার। এজন্য ভূদান-গ্রামদানের কাজে সহযোগিতা করা

শিক্ষকদের কর্তব্যের অঙ্গ বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত ; কারণ ভূদান-গ্রামদানের দ্বারা ক্ষুধার্তের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা হইবে।

গ্রামদানী গ্রাম নয়ী তালীমের অনুকূল ক্ষেত্র

গ্রামদানী গ্রাম নয়ী তালীমের প্রয়োগের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী ক্ষেত্র হইবে। এজন্য ভূদান ও গ্রামদান আন্দোলনের সহিত নয়ী তালীমের ঘনিষ্ট সম্পর্ক। তাই বিনোবাজী নয়ী তালীমের শিক্ষকগণকে গ্রামদান সংগ্রহ করিবার ও গ্রামদান হইলে তথায় নয়ী তালীম প্রবর্তন করিবার উপদেশ দেন। তিনি তামিলনাদের কালুপট্টি আশ্রমের মুখ্য কর্মী গুরুস্বামীকে (নয়ী তালীমের শিক্ষক) এ সম্পর্কে নিম্নরূপ উপদেশ দেন :

"আজ আমি গুরুস্বামীর কাছে এই নিবেদন করিয়াছি যে আপনি গ্রামদান সংগ্রহ করিতে থাকুন এবং যে সব গ্রামদান পাওয়া যাইবে সেখানে নয়ী তালীম চালাইবার ব্যবস্থা করুন। তাহা হইলে সেই শিক্ষা অত্যন্ত তেজস্বী ও সার্থক হইবে। ইহাতে আপনি গ্রামের সব লোকের সহযোগিতা লাভ করিবেন। গ্রামের ছেলেমেয়েদের ভিতর উৎসাহের সঞ্চার হইবে এবং সরকারের নিকট হইতে সহায়তা পাওয়াও সহজ হইবে। গ্রামদানী গ্রামে নয়ী তালীম সবদিক হইতে খুবই ভালভাবে চলিবে। আমি আরও অগ্রসর হইয়া বলিয়া থাকি যে যদ্যপি সরকারের নিকট হইতে কিছুমাত্র সাহায্য পাওয়া না যায়, এমন কি যদি সরকারের বিরোধিতা থাকে, তথাপি গ্রামদানী গ্রামে নয়ী তালীমের বিকাশ হইবে। কেন না যেখানে গ্রামদান হইয়াছে সেখানে গ্রামশক্তি জাগ্রত হইয়াছে। সেই গ্রামশক্তির ভিত্তিতে নয়ী তালীম খুব ভালভাবে চলিবে। এজন্য আপনারা এই কাজে যোগদান করুন। এই কথা আমি নয়ী তালীমের আচার্য হিসাবে বলিতেছি, ভূদানকর্মী হিসাবে নহে। ইহাতে নয়ী তালীম খুব শক্তিশালী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমি আশা করি, আপনারা এই বিচার সম্পর্কে চিন্তন-মনন করিবেন।"

শিক্ষায় প্রকৃতি নিরীক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

ছাত্রছাত্রীদের বাহিরের প্রকৃতির সহিত যোগাযোগ থাকা উচিত। তাহাতে প্রকৃতি নিরীক্ষণ করিতে করিতে তাহাদের বহু মূল্যবান শিক্ষালাভ

হইবে। কিন্তু বহু শিক্ষাকর্তৃপক্ষ এরূপ মনে করেন যে ছাত্রছাত্রীরা শ্রেণী প্রকোষ্টে বসিয়া থাকিবার সময় যদি তাহাদের দৃষ্টি ঐ ঘরের বাহিরে যায় তবে তাহা তাহাদের শিক্ষার পক্ষে বাধক হইবে। এজন্য কোন কোন বিদ্যালয় গৃহে জানালা এত উচ্চে বসানো হয় যাহাতে ছাত্রছাত্রীদের দৃষ্টি বাহিরে যাইতে না পারে। বিনোবাজী নিজে এরূপ একটি বিদ্যালয় গৃহ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারেন যে তাঁহাদের ম্যানুয়ালে এরূপ লেখা আছে যে বিদ্যালয় গৃহ এরূপ হওয়া চাই যাহাতে ছেলেমেয়েদের দৃষ্টি বাহিরের দিকে যাইতে না পারে। ছেলেমেয়েদের চিত্ত স্থির রাখিবার জন্য এরূপ ব্যবস্থা প্রয়োজন। তাহাতে বিনোবাজী পরিহাসছলে বলেন যে তাহা হইলে তো ছেলেমেয়েদের জন্য পাঠকক্ষে কিছু বিছানা রাখিয়া দিলে তাহাদের চিত্ত স্থির রাখার পক্ষে আরও সুবিধা হয়। উপরন্তু এমন স্কুল-গৃহ আছে যাহার দেওয়ালে নানারূপ বন্য জন্তুর চিত্রও অঙ্কিত থাকে। অথচ বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের বাহিরের জন্তু-জানোয়ার দেখিতে দেওয়া হয় না। উহাদের চিত্র দেখাইয়া শিক্ষাদান করা হইয়া থাকে। ইহা হাস্যকর ব্যাপার। মোট কথা, ছাত্রদের প্রকৃতির সংস্পর্শে আসিয়া প্রকৃতি নিরীক্ষণ করিবার যথেষ্ট সুযোগ থাকা চাই।

নয়ী তালীম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা

নয়ী তালীমে মূল হস্তশিল্পের বিভিন্ন ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার সহিত বিভিন্ন প্রকার জ্ঞানের সংযোগ সাধন করত শিক্ষাদান করা হইয়া থাকে। পূর্বে বলা হইয়াছে যে কর্মের সহিত জ্ঞানের ঐ সংযোগের নাম 'অনুবন্ধ'। নয়ী তালীমে প্রত্যেক ক্রিয়ার সহিত কেমন করিয়া জ্ঞানের সংযোগ সাধন করানো যায় তাহা খুঁজিয়া বাহির করা ও তদনুসারে শিক্ষাদান করা এক প্রধান কাজ। সুতরাং বিনা প্রসঙ্গে বা বিনা অনুবন্ধে কোন কিছু শিখাইবার চেষ্টা করা উচিত নহে, ইহা নয়ী তালীমের এক প্রধান নীতি বলিয়া গণ্য করা হয়। কিন্তু এমন কিছু কিছু বিষয় আছে, যাহার সাক্ষাৎ সংযোগ বা অনুবন্ধ আপাত-দৃষ্টিতে কোন হস্তশিল্পের প্রক্রিয়া বা অন্য কোন কর্মপ্রচেষ্টার সহিত করা যায় না বটে, কিন্তু তাহা নয়ী তালীমের পক্ষে অপরিহার্য এবং তাহা সমস্ত শিক্ষা

ব্যবস্থার বুনিয়াদস্বরূপ। কর্মের সহিত তাহার সাক্ষাৎ অনুবন্ধ না থাকিলেও তাহা একান্তভাবে শিক্ষণীয় বিষয়। যেমন শ্লোক কণ্ঠস্থ করা। সুনির্বাচিত কিছু কিছু উত্তম শ্লোক ছাত্রের কণ্ঠস্থ করিয়া রাখা প্রয়োজন। আমাদের সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ বিচারসমূহ বিভিন্ন শ্লোকের মধ্যে সন্নিবদ্ধ রহিয়াছে। যদি ঐসকল শ্লোক আমাদের কণ্ঠস্থ থাকে তবে তাহাতে জীবনে কতই না লাভ হয়। জীবনে সময় সময় এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হইতে পারে, যখন মহাপুরুষদের অভিজ্ঞতালব্ধ বিচারপূর্ণ শ্লোকই আমাদের পথ দেখাইতে পারে ও আমাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল হইতে পারে। আমাদের জীবনে বুদ্ধির স্থান আছে, সেবিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভাবের স্থানও অপরিহার্য। বিনোবাজী বলেন,—

"এই বিষয় সম্পর্কে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাবিদদের ও আমাদের অনুভূতির মধ্যে পার্থক্য আছে। তাঁহারা বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে দেখিয়া থাকেন। তাঁহারা জগতকে খণ্ড খণ্ড করিয়া বিভক্ত করেন এবং উহাকে বিভিন্ন শাখায় ভাগ করেন। কিন্তু আমরা সারা জগতকে সমগ্ররূপেই দেখিয়া থাকি। এবং তাহার দ্বারা উহার অদ্বৈত স্বরূপ চিনিয়া লই। এখানকার ও ওখানকার পদ্ধতির মধ্যে এই প্রভেদ রহিয়াছে।"

বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতির জন্য বুদ্ধি খাটাইবার আবশ্যকতা বেশী হয় আর সমগ্র দৃষ্টিতে বিচার করার পদ্ধতিতে ভাবনার প্রয়োজন বেশী হইয়া থাকে। এই সব ভাবাত্মক শ্লোকের সহিত আমাদের হস্তশিল্পের সাক্ষাৎ কোন সংযোগ বা অনুবন্ধ না থাকিলেও আমাদের জীবনের প্রত্যেক কর্ম প্রচেষ্টাকে যে উহা শক্তিদান করে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিনোবাজী বলেন,—

"মনুষ্যের মধ্যে একই আত্মা বিরাজমান। ঐ আত্মার শক্তিতে দেহ শক্তিমান হইয়া থাকে। কেবল দেহে শক্তি নাই। আত্মা হইতে দেহ পৃথক হইয়া পড়িলে যে দেহ থাকে তাহাকে দেহ বলা হয় না। তাহাকে 'শব' বলা হয় এবং তাহার সৎকার শ্মশানেই হইয়া থাকে। আত্মাযুক্ত দেহে কর্তৃত্ব-শক্তি থাকে। অতএব আত্মার বিকাশের জন্য কিছু উত্তম শ্লোক কণ্ঠস্থ রাখা প্রয়োজন বলিয়া মনে করি।"

কেহ কেহ নয়ী তালীমের ব্যাপারে কেবলমাত্র অনুবন্ধ লইয়াই ব্যাপৃত

থাকেন এবং তাহাতেই জড়িত হইয়া পড়েন। বিনোবাজী বলেন যে ঐরূপ করিলে নয়ী তালীম নির্জীব হইয়া যাইবে। তিনি বলেন,—

"তাহা হইলে লোকের আর কিছু করিবার থাকিবে না। প্রত্যেক ক্রিয়ার সহিত প্রত্যেক জ্ঞানকে কি ভাবে যুক্ত করা যায় তাহারই খোঁজে বেচারীরা লাগিয়া থাকিবে। ইহা হইতে আমাদের মুক্ত হইতে হইবে। নয়ী তালীম হইতেছে এক জীবন-দর্শন।"

বিদ্যালয়ে নৃত্য-গীতের সীমা

শিক্ষায় মনোরঞ্জনের কার্যক্রমের প্রয়োজন আছে। জীবনে সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মূল্য আছে। এজন্য বিদ্যালয়ে নৃত্য-গীতের চর্চা করা নিষিদ্ধ নহে। কিন্তু যে দেশে কোটি কোটি লোক পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, লক্ষ লক্ষ লোক অন্নাভাবে মুমূর্ষু এবং সহস্র সহস্র লোক অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হয় সেই দেশে বিদ্যালয়ে নৃত্য-গীতের বাড়াবাড়ি করা উচিত নহে। উহার একটা সীমা থাকা উচিত। বিনোবাজী বলেন,—

"মনুষ্যের জীবনে সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের স্থান আছে। কিন্তু তাহার জন্য আমরা যেন এমন পাগল হইয়া না যাই, যাহাতে শিক্ষা যে আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য তাহা চাপা পড়িয়া যায়, অথবা আমাদের মুখ্য সমস্যার কথা ভুলিয়া যাই।"

এজন্য তিনি বলিয়াছেন যে এক ব্যক্তি ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করিতেছে এবং আর এক ব্যক্তি ক্ষুধায় ছটফট করিতে করিতে মরিয়া পড়িয়া আছে এই দৃশ্য স্মৃতিপথে রাখিয়া অথবা এই দৃশ্যের এক ছবি সম্মুখে রাখিয়া নাচ-গান বা এবংবিধ সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের অনুষ্ঠান করিতে হয় বা যতটা করা সম্ভব হয় তাহা করা উচিত। অর্থাৎ তাহা হইলে অনুষ্ঠানের বাড়াবাড়ি করিতে মন আসিবে না। এ বিষয়ে সংযম থাকিবে। এই প্রসঙ্গে তিনি চিত্রশিল্পীদের নিকট আবেদন করিয়াছেন যে তাঁহারা যেন ভারতের বাস্তব অবস্থার প্রতীক স্বরূপ উপরোক্ত হৃদয়-বিদারক দৃশ্যেরও ছবি আঁকেন।

নয়ী তালীম মহিলাদের হাতে থাকা উচিত

ভারতে আজ শিক্ষাকে সংযম-প্রধান করিবার যেরূপ জরুরী প্রয়োজন দাঁড়াইয়াছে এরূপ আর কখনও হয় নাই। আজ চারিদিকে অসংযমের আবহাওয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। হালকা সাহিত্য ও সিনেমা ইহার জন্য প্রধানত দায়ী। ভারতে জনসংখ্যা অত্যধিক হারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে ইহা সকলেই জানেন। ইহা দেশের এক গুরুতর সমস্যা। বিনোবাজী বলেন যে ইহা গুরুতর সমস্যা হইলেও তাহাতে তাঁহার ভয় হয় না। তাঁহার ভয় এইজন্য যে নিবীর্য মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। তিনি বলেন,—

"প্রজা যদি বীর্যবান, কর্মযোগী ও দক্ষ হয় তাহা হইলে জনসংখ্যা যাহা বৃদ্ধি পাইবে তাহার ভার এই বসুন্ধরা বহন করিতে সমর্থ হইবে ইহা আমার বিশ্বাস। নিবীর্য, নিস্তেজ প্রজা যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে তাহার কারণ কি? তাহার কারণ এই যে দেশের মধ্যে সংযমের অনুকুল আবহাওয়া নাই। যাহা কিছু সাহিত্য রচিত হইতেছে, যে সিনেমা ইত্যাদি চলিতেছে, তৎসমস্তই ভারতের আবহাওয়াকে নিবীর্য করিয়া দিতেছে। এরূপ অবস্থায় নয়ী তালীমের উপর এই দায়িত্ব আসিয়া পড়িতেছে যে আমাদের ছেলেমেয়েদের শিশুকাল হইতে সংযমী, বীর্যবান ও নিগ্রহী করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে।"

শিক্ষাকে এই ভাবে সংযমাত্মক করিতে হইলে শিক্ষার ভার এমন লোকের হাতে দেওয়া উচিত যাঁহাদের পক্ষে সংযম শিক্ষা দেওয়া সহজ ও স্বাভাবিক হইবে। মহাত্মা গান্ধী সত্যাগ্রহের পরিচালনার ভার স্ত্রীলোকদিগের হাতে সঁপিয়া দিতে চাহিতেন। তিনি মনে করিতেন যে অহিংসা স্ত্রীলোকদের কাছে সহজভাবে আসিয়া যায়। বিনোবাজীও তাহাই মনে করেন এবং ঠিকই মনে করেন। এজন্য তিনি শান্তিসেনা সংগঠন করিবার দায়িত্ব একমাত্র মহিলাদের দ্বারা গঠিত কমিটির উপর দিয়াছেন। এই কারণেই সংযম-প্রধান শিক্ষার জন্য তিনি স্ত্রীলোকদিগকে নয়ী তালীমের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে আহ্বান করিয়াছেন। তিনি বলেন,—

"আবহাওয়া সংযমের অনুকূলে রাখিবার যে দায়িত্ব তাহা যদি ঠিকভাবে সিদ্ধ করিতে হয় তবে বুনিয়াদী শিক্ষার কাজের দায়িত্ব যতদূর

সম্ভব মহিলাগণের হস্তে ন্যস্ত করিতে হইবে এবং এই কাজের জন্য তাঁহাদিগকে প্রস্তুত করিতে হইবে।"

দেশে যে সব মহিলা সংস্থা আছে তাঁহাদের সকলেরই উপর তিনি ছোট ছেলেমেয়েদের শিক্ষার দায়িত্ব দিতে চান। উপনিষদের মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে ছেলেদের প্রথম শিক্ষা স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা হওয়া প্রয়োজন। উপনিষদ বলেন,—'মাতৃবান্, পিতৃবাণ, আচার্যবান্'—অর্থাৎ শিক্ষা প্রথমে মাতার নিকট হইতে, পরে পিতার নিকট হইতে এবং শেষে আচার্যের নিকট হইতে হওয়া উচিত। শিক্ষালাভের এরূপ ক্রম হওয়া আবশ্যক।

নয়ী তালীম ও জ্ঞানলাভ

নয়ী তালীমে পুস্তকের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় না বলিয়া কাহারও কাহারও এরূপ ধারণা হইয়াছে যে উহাতে জ্ঞানলাভের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় না এবং তাহার ফলে পুরাতন পদ্ধতির বিদ্যালয় অপেক্ষা নয়ী তালীম বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জ্ঞানলাভ কম হয়। এই ধারণা ভুল। নয়ী তালীমে রাজা-মহারাজাদের ও তাঁহাদের যুদ্ধাদির অকেজো কাহিনীতে পূর্ণ ইতিহাসের বড় বড় বই পড়ানো হয় না বটে, কিন্তু ইহাতে জীবনের মূলভূত বিষয়সমূহ সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে। সাধারণ ইতিহাস পাঠ করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই কেন এবং নয়ী তালীমে কোন্ কোন্ বিষয়ের গভীর জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে সে সম্পর্কে বিনোবাজী বলেন,—

"দীর্ঘ ইতিহাস ও রাজাদের অনাবশ্যক নামাবলী স্মরণ রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই। উহার দ্বারা ছাত্রদের মাথার উপর অনর্থক বোঝা চাপানো হয়। কিন্তু জীবনের যাহা মূলভূত বিচার তাহার দ্বারাই আমাদের জীবনের উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে। এজন্য ঐ সম্বন্ধীয় জ্ঞানলাভ করা প্রয়োজন। তত্ত্বজ্ঞান, ধর্মবিচার, নীতিবিচার

এই সব সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা উচিত। আমাদের সমাজ ও অন্যান্য সমাজের বিশেষত্ব কি তাহা জানা প্রয়োজন। বালকদের বিজ্ঞানের মূলভূত বিচার জানা উচিত। তাহাদের স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, খাদ্য-বিজ্ঞান, সাফাই-বিজ্ঞান, রন্ধন-বিজ্ঞান প্রভৃতির উত্তম জ্ঞান হওয়া চাই। এজন্য নয়ী তালীমে জ্ঞানের কিছু অভাব হওয়া উচিত নহে। উত্তম ভাষাজ্ঞানও চাই। নিজের বিচার ঠিকভাবে প্রকাশ করিবার কলা জানা প্রয়োজন। হস্তাক্ষর সুন্দর হওয়া চাই। সাহিত্যের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এইভাবে আমাদের শিক্ষায় জ্ঞানের অভাব থাকিবে না। কিন্তু ইহাতে অপ্রয়োজনীয় জ্ঞানের স্থান নাই।"

নয়ী তালীমে যে জ্ঞান-শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে তাহাতে এক গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্ব আছে। তাহা হইতেছে এই যে সাধারণ স্কুল-কলেজে শতকরা ৩৩ নম্বর পাইলে ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে বলিয়া ধরা হয়। কিন্তু বিনোবাজীর অভিমত এই যে নয়ী তালীমে ১০০-র মধ্যে ১০০ নম্বর পাইলে তবেই তাহাকে উত্তীর্ণ বলিয়া গণ্য করা উচিত। বিনোবাজী বলেন যে সাধারণ স্কুল-কলেজের ছাত্রেরা ৩৩ নম্বর পাইলে যখন পাশ বলিয়া গণ্য হয় তখন ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে তাহাদিগকে যাহা শিক্ষা দেওয়া হয় তাহার শতকরা ৬৭ ভাগ ভুলিয়া যাওয়ার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। আর সাধারণ স্কুল-কলেজে অসার ও অকেজো বিষয় পড়ানো ও শিক্ষা দেওয়া হয় বলিয়া এত বেশী ভুলিয়া গেলেও বিশেষ ক্ষতি মনে করা হয় না। কিন্তু নয়ী তালীমে সার জিনিসই অর্থাৎ জীবনের মৌলিক বিষয়সমূহের জ্ঞান দান করা হয়। এজন্য তাহার কিছুমাত্রও ভুলিলে চলে না। এ সম্পর্কে বিনোবাজী বলেন,—

"প্রকৃতপক্ষে যাহা বিদ্যা তাহা মানুষ ভুলিয়া যায় না আর যাহা ভুলিয়া যায় তাহা বিদ্যা নহে। এইরূপে নয়ী তালীমে আমরা এমন বিদ্যা শিক্ষা দিব যাহা ভুলিয়া যাওয়া সম্ভব হইবে না। নয়ী তালীমে শিক্ষা লাভ করিয়া মহাজ্ঞানী লোক বাহির হওয়া চাই।"

শিক্ষার প্রকৃতি ও গুণ

বিনোবাজী তাঁহার বিভিন্ন ভাষণ ও প্রবন্ধে শিক্ষা তথা নয়ী তালীম সম্বন্ধে তাঁহার চিন্তাধারা ব্যাখ্যা করিয়া নয়ী তালীমের উপর নূতন আলোক সম্পাত করিয়াছেন, এবং নয়ী তালীমের বিচারকে প্রভূত সমৃদ্ধ করিয়াছেন। ইতিপূর্বে কতিপয় অধ্যায়ে উহার কিছু কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। এখানে আরও কিছু সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে :—

(১) অনিবার্য শিক্ষা

প্রকৃতির নিয়ম এমন যে তাহার ফলে অনিবার্যভাবে মানুষের শিক্ষালাভ হয়। ঈশ্বর মানুষকে ক্ষুধা দিয়াছেন, বুদ্ধি দিয়াছেন এবং হৃদয়ে সহানুভূতি দিয়াছেন। এই তিনের প্রেরণায় মানুষের আপনা-আপনি শিক্ষালাভ হইয়া থাকে। ইহার জন্য বিদ্যালয়ের প্রয়োজন হয় না এবং শিক্ষকেরও প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ ক্ষুধা মিটাইবার জন্য খাদ্য চাই। মানুষের ক্ষুধার প্রেরণায় কাজ করিতে হয় এবং বুদ্ধির অনুশীলনের দ্বারা নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়া খাদ্য উৎপাদন করিতে হয়। বুদ্ধির ব্যবহার না করিলে খাদ্য উৎপাদন করা সম্ভব হয় না। মানুষের সহানুভূতিশীল হৃদয় আছে। খাদ্য উৎপাদনের কাজে সহানুভূতিশীল হৃদয়ও বিশেষ সহায়ক হইয়া থাকে। এজন্য খাদ্য উৎপাদনের কাজে লোকে পরস্পরকে সাহায্য করে, এবং এমনভাবে খাদ্য উৎপাদন ও আহরণ করে যাহাতে অন্যের খাদ্য উৎপাদনে বা সংগ্রহে বাধা না হয়। অন্যে অসমর্থ বা অসহায় হইলে মানুষ তাহার সাহায্যার্থে অগ্রসর হয়। এরূপে এই তিনের দ্বারা মানুষের প্রকৃত শিক্ষা লাভ হয়। বিনোবাজী বলেন,—

> "আমি যদি এই শিক্ষা না পাইতাম তবে আমার ক্ষুধা তৃপ্ত হইত না ; হৃদয়ে সহানুভূতি থাকিত না এবং বুদ্ধিও শান্ত হইত না।"

ঈশ্বর আর একটি ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন যাহার দ্বারা প্রায় স্বাভাবিক ভাবে মানুষের শিক্ষালাভ হইয়া থাকে। মাতার নিকট হইতে সন্তানের আপনা-আপনি মাতৃভাষা শেখা হইয়া থাকে। বিনোবাজী ইহাকে 'অবৈতনিক শিক্ষা-ব্যবস্থা' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

ঈশ্বর প্রদত্ত এই দুই শিক্ষা-ব্যবস্থা যদি না থাকিত তাহা হইলে শিক্ষার জন্য মানুষ যে সব ব্যবস্থা করিয়াছে তাহার কিছুই সম্ভব হইত না। এজন্য মানুষের উদ্ভাবিত সমস্ত শিক্ষা-ব্যবস্থাকে বিনোবাজী গণিতের 'শূন্য' (০)-এর সহিত তুলনা করিয়াছেন। যেমন পূর্বে কোন অঙ্ক না থাকিলে শূন্যের কোন মূল্য থাকে না, সেরূপ ঈশ্বরকৃত ঐ দুই অনিবার্য শিক্ষা-ব্যবস্থা না থাকিলে মানুষের দেওয়া শিক্ষার কোন মূল্যই থাকিত না। অথচ যে মানুষ স্কুল, কলেজের শিক্ষা পায় নাই সমাজে তাহাকে অশিক্ষিত বলিয়া গণ্য করা হয়। ইহা যে নিতান্ত ভুল ও অন্যায় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে শিক্ষা-দাতা বলিয়া অহঙ্কার করা কোন শিক্ষকের সাজে না।

(২) নয়ী তালীমের মন্ত্র—'সচ্চিদানন্দ'

নয়ী তালীমে ব্যায়াম ও আনন্দের জন্য কোন পৃথক ব্যবস্থা রাখার প্রয়োজন হয় না। ইহাতে জ্ঞান ও কর্মের প্রক্রিয়া একসঙ্গে চলে। কাজ করিতে করিতে যথেষ্ট ব্যায়াম হইয়া যায়। অতএব কর্ম, জ্ঞানার্জন ও ব্যায়াম একসঙ্গে চলিয়া থাকে। জ্ঞানলাভ আনন্দদায়ক। শ্রম বা ব্যায়ামও আনন্দদায়ক। সুতরাং আনন্দ জ্ঞান ও শ্রম হইতে ভিন্ন বস্তু নহে। এজন্য আনন্দলাভের জন্য জ্ঞান ও শ্রম হইতে পৃথক কোন ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না। ইহা নিজেই এক আনন্দ-যোজনা। বিনোবাজী বলেন,—

> "যদি একটিমাত্র শব্দের দ্বারা বুঝাইতে হয় তবে আমি বলিতে পারি যে আমাদের শিক্ষার মন্ত্র হইতেছে 'সচ্চিদানন্দ'। 'সৎ'—হইতেছে কর্মযোগ। উহা ব্যতীত জীবন চলিতে পারে না। 'চিৎ'—হইতেছে জ্ঞানযোগ। উহা ব্যতিরেকে জীবন জড় হইয়া পড়ে। আর আনন্দ ব্যতীত জীবনে কোন রস থাকে না। সুতরাং যে শিক্ষায় 'সৎ', 'চিৎ' ও আনন্দ—এই তিনের সমাবেশ হইয়া থাকে তাহাই প্রকৃত শিক্ষা।"

(৩) নয়ী তালীমের দুই ফুসফুস

নয়ী তালীমে ছাত্র স্বাবলম্বী হইয়া গড়িয়া উঠে। কিন্তু কেবল স্বাবলম্বন শিক্ষা হইলেই নয়ী তালীমের পূর্ণতা সাধিত হয় না। স্বাবলম্বী মানুষও

শোষণ করিতে পারে। এজন্য স্বাবলম্বনের সঙ্গে সঙ্গে সাম্যযোগ চাই। পুরুষার্থহীনতার দোষ পাশ্চাত্য শিক্ষায় নাই। লুণ্ঠনকারীর নিশ্চয়ই পুরুষার্থ আছে। পুরুষার্থের দ্বারা স্বাবলম্বন সাধন করিলেই সব হইল না। শিক্ষার ফলে শিক্ষার্থীর মধ্যে আধ্যাত্মিক গুণাবলীর বিকাশ হওয়া চাই। এজন্য বিনোবাজী বলেন,—

"যদি আমাদের শিক্ষায় সাম্যযোগ ও স্বাবলম্বন—এই দুই গুণ না থাকে তবে আমাদের শিক্ষার উভয় ফুসফুস নষ্ট হইয়া যাইবে—ইহা বুঝা উচিত।"

অর্থাৎ স্বাবলম্বনের সঙ্গে সঙ্গে গুণবিকাশ হওয়া চাই। সুতরাং নয়ী তালীমের দুই ফুসফুস হইতেছে স্বাবলম্বন ও গুণ-বিকাশ।

(৪) নয়ী তালীম নাম কেন

শিক্ষা ও জ্ঞানের যে মূলভূত বিচার তাহা তো অনাদি। তাহার মধ্যে নূতন-পুরাতন বলিয়া কিছু নাই। তথাপি মহাত্মা গান্ধী এই শিক্ষাকে 'নয়ী তালীম' নাম কেন দিলেন? অর্থাৎ নয়ী (নব) বিশেষণ কেন যোগ করিলেন? বিনোবাজী তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে কোন বিচার অনাদি হইলেও মাঝে মাঝে উহাতে বিচারের তেজ মন্দীভূত হইয়া পড়ে। নূতন যুগে তাহাকে নূতন রূপে ব্যক্ত করিবার প্রয়োজন হয়। নূতন রূপে উহার প্রকাশ হইলে উহা তখন নূতন বস্তু হইয়া দাঁড়ায়। প্রচলিত শিক্ষা প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছে। বর্তমান যুগের উপযোগী নূতন রূপে শিক্ষার আবির্ভাব হওয়ায় উহাকে 'নয়ী তালীম' নাম দেওয়া হইয়াছে।

(৫) নয়ী তালীমের ত্রিবিধ দর্শন

নয়ী তালীম এক সমগ্র বিচার। কিন্তু তিনটি বিভিন্ন দৃষ্টিতে উহাকে দেখা যায়—(১) আর্থিক, (২) আধ্যাত্মিক ও (৩) সামাজিক।

নয়ী তালীমের আর্থিক দৃষ্টি এই যে উহাতে শারীরিক শ্রম ও মানসিক শ্রমের মধ্যে কোন শ্রেণীভেদ করা হয় না। উহার ভেদ মিটানোই নয়ী তালীমের উদ্দেশ্য। শারীরিক কাজের জন্য কম পারিশ্রমিক এবং মানসিক কাজের জন্য বেশী পারিশ্রমিক এরূপ কল্পনা নয়ী তালীমে নাই। মানুষ

তাহার যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুসারে সমাজকে সেবা করিবে এবং তাহার প্রয়োজনমত সমাজের নিকট হইতে গ্রহণ করিবে। সেবা নৈতিক বস্তু এবং পারিশ্রমিক, বেতন ইত্যাদি ভৌতিক বস্তু। ভৌতিক বস্তুর দ্বারা নৈতিক বস্তুর মূল্য নিরূপণ বা পরিমাপ করা যায় না। ইহা যে সম্ভব নহে তাহা বিনোবাজী এক উপযোগী উদাহরণের দ্বারা বুঝাইয়াছেন। তিনি বলেন,—

"এক মাইলে কত ঘণ্টা হয় এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা ভুল। এক মাইলে কত গজ এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, কিন্তু কত ঘণ্টা এরূপ নহে। কারণ উহারা পৃথক পৃথক প্রকারের বস্তু। পৃথক এক জাতীয় বস্তুকে অন্য জাতীয় বস্তুতে রূপান্তরিত করা যায় না।"

ইহা বুঝাইবার জন্য বিনোবাজী আর একটি উদাহরণ দিয়া থাকেন। ধরুন, ঝড় তুফানের সময় আমি নদীতে ডুবিয়া যাইতেছি। এক ব্যক্তি নিজের জীবন তুচ্ছ করিয়া আমাকে উদ্ধার করিলেন। এই কাজে তাঁহার পনর মিনিট মাত্র সময় লাগিল। এই কাজ শারীরিক, উহা বৌদ্ধিক নহে। এজন্য কি তাঁহাকে আমি পনর মিনিটের শরীর-শ্রমের মজুরী ছয় নয়া পয়সা দিব?

মানুষ কতটা অর্থ গ্রহণ করিবে তাহা তাহার ভৌতিক প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ আর্থিক ব্যাপারের সম্বন্ধ হইতেছে প্রয়োজনের সহিত। সেবার সহিত তাহার সম্পর্ক নাই। ইহা মানিয়া চলা নয়ী তালীমের আর্থিক অঙ্গ।

নয়ী তালীমের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি এই যে ইহাতে জ্ঞান ও কর্মকে দুই পৃথক বস্তু বলিয়া গণ্য করা হয় না। একই বস্তুর দুই ভিন্ন প্রকাশ। যে পদ্ধতিতে উহারা একীকৃত হয় তাহা হইতেছে সমবায়। এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। জ্ঞান ও কর্মের সহিত আনন্দেরও সমবায় হইয়া থাকে। এ কথাও পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

নয়ী তালীমের সামাজিক রূপ এই যে মনুষ্য মাত্রই সমান। এজন্য কোনরূপ সামাজিক বৈষম্য, শ্রেণী বৈষম্য ইত্যাদি কোন প্রকারের ভেদ উহাতে অচল। এই দৃষ্টিতে নয়ী তালীম ভূদানযজ্ঞের দাবী স্বীকার করিয়া লইয়াছে। জমি সকলের হওয়া চাই, জমির মালিক কেহ নহে। অর্থাৎ

জমির ব্যক্তিগত মালিকানা বিসর্জন দেওয়া উচিত। এই দৃষ্টি শুধু এক দেশে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া উহা বিশ্ব-প্রসারী হইতে পারে। অর্থাৎ কোন এক দেশের জমি মাত্র সেই দেশবাসীরই ইহা মনে করাও ঠিক নহে। পৃথিবীতে যত জমি আছে তাহা সমগ্র মনুষ্য সমাজের।

ইহাতে ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে ভোজন করিবে, একসঙ্গে খেলিবে ও একসঙ্গে পড়িবে। তাহাদের মধ্যে কোনরূপ ভেদ থাকিবে না। ধর্মের দিক হইতে তাহারা বিভিন্ন ধর্মের যাহা খারাপ তাহা ত্যাগ করিয়া যাহা ভাল তাহা গ্রহণ করিবে। ইহা হইতেছে প্রকৃত সর্ব-ধর্ম-সমন্বয়। অনেকের ভ্রান্ত ধারণা আছে যে সকল ধর্মের ভাল-মন্দ যা আছে সব কিছুকেই ভাল বলিলে 'সর্ব-ধর্ম-সমন্বয়' হইল। আর ধর্ম সম্বন্ধে কিছু না বলিলে সেকুলার এটিচুড (ধর্মনিরপেক্ষ বৈষয়িক ভাব) বলিয়া মনে করা হয়। 'সেকুলার এটিচুড'-এর ঐ অর্থ হইলে বলা যায় যে নয়ী তালীমের সেকুলার এটিচুড নাই। কারণ বিভিন্ন ধর্মের যাহা খারাপ নয়ী তালীম তাহার বিরুদ্ধে। সুতরাং নয়ী তালীম কি তাহা ঠিকমত বুঝিলে যাঁহারা সনাতনী বা রক্ষনশীল মনোভাবাপন্ন তাঁহাদের পক্ষ হইতে নয়ী তালীমের বিরোধিতা হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এখন তাঁহারা সেরূপ করিতেছেন না। বিনোবাজী বলেন যে তাহাতে মনে হয় যে নয়ী তালীম কি তাহা তাঁহারা এখনও ভালভাবে জানিতে পারেন নাই অথবা আজ নয়ী তালীম বলিয়া যাহা চালানো হইতেছে তাহা প্রকৃত পক্ষে নয়ী তালীম নহে।

নয়ী তালীমে চিত্রকলা

নয়ী তালীমের পাঠ্যক্রমে সর্বনিম্ন শ্রেণী হইতে চিত্রকলা শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। হস্তশিল্পের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থায় চিত্রাঙ্কন ছাড়া কাজ চলিতে পারে না। এজন্য নয়ী তালীমে রেখাঙ্কন বা চিত্রকলার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। কিন্তু চিত্রাঙ্কনের সমস্ত ব্যবস্থা এরূপ হওয়া উচিত, যাহাতে নয়ী তালীমের মূলনীতি সমূহের সহিত উহার সঙ্গতি থাকে। এজন্য নিম্নলিখিত তিনটি প্রয়োজনীয় বিষয় বিচার-বিবেচনা করিয়া তবে চিত্রকলার শিক্ষাক্রম স্থির করা উচিত :—(১) চিত্রাঙ্কনের উপকরণ ও বিষয় কিরূপ হওয়া চাই,

(২) দৈনন্দিন জীবনে চিত্রকলার কিরূপ প্রভাব হওয়া দরকার ও (৩) কি কি প্রকারের চিত্রাঙ্কন শিক্ষা করা প্রয়োজন।

(১) চিত্রাঙ্কণের উপকরণ ও বিষয় সম্পর্কে বিচার করিতে হইলে চিত্রাঙ্কনের প্রকার ভেদ কিরূপ তাহা জানা উচিত। চিত্রকলা দুই প্রকারের : (ক) যাহার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র সৌন্দর্য সৃষ্টি ও (খ) হস্তশিল্পের প্রয়োজনের জন্য যে চিত্রাঙ্কন করিতে হয়। কাজের জন্য এই দ্বিতীয় প্রকারের চিত্রাঙ্কনের প্রয়োজন হয় এবং কাজের সহিতই উহার সম্পর্ক বলিয়া বিনোবাজী উহাকে 'কর্মযোগী' রেখাঙ্কন নাম দিয়াছেন। প্রথম প্রকারের চিত্রকলাকে তিনি 'ভক্তিযোগী' চিত্রাঙ্কন বলেন ; কারণ কর্মের শোভা বা সৌন্দর্য হইতে ভক্তির উদ্ভব। নয়ী তালীমে এই উভয় প্রকারের চিত্রকলা শিখাইতে হইবে।

সূতাকাটা, বয়ন, কাঠের কাজ প্রভৃতি সমস্ত হস্তশিল্পের জন্য 'কর্মযোগী' রেখাঙ্কনের প্রয়োজন হইয়া থাকে। উহার যন্ত্রাদি ও সরঞ্জামাদির নক্সা প্রস্তুত করা ও উহার আকার কয়েকগুণ বৃদ্ধি করিয়া বা কয়েকভাগ কমাইয়া অঙ্কন করা, কল্পনার সাহায্যে বা জিনিস দেখিবার পর স্মৃতি হইতে উহার নক্সা অঙ্কন করা ইত্যাদি 'কর্মযোগী' চিত্রাঙ্কনের অন্তর্ভুক্ত। এ ক্ষেত্রে মাত্র রেখাঙ্কন করিলেই চলে। 'কর্মযোগী' রেখাঙ্কনের জন্য বিশেষ কোন উপকরণের প্রয়োজন হয় না। ড্রইং পেপারের প্রয়োজন নাই। শ্লেট-পেন্সিল হইলেই সাধারণভাবে কাজ চলিয়া যায় কিংবা শ্লেটে প্রথম অঙ্কন অভ্যাস করিয়া উহা পরে কাগজে অঙ্কন করা যায়। রবার ব্যবহার করা উচিত নহে। যেখানে রুল করা কাগজ দরকার হইবে সেখানে রুল করা কাগজ খরিদ না করিয়া ছাত্র-ছাত্রীরা সাদা কাগজের উপর নিজেরা রুল করিয়া লইবে তাহা রেখাঙ্কনের অংশ হইবে। ইহাতে কাজের সঙ্গে রুল করার জ্ঞানলাভ হইবে এবং তাহাতে আনন্দও আসিবে। বিনোবাজী বলেন,—

"এইরূপ দৃষ্টি থাকিলে কাজ, কলা, জ্ঞান, আনন্দ এবং স্বাবলম্বন এক সঙ্গে সাধন করা যায় এবং সরঞ্জামাদির ঝঞ্ঝাটে পড়িতে হয় না।"

এরূপে নয়ী তালীমের সমবায়-পদ্ধতির মধ্যে চিত্রাঙ্কনেরও সমাবেশ হইয়া যায়। কাজের জন্য যেমন রেখাঙ্কনের প্রয়োজন হয়, সৌন্দর্যের জন্যও তেমন উহার প্রয়োজন হইয়া থাকে। সৌন্দর্য-রেখাঙ্কনের জন্য বিবিধ প্রকার

উপকরণের প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রেও ব্যয়সাধ্য উপকরণ খরিদ করার প্রয়োজন নাই। ছাত্র-ছাত্রীদের চারিদিকে প্রকৃতির সৃষ্টি পড়িয়া রহিয়াছে। আশপাশের গাছ-পালা হইতে ব্রাস (তুলি) ও উহাদের পাতা, ছাল প্রভৃতি হইতে বিভিন্ন রং-এর প্রয়োজন সহজে মিটানো যাইতে পারে। তাহাতে বিশুদ্ধ আনন্দ পাওয়া যাইবে ও উহাদের অন্বেষণ ও সংগ্রহের কাজে কর্মসাধন ও জ্ঞানার্জন উভয়ই হইবে।

সৌন্দর্য-চিত্রনের বিষয় বস্তুও প্রকৃতি হইতে পাওয়া যাইবে। উহার জন্য অন্যত্র যাইতে বা অন্বেষণ করিতে হইবে না। বিনোবাজী বলেন,—

"উহাতে চিত্রাঙ্কনের বিষয়বস্তুও ভরা রহিয়াছে। প্রকৃতি কামধেনুর মত। প্রকৃতি দুধ দেয়। দুধ পান করিবার পাত্রও দেয়। প্রকৃতি কেবল চাহিবার অপেক্ষায় থাকে।"

বিনোবাজী ইহার এক মনোরম দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। তিনি বলেন যে দীপাবলী সৌন্দর্যের উৎসব। উহা হইতেছে ভূ-পৃষ্ঠের উপর সৃষ্টি করা আকাশের সৌন্দর্য। তিনি বলেন,—

"দেওয়ালী হইল চারমাস বর্ষার পর প্রথম মেঘমুক্ত অমাবস্যা। আপন ঐশ্বর্যসহ পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত রজনী দেবী। চন্দ্রের সাম্রাজ্যের অবসান ঘটাইয়া পরস্পরের সহযোগিতায় সৌন্দর্য-রচনার্থ সুসজ্জিত ক্ষুদ্র-বৃহৎ অসংখ্য স্বনিয়ন্ত্রিত তারকারাজি ও নিম্নে তাহাদের প্রতিকৃতি স্বরূপ অগণিত দীপাবলী!"

চিত্রাঙ্কনের বিষয় এইভাবে প্রকৃতি হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে। অন্তরে সৃষ্টির সৌন্দর্যের অনুভূতি জাগ্রত করা এবং তাহা হইতে বিশুদ্ধ আনন্দের আস্বাদ পাওয়ার শিক্ষা হইলে ছাত্রেরা চিত্রাঙ্কনের দিকে আকৃষ্ট হইবে ও অনুরূপ চিত্রাঙ্কন করিতে প্রেরণা লাভ করিবে। এজন্য চিত্রকলা শিক্ষা করিতে হইলে আকাশ-দর্শনের অভ্যাস করা অনিবার্য হইয়া পড়ে। ভোরে উষা-দর্শন ও রাত্রিকালে আকাশ-দর্শন এই উভয়ই চাই। উষার গোলাপী আভা প্রেমের দ্যোতক। বিনোবাজী বলেন,—

"প্রভাতের উষার আরক্তিম ছটা শিশুর নিকট মায়ের স্নেহময় জাগরণী স্বরূপ। উষা-দর্শন ব্যতীত কোন কবি বা চিত্রশিল্পীর কাজ চলিতে পারে না।"

রাত্রিকালে আকাশে নক্ষত্ররাজি দর্শন করিলে কতই না পবিত্র ভাবনার উদয় হয়! 'শুক্র' বা 'বুধ' কত উজ্জ্বল ও চমৎকার! বিনোবাজী বলেন—

"ডুবুরীরা নিশ্বাস-প্রশ্বাস রোধ করিয়া সমুদ্রের মধ্য হইতে যে সব মোতি উত্তোলন করে তাহা এই সব তারকারাজির কাছে তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়।"

(২) আমাদের খুঁটিনাটি কাজে ও ব্যবহারে চিত্রকলার প্রভাব প্রকট হওয়া প্রয়োজন। তবেই চিত্রাঙ্কনের সার্থকতা। চিত্রাঙ্কনের সঙ্গে সঙ্গে জীবনে চিত্রকলার দৃষ্টিলাভ হওয়া চাই। চিত্রাঙ্কন ও চিত্রকলার দৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য আছে। চিত্রকলার দৃষ্টির অর্থ আমাদের ব্যবহার ও খুঁটিনাটি প্রত্যেক কাজ চিত্রকলার সৌন্দর্যবোধের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া। অর্থাৎ জীবনের খুঁটিনাটি কাজে ও ব্যবহারে অসঙ্গত কিছু ঘটিতে না দেওয়া। বিনোবাজী বলেন যে, যে ব্যক্তি চিত্রকলার দৃষ্টি পাইয়াছে সে ব্যবহারিক জীবনে কোন অসঙ্গত ব্যবহার করিবে না। ছেলেমেয়েরা সোজা হইয়া বসিতেছে কিনা, ড্রিলের সময় শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দাঁড়ায় কিনা, খাওয়ার সময় পংক্তিবদ্ধ হইয়া বসে কিনা—এই সব দেখিয়া বুঝা যাইবে যে তাহাদের জীবনে চিত্রকলার দৃষ্টি কতটুকু আসিয়াছে। যাহার চিত্রকলার দৃষ্টি আসিয়াছে সে লেবু লম্বালম্বি না কাটিয়া পারিবে না—কারণ উহা আড়াআড়িভাবে কাটিলে রস বাহির করিতে ও বিচি ফেলিতে অসুবিধা হয়। সে ব্যক্তি কমলালেবু খাওয়ার সময় উহার খোসা এমনভাবে ছাড়াইয়া লইবে যাহাতে তাহা বাটির আকার প্রাপ্ত হয় এবং লেবু খাইয়া তাহার ছিবড়াগুলি তাহাতে রাখা যায় ও তাহা অন্যত্র ফেলিয়া দেওয়া যায়। সে পেঁপে লম্বালম্বি না কাটিয়া আড়াআড়ি কাটিয়া বাটির আকারের দুইটি খণ্ড করিবে। কলা খাইবার সময় কলার খোসা ক্রমশ অল্প অল্প করিয়া খুলিবে, যাহাতে হাতে না লাগে। পোষাক পরিচ্ছদেও চিত্রকলার দৃষ্টি থাকা চাই। কাল রং-এর লোক আর তাহার চুলও কাল। তাহার উপর সে যদি কালটুপি পরে তবে তো তাহাকে কাকের মতই দেখাইবে! মোটকথা জীবনের প্রত্যেক কাজে ও ব্যবহারে যেন সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠে। তবেই বুঝা যাইবে যে ছাত্রের মধ্যে শিল্পের দৃষ্টি আসিয়াছে।

(৩) বিনোবাজী বলেন যে নিম্ন কয়েক প্রকারের চিত্রাঙ্কন শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক :—

(ক) ব্যাবর্তক চিত্রকলা :—'ব্যাবর্তক'-এর অর্থ—যাহার দ্বারা অন্য হইতে পৃথকীকরণ করা যায়। কোন বস্তুর যেটুকু বিশেষ কেবলমাত্র তাহা অঙ্কন করিলে সেই বস্তুকেই বুঝা যায়। শুঁড় হাতীর বিশেষ চিহ্ন। হাতীর শুঁড়টুকু অঙ্কিত করিলে হাতী বলিয়া বুঝা যায়। মানুষের মুখটুকুর ছবি দেখিলে কোন্ বিশেষ ব্যক্তির ছবি তাহা বুঝা যায়। ষাঁড়ের শিং ও ঝুঁট মাত্র অঙ্কিত করিলে ষাঁড় বলিয়া বুঝা হয়। কারণ শিং আছে কিন্তু ঝুঁট নাই অথবা ঝুট আছে কিন্তু শিং নাই এরূপ জন্তু আছে। কিন্তু শিং ও ঝুঁট উভয়ই আছে এমন জন্তু ষাঁড় ভিন্ন আর নাই। চিত্রকলায় বস্তুর সাধারণ ও বিশেষ ধর্ম এবং গৌণ ও মুখ্য ধর্মের ভেদ প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন।

(খ) স্মৃতির আধারে চিত্রাঙ্কন :—কোন জিনিস দেখিবার পর স্মরণ করিয়া ঠিক তাহা অঙ্কন করিতে শেখা চাই। কোন যন্ত্র বা কোন বাড়ী দেখিয়া আসিয়া স্মৃতির সাহায্যে তাহার সঠিক চিত্র অঙ্কন করিতে হইবে।

(গ) কোন কিছুর দৃশ্যত যে রূপ তাহা চিত্রে প্রকাশ হওয়া চাই—উহার প্রকৃত রূপ যাহা তাহা নহে। যেমন রেলওয়ে লাইন দুইটি সরল ও সমান্তর লাইন। কিন্তু দেখিবার সময় দৃষ্টিভ্রম বশত মনে হয় কিছুদূরে গিয়া দুই লাইনের ব্যবধান ক্রমশ কম হইতে হইতে অবশেষে মিলিয়া গিয়া উহারা একটিমাত্র লাইনে পরিণত হইয়াছে। যেরূপ উহা দৃষ্টিগোচর হয়, চিত্রে ঠিক সেইরূপ দেখানো উচিত। অনুরূপ তারকা, সূর্য প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থা ভেদে যেরূপ বড়-ছোট দেখায় ও উহাদের পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব যেরূপ কমবেশী দেখায় চিত্রাঙ্কনেও সেইরূপ প্রকাশ করা আবশ্যক।

(ঘ) সাংকেতিক চিত্রকলা :—উদ্যানে মানুষ বৃক্ষ-লতাদি সাজাইয়া গুছাইয়া রোপন করে, উহাদিগকে কাটিয়া ছাঁটিয়া পরিপাটি করিয়া রাখে। তাহা দেখিলে আনন্দ হয়। অন্যদিকে স্বাভাবিক বনে বৃক্ষাদি ছোট-বড় বিভিন্ন আকারের ও বিভিন্ন ধরণের হয়। তাহাতে মানুষের

হাত পড়ে না। তথাপি তাহাতে এক নৈসর্গিক সৌন্দর্য আছে, যাহার জন্য দর্শকের মনে আনন্দ আসে। উদ্যানে ঈশ্বরের পারিপাট্য ও নৈসর্গিক বনশ্রীতে ঈশ্বরের নির্মলতা-গুণ প্রকাশিত হয়। বনের ছবি আঁকিয়া নির্মলতা প্রদর্শন করা হয়। উহার নাম সাঙ্কেতিক চিত্রকলা। চিত্রকরের এই দৃষ্টি থাকা চাই। ছাত্রছাত্রীদেরও এই দৃষ্টি অর্জন করিয়া সাঙ্কেতিক চিত্র অঙ্কন শিক্ষা করা চাই।

পাশ্চাত্যে ন্যায়-বিচারের প্রতীক হইতেছে সমান তুলাদণ্ডহস্তে অন্ধ নারীমূর্তি। ইহা সাঙ্কেতিক চিত্রের এক উত্তম দৃষ্টান্ত। অন্ধ ছোট-বড় ভেদ করিতে পারে না। বিচারেও এই ভেদ করা হইবে না। সুতরাং অন্ধতা পক্ষপাতশূন্যতার প্রতীক। নারী স্বভাবত দয়ালু। বিচারক দয়ার্দ্র-হৃদয় হওয়া চাই। নারীমূর্তি দয়ালুতার প্রতীক। তুলাদণ্ডের সমানতার অর্থ সত্যনিষ্ঠা। বিচারকের আবশ্যকীয় তিনটি গুণ—(১) নিষ্পক্ষতা, (২) দয়া, ও (৩) সত্যনিষ্ঠা। ঐ তিনটি গুণই ঐ চিত্রে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

সাঙ্কেতিক চিত্রের আর একটি দৃষ্টান্ত হইতেছে তিনমুখ বিশিষ্ট দত্তাত্রয়ের মূর্তি। উহার তিনটি মুখ দেখিতে একরূপ—এইভাবে যেন উহা গঠন বা অঙ্কন করা না হয়। উহাদের মধ্যে কিছু পার্থক্য রাখা চাই। তবেই দত্তাত্রয়ের প্রকৃত মূর্তি হইবে। তিনটি মুখ তিনগুণের (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ) প্রকাশক হওয়া চাই। মাঝের মুখটি পরিচ্ছন্ন, সুন্দর ও পবিত্র হইবে। উহা সাত্ত্বিক ভাব প্রকাশক। দ্বিতীয় মুখটি হইবে অপরিষ্কার ও নিদ্রাচ্ছন্ন। উহা তামসভাবের দ্যোতক। তৃতীয় মুখটি, আবেশ ও পরাক্রমে ভরা। উহা রজোগুণযুক্ত। হিন্দুদের দেবদেবীর মূর্তিগুলি সাংকেতিক কলায় ভরা।

উৎসব-অনুষ্ঠানে পূর্ণকুম্ভ দরজার পাশে রাখিয়া অভ্যর্থনা জানানো হয়। উহা এক সাঙ্কেতিক কলা। উহা পূর্ণ অর্থাৎ প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের প্রতীক। উহা মাটি বা সোনার হওয়া চাই, অন্য কোন ধাতুর হইলে চলে না। অভ্যর্থনার সময় যদি অভ্যর্থনাকারীর বৈভব ব্যক্ত করিতে হয় তবে সোনার কলস আর যদি তাঁহার বৈরাগ্য ব্যক্ত করিতে হয় তবে মাটির কলস দিতে হয়।

অভিবাদন করার ব্যাপারেও সাঙ্কেতিক প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়। ইংরেজরা টুপি উঠাইয়া অভিবাদন করে। কিন্তু আমাদের দেশের লোক যখন অভিবাদন করে তখন তাহারা টুপি উঠায় না। ইহার অর্থ এই যে শীতপ্রধান দেশের লোক টুপি উঠাইলে অতিথির জন্য কষ্ট স্বীকার করিতে প্রস্তুত ইহা দেখানো হয়। আর অভিবাদনের সময় গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোকের টুপি পরা থাকিলে কষ্ট স্বীকার করার ভাব প্রকাশ পায়।

কিছু জিনিস সুষম থাকে এবং কিছু জিনিস বিষম থাকে। চিত্রে তাহা ঠিকমত সুষম ও বিষম বস্তুর চিত্রাঙ্কন শিক্ষা করা উচিত।

ডান ও বাম উভয় হাতে চিত্রাঙ্কন করার শিক্ষা দেওয়া উচিত।

নয়ী তালীম কি এখনও পরীক্ষাধীন

কেহ কেহ মনে করেন যে নয়ী তালীম পরীক্ষামূলক অবস্থায় রহিয়াছে। উহা এখনও সারা দেশে এবং শিক্ষার সকল পর্যায়ে গ্রহণ করিবার অবস্থায় আসে নাই। বিনোবাজী এসম্পর্কে কি ভাবেন তাহা বুঝিয়া দেখা উচিত। তিনি বলেন,—

"নয়ী তালীমের বিচার বহু বৎসর ধরিয়া তপস্যা করিয়াছে এবং উহা এখন দেশের সম্মুখে এক আবাহনস্বরূপ দণ্ডায়মান হইয়াছে। এত বৎসর অতীত হইবার পর নয়ী তালীম এরূপ সিদ্ধ বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, এখন ইহা বলা যায় যে উহার মূলতত্ত্ব, উহার বলিষ্ঠতা ও উহার অমৃতত্ব সংশয়ের অতীত হইয়া গিয়াছে।

বুনিয়াদী (বেসিক) শিক্ষায় বুনিয়াদীর অর্থ

মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত নয়ী তালীমকে বেসিক বা বুনিয়াদী শিক্ষা বলা হয়। ইহাকে কি অর্থে বেসিক বা বুনিয়াদী বলা উচিত তাহা বুঝিয়া লওয়া প্রয়োজন। নয়ী তালীম প্রবর্তন করিবার সময় আরম্ভের শিক্ষা বা প্রাথমিক

শিক্ষা স্বরূপ এই নূতন শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল বলিয়া অনেকে 'বুনিয়াদী-শিক্ষা'র অর্থ ছেলেমেদের আরম্ভের শিক্ষা বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু এই অর্থে নয়ী তালীমকে বুনিয়াদী তালীম আখ্যা দিবার বিশেষ কোন সার্থকতা নাই।

বুনিয়াদী শব্দের এক্ষেত্রে প্রকৃত অর্থ এই যে দেশের সর্বত্র এবং গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত সকল পর্যায়ে যে শিক্ষা দেওয়া হইবে তৎসমস্তই এই নব-বিচারের বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। অর্থাৎ উহা প্রাক্-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মধ্য বা উচ্চ, যে কোন পর্যায়ের শিক্ষা হউক, উহা গ্রামের শিক্ষা বা সহরের শিক্ষা হউক, উহা দরিদ্রের বা ধনীব শিক্ষা হউক, দেশের সমস্ত শিক্ষার ভিত্তি নয়ী তালীমের বিচারের উপর আধারিত হওয়া চাই। এই অর্থেই নয়ী তালীমকে বুনিয়াদী বা বেসিক শিক্ষা বলা উচিত। আমাদের দেশের সত্যিকারের যে বুনিয়াদ তাহা নয়ী তালীম চিনিয়া লইয়াছে ও তাহাকে ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করিয়া নয়ী তালীম তদুপরি নূতন সমাজের সৌধ নির্মাণ করিতে চায়। এই অর্থেও নয়ী তালীমকে বুনিয়াদী তালীম বলা যায়। বুনিয়াদী শিক্ষার বুনিয়াদীকে যদি এই অর্থে গ্রহণ করা হয় এবং উহার পশ্চাতে যদি আমাদের সেই ভাবনা থাকে তবেই আমাদের কাছে নয়ী তালীমের দৃষ্টিকোণ পরিষ্কার হইবে এবং উহার লক্ষ্য আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে সুস্পষ্ট হইয়া থাকিবে।

পুরাতন ও নূতন শিক্ষা

বিনোবাজী কয়েকটি বাক্যের দ্বারা পুরাতন শিক্ষা ও নয়ী তালীমের মধ্যে যে পার্থক্য তাহা সুস্পষ্টভাবে বুঝাইয়াছেন। তিনি বলেন,—

"নূতন শিক্ষা অর্থাৎ নূতন মূল্য স্থাপনা। পুরাতন শিক্ষায় চুরি করাকে পাপ মনে করা হয়। নূতন শিক্ষায় শুধু চুরি করাকেই নহে, অধিক সঞ্চয় করাকেও পাপ বলিয়া গণ্য করা হয়।

"পুরাতন শিক্ষায় শারীরিক ও মানসিক শ্রমের মূল্যের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। নূতন শিক্ষায় উভয়ের মুল্যই সমান। শুধু তাহাই নহে, উহা উভয়ের সমন্বয় সাধন করে।

"পুরাতন শিক্ষা ক্ষমতার সম্মান করিয়া থাকে, নূতন শিক্ষা ক্ষমতাকে মমতার দাসী বলিয়া মনে করে। পুরাতন শিক্ষা লক্ষ্মী, শক্তি ও সরস্বতীকে স্বতন্ত্র দেবতা হিসাবে পূজা করে। নূতন শিক্ষা মানবতার পূজা করে এবং এই তিনটিকে মানব-সেবার সাধন বলিয়া মনে করে।"

মধ্যবিত্ত ও শ্রমজীবী শ্রেণীর শিক্ষা

বিনোবাজী বলেন যে বর্তমানে এদেশে সমাজের যে গঠন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে তাহা প্রধানত ইংরেজী শিক্ষার কুফল প্রসূত।

মধ্যবিত্তশ্রেণী ও শ্রমজীবী শ্রেণীর স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান এবং উভয় শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্যের সংকোচ সাধন করিতে করিতে সমগ্র সমাজকে সাম্যের ভিত্তিতে গড়িয়া তোলার সহজ উপায় বাহির করা নব-সমাজ রচনার এক বড় সমস্যা। এ সম্পর্কে বিনোবাজীর মূল্যবান উপদেশ স্মরণীয়। তিনি বলেন যে এই কাজ এমনভাবে করিতে হইবে যাহাতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক দূরে সরিয়া না যান, অথচ সৌম্যভাবে তাঁহাদের ত্রুটিসমূহ দূর করা যায়। তিনি এ সম্পর্কে বাঘ ও ছাগলের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেন। বাঘকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে ছাগলের সাহস বাড়াইতে হইবে। এই ভূমিকায় উভয় শ্রেণীর শিক্ষার (নয়ী তালীম) প্রশ্ন বিবেচনা করিতে হইবে। তাঁহাদের শিক্ষা সম্পর্কে এক বড় প্রশ্ন এই—মধ্যবিত্তশ্রেণী ও কৃষক-মজুর-শ্রেণীর শিক্ষা কি একসঙ্গে না পৃথক ব্যবস্থায় দেওয়া হইবে? বিনোবাজী বলেন যে এই দুই শ্রেণীর শিক্ষা পৃথকভাবে হইলে ফল ভাল হইবে না। তাহাতে মধ্যবিত্তশ্রেণীর মনের শ্রেষ্ঠত্বাভিমান দূর হইবে না। অন্যদিকে কৃষক-মজুর শ্রেণীর মনে যে হীনমন্যতার ভাব আছে তাহাও দূর হইবে না। উহাতে ফল খারাপই হইবে।

এজন্য দুই শ্রেণীর শিক্ষা একত্র হওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু উহাতে একটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। মধ্যবিত্তশ্রেণী কয়েক পুরুষ ধরিয়া বুদ্ধির চর্চা করিয়া আসিতেছেন। এজন্য তাঁহাদের বুদ্ধি ক্লান্ত (এগ্‌জ্‌হস্টেড) হইয়া পড়িয়াছে। অন্যদিকে যাঁহারা বরাবর হাতের কাজে

কঠিন শ্রম স্বীকার করিয়া আসিতেছেন তাঁহাদেরও ক্লান্তি আসিয়াছে। তাঁহাদের দৈহিক শক্তি নিঃশেষিত প্রায় (এগ্‌জ্‌হস্টেড) হইয়াছে। এজন্য একটি মধ্যপথ অবলম্বন করিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। ঐ সহ-শিক্ষায় এরূপ ব্যবস্থা হওয়া চাই যাহাতে শিক্ষায় শারীরিক পরিশ্রমের কার্যক্রম অধিক না থাকে আবার বুদ্ধি চর্চাও বেশী না হয়।

নয়ী তালীমে ব্রহ্মবিদ্যার আবশ্যকতা

আমরা কি হইব বা আমরা কি হইতে চাহি ইহার সহিত আমরা কি শিক্ষা করিব বা আমাদের কি শিক্ষা করিতে হইবে তাহার অন্যোন্যাশ্রিত সম্পর্ক থাকা উচিত। এজন্য আমাদের জাতীয় শিক্ষা এমন হওয়া উচিত যাহাতে তাহা নব-সমাজ নির্মাণের প্রকৃত যোগ্যতা দান করিতে পারে—একথা পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। অন্যথায় সে শিক্ষা প্রকৃত জাতীয় শিক্ষা পদবাচ্য হইতে পারে না। সুতরাং নয়ী তালীমের শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের জীবনে ও শিক্ষায় নব-সমাজের নব-মূল্যের রূপায়ন হওয়া আবশ্যক, যেমন নব-সমাজ নির্মাণকামী অন্যান্য সেবকের জীবনে হওয়া অভিপ্রেত। এই নব-মূল্য বলিতে যে কি বুঝায় তাহা 'নয়ী তালীমে নব-সমাজ রচনা' অধ্যায়ে আলোচনা করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া আর এক প্রকারের নব-মূল্যের প্রয়োজন জাতীয় শিক্ষায় আছে।

মহাত্মা গান্ধী দেশসেবার জন্য এমন কতকগুলি জিনিসের প্রয়োজন বোধ করিতেন এবং যাহার ব্যবস্থা তিনি তাঁহার আশ্রম-কর্মীদের জন্য করিয়াছিলেন, তাহা পূর্বে একমাত্র আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রের জন্য প্রয়োজন বলিয়া গণ্য করা হইত। তিনি অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ এই পাঁচটি যম-নিয়ম সমেত একাদশ ব্রত তাঁহার আশ্রমবাসীদের সম্মুখে রাখিয়াছিলেন। কারণ তিনি তাঁহাদিগকে বিশ্বহিতের অবিরোধী দেশসেবার জন্য গড়িয়া তুলিতেছিলেন। এই একাদশ ব্রত প্রত্যহ প্রার্থনায় আবৃত্তি করা হইত এবং এরূপ আশা করা হইত যে ঐ সব দেশ-সেবকের জীবন ঐ সব ব্রতের আদর্শে গড়িয়া উঠুক। তিনি ইহাও চাহিতেন যে অন্য যাঁহারা নব-সমাজ নির্মাণের জন্য দেশ-সেবা করিবেন তাঁহারা ও ঐ সব ব্রত গ্রহণ করুন এবং

তাঁহাদের জীবন তদনুসারে গড়িয়া উঠুক। উহার উল্লেখ করিয়া বিনোবাজী বলিয়াছেন,—

"যোগী ও সাধক আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করিবার জন্য যম-নিয়ম পালন করিতেন। পতঞ্জলী এই কথাই বলিয়া গিয়াছেন। বুদ্ধ, মহাবীর, পার্শনাথ প্রভৃতি এই সম্পর্কে লিখিয়া গিয়াছেন। ভক্তগণ সমগ্র জগতে ইহার উন্নতি সাধন করিয়াছেন। কিন্তু ঐ সব জিনিস সমাজ-সেবার জন্য প্রয়োজন এবং উহা ব্যতীত সমাজ-সেবা হইতে পারে না—এই সিদ্ধান্ত বাপুর আশ্রমে আমি প্রথম দেখিতে পাই।"

নব-সমাজ গঠনকামী দেশ-সেবকদের পক্ষে এই সব ব্রত-পালন মহাত্মা গান্ধী কেন আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিতেন তাহা বুঝিয়া দেখা আবশ্যক। একটি উদাহরণ লইয়া তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। নব-সমাজ অর্থাৎ সর্বোদয়-সমাজ রচনার জন্য গ্রাম-পরিবার গঠন করা প্রয়োজন। গ্রাম-পরিবার গঠনের জন্য প্রতিবেশীকে ভালবাসিতে হইবে ও তাঁহাদিগকে নিজ পরিবারের লোক বলিয়া ভাবিতে হইবে। বহু গ্রামদান হইয়াছে এবং বহু গ্রাম-পরিবারও গঠিত হইয়াছে। উপরে উপরে এসব হওয়া সহজ। গ্রামদান করিয়া গ্রাম-পরিবার গঠন করিলে তাহাতে কয়েকটি বিষয় গ্রামের অধিবাসীদিগের পক্ষে লাভজনক হইয়া থাকে। কিন্তু কেবল তাহাতে গ্রাম-পরিবারের বুনিয়াদ পাকা হয় না।

মানুষের যখন এই অনুভূতি আসে—'আমার মধ্যে যে আত্মা, আমার প্রতিবেশীর মধ্যেও সেই আত্মা, আবার পিতামাতা, পুত্রকন্যার মধ্যেও সেই একই আত্মা। সুতরাং আমরা অভিন্ন, আমরা এক, আমরা পরস্পরের আপন, পর নহি,' কেবলমাত্র তখনই গ্রাম-পরিবারের বুনিয়াদ শক্ত হইতে পারে। নচেৎ এই উপরকার জিনিস টিকিবে না। এজন্য বিনোবাজী বলিয়াছেন,—

"ইশামসীহ বলিয়াছেন—'লাভ দাই নেবার এজ দাইসেলফ্'—নিজের প্রতিবেশীকে নিজের মত করিয়া ভালবাসিবে। খুব সহজে এই কথা বলা যায়। কিন্তু এই বিষয়ে যখন চিন্তা করা যায় তখন বুঝিতে পারা যায় যে আমরা ডুব মারিয়া যতক্ষণ নিজেদের স্বরূপ পর্যন্ত না পৌঁছাই ততক্ষণ এই মনোভাব আমাদের আসা সম্ভব নহে। সাধারণ

ভাবে কয়েকটি কারণে প্রতিবেশীর প্রতি প্রেমভাব রাখা লাভজনক হইয়া থাকে, এজন্য তো আমরা প্রতিবেশীকে ভালবাসিবই। তথাপি ঈশামসীহ প্রতিবেশীকে যে ভালবাসিতে বলিয়াছেন তাহা খুবই গভীর জিনিস। এই দৃষ্টিতে যদি আমরা নিজদিগকে পরীক্ষা করি তবে আমরা বুঝিব যে আমরা কেবলমাত্র উপরে উপরে সাম্যের কথা বলিয়া থাকি। উহা নিতান্ত কৃত্রিম সাম্য। যতক্ষন না ভিতর হইতে আমাদের এই অনুভূতি হয়—'আমরা সকলে একই, আমরা বিভিন্ন আকারবিশিষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও আমরা একই বস্তু' ততক্ষণ এই উপরকার একতা দ্বারা কোন লাভ হইবে না।"

সুতরাং আমাদের গঠনকার্যসমূহের ভিতরে এক মৌলিক জিনিসের অভাব থাকিয়া যাইতেছে। সেজন্য উহাতে অভীষ্ট ফললাভ হইতেছে না। বিনোবাজী বলেন, যে জিনিসের অভাব থাকিয়া যাইতেছে তাহা হইল ধর্মনিষ্ঠা বা ধর্মশ্রদ্ধা। এই ধর্মনিষ্ঠা বা ধর্মশ্রদ্ধা কোন সাম্প্রদায়িক বা পান্থিক ধর্ম নহে। অর্থাৎ উহা হিন্দু, ইসলাম, খৃষ্টান, বৈষ্ণব বা শৈব ইত্যাদি ধর্ম নহে। এই ধর্মনিষ্ঠা হইতেছে আত্মতত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধা অর্থাৎ আত্মার অস্তিত্বে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস।

আত্মতত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধা মহাত্মা গান্ধীর বিচারধারার মূল। আত্মা সত্য-অহিংসাদি সমস্ত গুণের আধার। আত্মার এইসব গুণের বিকাশ সাধিত না হইলে মহাত্মা গান্ধী প্রদর্শিত কোন কর্ম-প্রচেষ্টার অভীষ্ট ফললাভ হইতে পারে না। এইজন্য একাদশ ব্রত আশ্রমবাসীদের সম্মুখে রাখা হইয়াছিল। এই ধর্মনিষ্ঠা বা আত্মতত্ত্বে বিশ্বাসের অভাব কোথায় রহিয়াছে? যাঁহারা এইসব কাজ করিতেছেন বা চালাইতেছেন তাঁহাদের মধ্যে? অথবা যে জনগণের মধ্যে এইসব কাজ চালানো হইতেছে তাঁহাদের মধ্যে? অথবা উভয়ের মধ্যে? যে জনগণের মধ্যে এইসব কাজ চালানো হইতেছে তাঁহাদের মধ্যে যে গুণ-বিকাশ হয় নাই সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু যাঁহারা আশ্রমাদিতে থাকিয়া এই সব কাজ করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যেও গুণ-বিকাশ হয় নাই। কারণ তাঁহাদের মধ্যে প্রকৃত ধর্মশ্রদ্ধা (আত্মতত্ত্বে শ্রদ্ধা) জাগ্রত হয় নাই। বিনোবাজী বলেন যে, আমাদের আশ্রমসমূহে প্রার্থনাদির ব্যবস্থা আছে

বটে ,কিন্তু তাহা রুটিনের মত চলিয়া থাকে এবং তজ্জন্য উহা প্রাণহীন হইয়া থাকে। তাহার দ্বারা প্রকৃত গুণ-বিকাশ হয় না। এইজন্য তিনি কিছুদিন হইতে খুবই অস্বস্তি বোধ করিতেছিলেন এবং তাহা তিনি তাঁহার জম্মুর (কাশ্মীর তাং ৮-৬-৫৯) বক্তৃতায় প্রকাশ করেন। তিনি বলেন,—

"বর্তমানে আমার মনের অবস্থা ভাল নহে। আমি অন্তরে খুবই অশান্তি অনুভব করিতেছি। * * * * * আমি ব্যাকুলতা বোধ করিতেছি এইজন্য যে আমাদের সমগ্র সর্বোদয়-বিচার ব্রহ্মবিদ্যার অভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িবে। আমরা সর্বপ্রকারে সরকারী সাহায্য পাইব। কিন্তু যত বেশী সরকারী সহায়তা পাওয়া যাইবে তত বেশী করিয়া সর্বোদয়-বিচার ভাঙ্গিতে থাকিবে। ইহার অর্থ এই নহে যে নয়ী তালীম বা অন্য গঠনমূলক কাজে সরকারী সাহায্য গ্রহণ করা উচিত নহে। সাহায্য তো নিশ্চয় লওয়া হইবে কিন্তু সমগ্র সরকারই সর্বোদয়নিষ্ঠ হইয়া উঠা চাই। সরকারী সাহায্য পরিপাক করিবার মত নিজেদের মধ্যে কিছু শক্তিশালী বস্তু থাকা প্রয়োজন। তাহা না হইলে যে পরিমাণে সরকারী সাহায্য পাওয়া যাইতে থাকিবে সেই পরিমাণে আমরা ঢিলা হইয়া পড়িতে থাকিব। গঠনমূলক কার্যাদির যত কথা আজকাল শুনিয়া থাকি তাহার মধ্যে আমি কোন বুনিয়াদ দেখিতে পাই না।"

তিনি আরও বলিয়াছেন,—

"আমাদের সংস্থাসমূহ এত শুষ্ক হইয়া পড়িতেছে যে উহাতে এখন আর আত্মতত্ত্ব বলিয়া কিছু নাই। মনুষ্যের মধ্যে তো আত্মা আছে। কিন্তু সংস্থায়ও কি আত্মা আছে? না, তাহা নাই। নয়ী তালীম, খাদি, পল্লীশিল্প প্রভৃতিতে কেবলমাত্র উপরের 'টেক্‌নিক্‌ই' দেখা যায়। নয়ী তালীমের সঙ্গে কি যোগ করিতে হইবে ইত্যাদি সম্পর্কে অভিজ্ঞতার কথা বলা হইয়া থাকে বটে, কিন্তু জ্ঞান ও কর্মকে সম্পূর্ণ একরূপ করিয়া তোলা যে আসল কাজ তাহার কিছুই হইতেছে না।"

মহাত্মা গান্ধীর বিচারধারায় যে আত্মতত্ত্বে শ্রদ্ধা থাকার কথা বলা হয় উহা কিরূপ তাহা বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। নচেৎ গান্ধী প্রবর্তিত গঠনমূলক কার্য প্রভৃতি সম্পাদনে আধ্যাত্মিকতা বা ব্রহ্মবিদ্যার প্রয়োজন কেন তাহা স্পষ্টভাবে বুঝা যাইবে না। গান্ধীজীর বিচারধারা সম্পর্কে

যে আত্মার কথা বলা হয় তাহা হইতেছে ব্যাপক আত্মা। সকল মানুষে, সর্বজীবে, শুধু তাহা নহে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে একই আত্মা বিরাজিত। ইহাই ব্যাপক আত্মা। গান্ধীজীর বিচারধারায় আত্মতত্ত্বে শ্রদ্ধার অর্থ ব্যাপক আত্মার শ্রদ্ধা। সকলের মধ্যে একই আত্মা বিরাজিত বলিয়া আমরা সকলে এক—এই অনুভূতি। তত্ত্বের দিক হইতে ইহা বিশ্বাস করা এক জিনিস আর নিজ জীবনে ইহার জীবন্ত অনুভূতি থাকা অন্য জিনিস।

গান্ধীজীর আত্মতত্ত্বে শ্রদ্ধার অর্থ আত্মার এই একত্ব ও ব্যাপকতার জীবন্ত অনুভূতি। যাঁহার এই জীবন্ত অনুভূতি থাকিবে তিনি কাহারও প্রতি হিংসাত্মক আচরণ করিতে পারিবেন না। কারণ তাহাতে তিনি অনুভব করিবেন যে তিনি নিজেরই উপর হিংসা করিতেছেন। কাহাকেও হত্যা করিতে তাঁহার হস্ত কখনও উত্তোলিত হইবে না। কারণ তাহাতে তিনি অনুভব করিবেন যে তিনি নিজেই আত্মহত্যা করিতেছেন।

অহিংসার আধ্যাত্মিক ভিত্তি এই। ইহাতে সমাজের সকলের মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত নিজের মুক্তি বা আত্মসমাধান হয় না। ইহাতে শুধু নিজের আধ্যাত্মিকতা বা ধর্মশ্রদ্ধা থাকিলে চলিবে না। আশপাশে যাঁহাদের মধ্যে ঐ বিচার অনুসারে কাজ করিতে হইবে তাঁহাদের মধ্যেও আধ্যাত্মিকতার বিকাশ ও তজ্জনিত গুণ-বিকাশ সাধন করিতে হইবে। যাঁহার ব্যাপক আত্মার ঐরূপ জীবন্ত অনুভূতি আসিবে, তাঁহার আশপাশে লোক অন্যায় আচরণ করিলে তিনি সত্যই অনুভব করিবেন যে তিনি নিজেই ঐরূপ অন্যায় আচরণ করিয়াছেন। তিনি নিজে পবিত্র থাকিলেও যদি অন্যের মধ্যে পঙ্কিলতা থাকে তবে তিনি বোধ করিবেন যে তাঁহার মধ্যেও পঙ্কিলতা থাকিয়া যাইতেছে। মহাত্মা গান্ধী এইরূপ অনুভব করিতেন। এজন্য অন্যায় আচরণ সংশোধন ও পঙ্কিলতা স্খালনের জন্য তিনি উপবাস করিতেন। মহাত্মা গান্ধীর উপবাসের রহস্য এই। তাঁহার গঠনমূলক কার্যসমূহের প্রেরণার উৎস এই ব্যাপক আত্মার অনুভূতি।

তত্ত্বের দিক হইতে প্রাচীন মুনিঋষিগণ ও পূর্বতন মহাপুরুষগণ আত্মার ব্যাপকতা মানিতেন। কারণ উহা আমাদের ধর্মশাস্ত্রের মূল কথা। কিন্তু অনুভূতির দিক হইতে তাঁহাদের আধ্যাত্মিকতা বা ধর্মশাস্ত্র এত ব্যাপক ছিল না। তাঁহারা নিজেদের জীবনে সত্য-অহিংসাদি পালন করিতেন।

উহার প্রভাব তাঁহাদের আশপাশের লোকের উপর পড়ুক ও তাঁহাদের মধ্যে ঐসব গুণের বিকাশ হউক—ইহাও তাঁহারা চাহিতেন। কিন্তু তাহা না হইলে উহা তাঁহাদের নিজেদের মুক্তি বা আত্মসমাধানের পথে বাধক হইত না। তাঁহাদের নিজেদের মুক্তি বা আত্মসমাধান হইলেই তাঁহারা সন্তুষ্ট থাকিতেন। নিজেদের মুক্তির জন্য সমাজের সকলের মুক্তির চেষ্টা করিতে হইবে—ইহা তাঁহারা অনুভব করিতেন না।

সমাজের সকলের উন্নয়ন না হইলে নিজের মুক্তি হইতে পারে না অর্থাৎ মুক্তি ব্যক্তিগত হইতে পারে না, উহা সামূহিক হওয়া চাই—এই অনুভূতি তখন আসে নাই। পূর্বতন মুনিঋষিগণ এবং মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে পার্থক্য এইখানে। অবশ্য পূর্বে আত্মার ব্যাপকতার এই অনুভূতির কথা যে কোন কোন মহাপুরুষের মনে উদয় হয় নাই তাহা নহে। প্রহ্লাদ শ্রীভগবানকে বলিয়াছিলেন—আমি এইসব দীনজনদের ত্যাগ করিয়া নিজের মুক্তিলাভ চাহি না। ঐতিহাসিক মহাপুরুষদের মধ্যে বোধহয় প্রথম স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে ব্যাপক আত্মার অনুভূতির ঝলক দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্য তিনি বলিয়াছিলেন যে দেশের হীনতম ব্যক্তিকেও বাদ দিয়া তিনি নিজের মুক্তি কামনা করেন না। তিনি দরিদ্রকে নারায়ণ জ্ঞানে সেবা, এমন কি পূজা করিতে বলিতেন। তিনি বলিতেন,—

"জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

"সমগ্র জগৎ এক অখণ্ড সত্তা স্বরূপ—তুমি আমি তার এক নগণ্য ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। সুতরাং এই আমিত্বটাকে না বাড়াইয়া তোমার কোটি কোটি ভায়ের সেবা করা তোমার পক্ষে স্বাভাবিক কার্য, না করাই অস্বাভাবিক কার্য। উপনিষদের সেই বাণী কি স্মরণ নাই :

"সর্বতঃ পানিপাদং তৎ, সর্বতোঽক্ষি শিরোমুখং সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥" (ভারতে বিবেকানন্দ পৃঃ ৬৩১)

ঐ সম্পর্কে তিনি আরও বলেন,—

"মানুষ শীঘ্র বা বিলম্বে বুঝিতে পারে যে যদি সে তাহার নিজ ভাইয়ের মুক্তির চেষ্টা না করে তবে সে কখনই মুক্ত হইতে পারে না।" (ভারতে বিবেকানন্দ পৃঃ ৬৩৩)।

ব্যাপক আত্মার অনুভূতি থাকিলে তবেই এরূপ বাণী উচ্চারিত হইতে পারে। এ জন্য 'দরিদ্র নারায়ণ' শব্দ তাঁহারই সৃষ্টি। মহাত্মা গান্ধী সেই 'দরিদ্র নারায়ণ' শব্দ ভারতের ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। এজন্য তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন পল্লীশিল্পের পুনরুজ্জীবনের কথা ভাবিয়াছিলেন এবং তাহা করিতে পারিলে তাহা হইতে নূতন ভারত বাহির হইবে এরূপ স্বপ্নও তিনি দেখিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধী ও বিনোবাজীকে স্বামী বিবেকানন্দের উত্তর-সাধক বলা যায়।

এই দৃষ্টিকোণ হইতে বিনোবাজী নয়ী তালীম সম্পর্কে এই মন্তব্য করিয়াছেন,—

"এই সকল কথা যখন চিন্তা করি তখন আমার মনে হয় যে, আমাদের কাজের মাধ্যমে শিক্ষাদান করার বিচারধারা নিতান্তই স্থূল। আমি পূর্বে বলিয়াছিলাম যে নয়ী তালীমের লক্ষ্য যদি গুণ-বিকাশ না হয়, তবে নয়ী তালীমও এক 'টেক্‌নিক' হইয়া দাঁড়াইবে—যেমন ফ্রোবেল, মণ্টেসরী প্রভৃতি প্রবর্তিত শিক্ষা হইয়া গিয়াছে। আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়—মণ্টেসরীর পদ্ধতি ও আপনাদের পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য কি? মণ্টেসরীর শিক্ষা এক খেলার মত চলিয়া থাকে। আমি ইহা বলিতে চাই না যে উহা কোন কাজের জিনিস নহে। তিনিও প্রভূত গবেষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু গান্ধীজী আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে ছেলে যখন মায়ের পেটে আসে তখন হইতে শ্মশান পর্যন্ত সমগ্র জীবনই নয়ী তালীমের শিক্ষা কাল। এজন্য সরকার যেমন এক তন্ত্র, যদি আমরা নয়ী তালীমের তেমনই এক তন্ত্র খাড়া করিয়া ফেলি তবে আমরা শুষ্ক হইয়া পড়িব। তখন নয়ী তালীম এক তন্ত্র হইয়া দাঁড়াইবে। উহার মধ্যকার মন্ত্র বিনষ্ট হইয়া যাইবে।"

ইহা উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধহয় হইবে না যে এই মন্ত্র হইতেছে গুণের বিকাশ এবং উহার সহায়তায় আত্মজ্ঞানের বিকাশ।

এজন্য ব্রহ্মবিদ্যা বা আধ্যাত্মিকতা জাতীয় শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত হওয়া অত্যাবশ্যক। কিন্তু আজ এই ধর্মশ্রদ্ধা শিখাইবার ব্যবস্থা নাই। পূর্বেও এই ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু এখন তাহা না থাকার একটি বিশেষ কারণ হইতেছে আমাদের দেশের সংবিধান। সংবিধান অনুসারে আমাদের দেশ

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র :(সেকুলার স্টেট্)। 'সেকুলারে'র বিকৃত অর্থ করিয়া ধর্মশ্রদ্ধা বা আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে শিক্ষা দান করাকে শিক্ষা-ক্ষেত্র বহির্ভূত অংশ বলিয়া গণ্য করা হইতেছে। 'সেকুলারে'র প্রকৃত অর্থ হইতেছে—সকল ধর্মের প্রতি সমভাব। উহার অর্থ ধর্মশ্রদ্ধার প্রতি উদাসীনতা বা ধর্মশ্রদ্ধা বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা না করা বা উহার জন্য কোনরূপ আগ্রহ না রাখা নহে। সাম্প্রদায়িক বা পান্থিক ধর্মের মধ্যে কিছু অবৈজ্ঞানিক জিনিস আছে। তাহা বাদ দিয়া প্রত্যেক ধর্মের মধ্যে যে সারবস্তু আছে তাহার প্রতি সমান শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করা 'সেকুলার' শব্দের বিধায়ক অর্থ। কিন্তু উহার বিকৃত অর্থ ধরা হইতেছে বলিয়া শিক্ষায় জীবনের মূল জিনিসকে বাদ দেওয়া হইতেছে। নয়ী তালীমে ব্রহ্ম-বিদ্যা, আধ্যাত্মিকতা বা ধর্মশ্রদ্ধা শিখাইবার ব্যবস্থা হইলে তবেই নয়ী তালীম সার্থক হইবে। এজন্য ব্রহ্মবিদ্যাই নয়ী তালীমের বুনিয়াদ হওয়া উচিত।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে—নয়ী তালীমের বুনিয়াদ যদি ব্রহ্মবিদ্যা হয় তবে নয়ী তালীম বিদ্যালয়ের অল্প বয়স্ক ছাত্রছাত্রীদিগকে কি উপায়ে ব্রহ্ম-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে? মায়ের উদরে থাকার সময় হইতে মৃত্যু পর্যন্ত সারা জীবনব্যাপী শিক্ষাকাল। পরিণত বয়সে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া সহজ হইতে পারে। কিন্তু নয়ী তালীম বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদিগকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার উপায় কি হইতে পারে? বিনোবাজী অন্য এক প্রসঙ্গে আত্মজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার উপায় সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদিগকে কিভাবে আত্মজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে তাহার একটা ধারণা পাওয়া যাইবে। তিনি বলিয়াছেন,—

"ব্রহ্মবিদ্যার জন্য অধিকারের প্রয়োজন আছে। জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রেও অধিকারবাদের কথা উঠিতে পারে। উহাতে ক্রমেরও প্রয়োজন আছে। কোন্ জ্ঞান কখন লাভ করিতে হইবে তাহার এক ক্রম আছে। যদি কোন ছোট ছেলে আমার কাছে আসে এবং আমি যদি তাহাকে এই শিক্ষা দিবার চেষ্টা করি—'তুমি শরীরের জন্য চিন্তা করিও না। আমরা শরীর নহি। আমরা শরীর হইতে ভিন্ন', তবে আমি ভুল করিব। সেই ছেলেটিকে আমার এরূপ বুঝানো দরকার—তোমার

কর্তব্য তোমার শরীরকে মজবুত করিয়া গড়িয়া তোলা।' যখন সে এই কথা ভাল করিয়া বুঝিয়া লইবে তখন তাহাকে আমার এই কথা বুঝাইতে হইবে—'শরীরই সব কিছু নহে। প্রয়োজন হইলে শরীরকেও ফেলিয়া দিতে হইবে।' এইভাবে যদি কোন প্রয়োজনীয় বিষয়ের সহিত ব্রহ্ম-বাদের বিরোধ ঘটে তবে কিছুদিন ব্রহ্মবাদ সম্পর্কীয় জ্ঞানকে দূরে রাখিতে হইবে। জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি করার স্পৃহা থাকা উচিত নহে। উহা ক্রমিক বিকাশের কার্যক্রম হওয়া উচিত—যেমন স্কুলের পড়া শেষ হইলে তবে কলেজের পড়া আরম্ভ করিতে পারা যায়। আত্মজ্ঞানের বিষয়েও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। সৃষ্টির মূলে যে তর্কশাস্ত্র আছে তাহা হইতে জ্ঞানলাভ আরম্ভ করা ঠিক নহে। এজন্য আত্মজ্ঞানের ভিত্তিস্বরূপ প্রথম প্রয়োজন গুণ-বিকাশের।

বিনোবাজীর আসাম যাওয়ার পথে তাঁহার উত্তরবঙ্গে পদযাত্রার সময় (মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহ, ১৯৬১) দেশের বিভিন্ন স্থানের বে-সরকারী নয়ী তালীম কেন্দ্রগুলিতে নয়ী তালীমের কাজ কিরূপ চলিতেছে তাহার এক বিবরণ বিনোবাজীকে শুনানো হয় এবং উহাদের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম কিরূপ হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে তাঁহার পরামর্শ প্রার্থনা করা হয়। উক্ত বিবরণ হইতে প্রকাশ পায় যে বুনিয়াদী বা উত্তর বুনিয়াদী উত্তীর্ণ হইলেও অনেক ছাত্র সন্তোষ লাভ করিতেছে না। কারণ তাহাদের মনে সেই ক্ষোভ থাকিয়া যাইতেছে যে তাহারা বুনিয়াদী বা উত্তর বুনিয়াদীর শিক্ষা সমাপ্ত করিলেও তাহাদিগকে সরকারী চাকুরী পাওয়ার যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করা হয় না অথবা তাহারা উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য সাধারণ স্কুল-কলেজে ভর্তি হইবার সুযোগ পায় না।

ইহা শুনিয়া বিনোবাজী দৃঢ়ভাবে বলেন যে বে-সরকারী নয়ী তালীমের কেন্দ্রগুলিতে সুস্পষ্টভাবে লিখিয়া দেওয়া হউক যে উহাতে পড়িলে সরকারী চাকুরী করা চলিবে না ও ওখান হইতে কোন সার্টিফিকেট পাওয়া যাইবে না। তাহাতে যে অল্প কয়জন ছাত্রছাত্রী আসিবে তাহাদের লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। নয়ী তালীমের শিক্ষাকেন্দ্রগুলি এখন হইতে কিভাবে চলা উচিত এবং উহার পাঠ্যক্রম কিরূপ হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে তিনি তাঁহার মত প্রকাশ করেন। তাহা হইতে বুঝা যায় যে তিনি নয়ী তালীমের ছাত্র-

ছাত্রীদের মধ্যে গুণ-বিকাশ তথা আধ্যাত্মিকতা বিকাশের উপর সমধিক গুরুত্ব অর্পণ করিতে চাহেন। তিনি বলেন যে এই ব্যবস্থার ফলে যে কয়জন ছাত্র আসে তাহাদের জন্য নিম্নলিখিত কার্যক্রম থাকিবে :—

(১) ৫ ঘণ্টা কাজ

(২) ৫ ঘণ্টা স্বাধ্যায়

(৩) ২ ঘণ্টা বিকর্ম (চিন্তন, মনন ও মনে যাহা আসে তাহা করা)

(৪) ৪ ঘণ্টা (স্নান-আহার ও অন্যান্য কৃত্যাদি)

(৫) ৮ ঘণ্টা বিশ্রাম ও নিদ্রা

কাজের মধ্যে আধঘণ্টা সূতাকাটা থাকিবে। অন্যান্য কাজের মধ্যে প্রেসের কাজ, চাষের কাজ ইত্যাদিও থাকিবে।

একটি ভাষা এমনভাবে শিখিতে হইবে যাহাতে তাহার দ্বারা নিজের মনের ভাব পূর্ণভাবে প্রকাশ করিতে পারা যায়। ইহা ছাড়া সাধারণ হিসাবরক্ষণও শিখিবে।

সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থসমূহ বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিতে হইবে।

বিদ্যালয় গবেষণা-প্রধান হইবে। জ্ঞান ও কর্মকে একরূপ করিয়া তুলিবার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হইবে।

নয়ী তালীমের শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিনোবাজীর মনের গতি কোন্‌দিকে চলিতেছে তাহা ইহা হইতে বুঝা যায়। তিনি বিশেষভাবে চান যে নয়ী তালীমে আধ্যাত্মিক বুনিয়াদ ও গুণবিকাশের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হউক। তাহাতে ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা কমিয়া গেলেও নয়ী তালীমের বৈশিষ্ট্য কোথায় তাহা ফুটাইয়া তুলিবার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করা হউক। নয়ী তালীমের বে-সরকারী কেন্দ্রগুলি প্রথম অবস্থায় কাজের মাধ্যমে শিক্ষাদান করার গবেষণাগারে পরিণত হইয়াছিল। সে পরীক্ষা সফল হইয়াছে। সেজন্য দেশের জনসাধারণ ও সরকারকে তাহা গ্রহণ করিবার জন্য আত্মবিশ্বাসের সহিত বলিতে পারা গিয়াছে। গুণবিকাশ তথা আধ্যাত্মিকতা যে নয়ী তালীমের মুখ্য উদ্দেশ্য তাহা এখন দেখাইবার সময় আসিয়াছে। নয়ী তালীমের বে-সরকারী কেন্দ্রসমূহ এখন ব্রহ্মবিদ্যা ও গুণ-বিকাশের লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া উহার গবেষণাগার হইয়া চলা উচিত। যখন ঐ পরীক্ষা সফল হইবে এবং উহার ফলে যখন উহার বিশিষ্টগুণ ও আসল রূপ

ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষায় ও জীবনে ফুটিয়া উঠিবে তখন তাহা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া পারিবে না। আর তখনই তাহা ব্যাপক ক্ষেত্রে চালাইতে পারা যাইবে। সুতরাং যে সব নয়ী তালীমের কেন্দ্র বে-সরকারীভাবে চালানো হইতেছে বা হইবে তাহার শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য বর্তমানে কি হওয়া উচিত তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

নয়ী তালীমের নব পর্ব

১৯৫৬ সালে যখন দক্ষিণ ভারতের তামিলনাদে (মাদ্রাজ) বিনোবার পদযাত্রা চলিতেছিল তখন আর্যনায়কমজী পদযাত্রীদলের সঙ্গে ছিলেন। বিনোবাজী তখন গ্রামদান ও গ্রামস্বরাজ্যের উপর বিশেষভাবে জোর দিতেছিলেন। সেখানে বহু গ্রামদানও পাওয়া যাইতেছিল। তখনকার রাজ্য সরকার গ্রামদান সম্পর্কে আগ্রহশীল ছিলেন এবং বিভিন্ন প্রকারে গ্রামদানী গ্রামের নির্মাণকার্যে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন। এই পরিবেশের মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে আর্যনায়কমজী খুবই প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত হন এবং তাঁহার মনে এই ধারণা জন্মে যে এখন নয়ী তালীমের আসল কাজ করিবার সময় আসিয়াছে।

নয়ী তালীমের চরম লক্ষ্য হইতেছে অহিংস-সমাজ প্রতিষ্ঠা। এতদিন নয়ী তালীমের পক্ষে সাক্ষাৎভাবে অহিংস-সমাজ প্রতিষ্ঠার কাজ করা সম্ভব হয় নাই। এতদিন ইহার অনুকূল অবস্থাও ছিল না। ভূদানযজ্ঞ আন্দোলন গ্রামদান ও গ্রামস্বরাজ্যের রূপ গ্রহণ করায় এখন অহিংস সমাজ-ক্রান্তির প্রত্যক্ষ রূপ দেওয়ার সুযোগ আসিয়াছে। গ্রামদানী গ্রামে নয়ী তালীমের লক্ষ্য সাধনের জন্য অনুকূল ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে। নয়ী তালীম বুনিয়াদী হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব-বুনিয়াদী, উত্তর বুনিয়াদী ও বিশ্ববিদ্যালয় (উত্তম বুনিয়াদী) পর্যন্ত বিকশিত হইয়াছে এবং সেবাগ্রাম ও অন্য কয়েকটি স্থানে উহাদের নমুনা প্রস্তুত করা গিয়াছে। এখন অহিংস-ক্রান্তির কাজে হাত দিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। এতদিন নয়ী তালীমের কাজ গবেষণাগারে চলিতেছিল। পরীক্ষা সফল হইয়াছে। এখন উহাকে ব্যাপকভাবে চালাইবার জন্য অনুকূল ক্ষেত্রের প্রয়োজন।

নয়ী তালীমের মাধ্যমে গ্রামস্বরাজের নমুনা প্রস্তুত করিবার কাজ, অহিংস-সমাজ রচনার কাজ রাজ্যশক্তির দ্বারা হওয়া সম্ভব নহে। উহা সরকার-নিরপেক্ষভাবে স্বতন্ত্র জনশক্তির মাধ্যমেই হওয়া সম্ভব। নয়ী তালীমই জনশক্তি সৃষ্টির কাজে প্রধান সহায়ক হইতে পারে। এই অবস্থায় ১৯৫৭ সালের জানুয়ারী মাসে দিল্লীর হরিজন কলোনীতে হিন্দুস্তানী তালীমী সংঘের যে বৈঠক হয় তাহাতে আর্যনায়কমজী নয়ী তালীমের এই প্রসারিত ক্ষেত্রে কি ভাবে কাজ চলিতে পারিবে তাহার আভাস দেন। তিনি বলেন,—

"অদ্যাবধি পুরাতন সামাজিক ও আর্থিক ব্যবস্থার মধ্যে থাকিয়া আমরা নয়ী তালীমের যে কাজ করিয়াছি তাহা এক বুঝাপড়ার কাজ হইয়াছে। উহা এক অপূর্ণ শিক্ষাক্রমের অসম্পূর্ণ প্রয়োগ মাত্র হইয়াছে।

* * * * * *

"এখন নয়ী তালীমের ক্ষেত্র কেবলমাত্র নয়ী তালীম বিদ্যালয়ের গৃহাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে না, সমগ্র গ্রামই নয়ী তালীমের বিদ্যালয়ে পরিণত হইবে। গ্রামের সুদক্ষ কৃষক ও কারিগর নয়ী তালীমের শিক্ষক হইবেন এবং গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে নয়ী তালীমের ছাত্র হইবে। এরূপ হইলে বাপুজীর এই সূত্র সার্থক হইবে যে এখন আর নয়ী তালীমের ক্ষেত্র সাত বৎসর হইতে চৌদ্দ বৎসর বয়সের বালকবালিকায় নিবদ্ধ থাকিবে না। সন্তান মায়ের উদরে যখন জন্ম লাভ করিবে তখন হইতে মৃত্যু পর্যন্ত নয়ী তালীমের ক্ষেত্র হইবে।

"যখন আমরা কোন গ্রামে বা সহরে নয়ী তালীমের বিদ্যালয় খুলিবার কথা চিন্তা করি তখন আমাদের সম্মুখে এই প্রশ্ন উঠে যে বিদ্যালয়ের জন্য ঘর, চাষের জন্য জমি এবং কাজের জন্য সরঞ্জাম কোথা হইতে পাওয়া যাইবে। কিন্তু এখন গ্রামদানের দ্বারা সমগ্র গ্রাম এক পরিবার হইয়া গিয়াছে, সমস্ত জমি গ্রামেরই জমি হইয়া গিয়াছে। সুতরাং বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের জন্য পৃথক গৃহ ও পৃথক জমি থাকার আর প্রয়োজন নাই। গ্রামে যেখানে যেখানে কৃষির কাজ চলিতে থাকিবে সেখানে গ্রামের সকল ছেলেমেয়েরা এবং নয়ী তালীমের

শিক্ষকগণ কাজ করিবেন, গ্রামের ভাল কৃষক তাঁহাদিগকে কৃষিসম্পর্কে শিক্ষা দিবেন এবং উহাই নয়ী তালীমের কৃষিক্ষেত্র হইবে। গ্রামে সকলের জন্য বস্ত্র-স্বাবলম্বনের কাজ চলিবে। ঘরে ঘরে চরকা চলিবে ও তাঁত চলিবে। গ্রামের সুদক্ষ বয়নশিল্পী বস্ত্র-বয়ন শিক্ষা দিবেন। গ্রামের কাষ্ঠশিল্পীর নিকট হইতে গ্রামের ছেলেরা কাষ্ঠশিল্পের কাজ শিখিবে। শিক্ষকের দায়িত্ব থাকিবে ঐ সব কাজের সহিত জ্ঞানের সম্বন্ধ জুড়িয়া দেওয়া। এইভাবে বিনোবাজীর 'একঘণ্টার পাঠশালা'র কাজ চলিবে। গ্রামে সকাল-সন্ধ্যায় প্রার্থনা হইবে। ভাল ভাল ধর্মগ্রন্থ পাঠ হইবে। ছেলেরা গ্রামের কীর্তনের দলের নিকট হইতে কীর্তন শিখিবে। বিদ্যালয়ে পৃথকভাবে সঙ্গীত-শিক্ষকের প্রয়োজন হইবে না। এইভাবে গ্রামকে স্কুল বলিয়া মানিয়া লইয়া যখন কাজ করা হইবে তখনই নয়ী তালীমের প্রকৃত কাজ হইবে। এখন উহার সময় আসিয়াছে। আমাদের এই ঐতিহাসিক মুহূর্তকে চিনিয়া লওয়া প্রয়োজন।

"এইজন্য আমি বলিয়াছি যে এখন নয়ী তালীমের দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হইতেছে। উহা হইতেছে নয়ী তালীমের দ্বারা নূতন সমাজ রচনা করিবার অধ্যায়। এই কারণে আমাদিগকে এখন গ্রামদানী গ্রামে গ্রাম-স্বরাজ্য রচনার ভার লইতে হইবে এবং আমার মতে ইহাই এখন নয়ী তালীমের ভাবী কার্যক্রম হওয়া উচিত।"

এই অবস্থায় হিন্দুস্তানী তালীমী সংঘের উক্ত বৈঠকে যে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় তাহাতে নয়ী তালীমের সকল কর্মীকে অনুরোধ করা হয় যে যেখানে যেখানে ভূদানযজ্ঞমূলক অহিংস সমাজ-ক্রান্তির কাজের দায়িত্ব সর্বোদয়-মণ্ডল গ্রহণ করিয়াছেন, তথায় তাঁহারা যেন উহার সহিত পরিপূর্ণভাবে সহযোগিতা করেন।

অতঃপর তুর্কীতে হিন্দুস্তানী তালীমী সংঘের যে বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে এই বিষয় বিশদ্‌ভাবে আলোচিত হয়। আলোচনার সারমর্ম এই যে গ্রাম-স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন প্রত্যক্ষ ও ব্যবহারিকভাবে সম্মুখে আসায় নয়ী তালীমের এখন প্রকৃত ও পরিপূর্ণ রাষ্ট্রীয় শিক্ষায় উন্নীত হইবার সুযোগ আসিয়াছে। গ্রাম-স্বরাজ্যে প্রত্যেক নাগরিকের

পোষণ ও শিক্ষণ ব্যবস্থা করিতেই হইবে। উপরন্তু উহাতে রক্ষণের ব্যবস্থাও করিতে হইবে। সেই শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা যে শিক্ষায় মানুষ শ্রমাশ্রিত উৎপাদনের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হইয়া নিজের ও নিজ পোষ্যগণের পোষণের ব্যবস্থা করিবার শিক্ষালাভ করে এবং যে শিক্ষা মানুষকে নির্ভয় করিয়া অহিংসভাবে তাহার নিজের ও তাহার প্রতিবেশীদের রক্ষা করিবার শিক্ষাদান করিতে পারে। এজন্য এখন শিক্ষার কার্যক্রম সেইভাবে বিকশিত হওয়া প্রয়োজন।

বিনোবাজী গ্রাম-শিক্ষা ও গ্রাম-রক্ষা উভয়কে যুক্ত করিয়া দেশের সম্মুখে নয়ী তালীমের সমগ্ররূপ তুলিয়া ধরিয়াছেন। গ্রাম-রক্ষার জন্য তিনি মহাত্মা গান্ধীর শান্তি-সেনার কল্পনাকে নূতন রূপে উপস্থিত করিয়াছেন। গ্রাম্য-স্বরাজ্য রক্ষার জন্য শান্তি-সৈনিকের প্রয়োজন। সর্বোদয় কল্পিত শাসনমুক্ত সমাজের ভিত্তি হইতেছে গ্রাম-স্বরাজ্য। শাসনমুক্ত সমাজের কথা ভাবিতে হইলে বিনা সৈন্যবলে দেশরক্ষণের কথাও সঙ্গে সঙ্গে ভাবিতে হয়। শান্তি-সৈনিক সাধারণত সেবা-সৈনিকরূপে সতত লোক-সেবার কাজ করিবেন। কিন্তু কোথাও কোন অশান্তি সংঘটিত হইলে নিজের জীবন সমর্পণ করিয়াও অশান্তির প্রতিকার করিবার প্রচেষ্টা করিবেন।

এইভাবে শান্তি-সেনা যদি দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষা করিতে সক্ষম হয় তবে দেশের রক্ষণও যে বিনা সৈন্যবলে করা যাইতে পারে এই বিশ্বাস সৃষ্টি করা সম্ভব হইবে। এইভাবে ভূদানযজ্ঞ আন্দোলনে শান্তি-সেনার কার্যক্রমকে গ্রামদান ও গ্রাম-স্বরাজ্যের কার্যক্রমের প্রধান পরিপূরক কার্যক্রমরূপে উপস্থিত করা হইয়াছে। এই অবস্থায় তালীমী সংঘ অভিমত প্রকাশ করেন যে দেশের নয়ী তালীমের শিক্ষকগণ প্রকৃত শান্তি-সৈনিক হইতে পারেন। সংঘ এরূপ অনুভব করেন যে গ্রামদান, গ্রাম-স্বরাজ্য ও শান্তি-সৈনিকের কার্যক্রম নয়ী তালীমের সেবকদের সম্মুখে এক চ্যালেঞ্জ স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এরূপ অবস্থাক্রমে সংঘ গ্রাম-রক্ষাকে নয়ী তালীমের শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রেরণা লাভ করেন এবং নয়ী তালীমের সংস্থাসমূহ ও নয়ী তালীমের কর্মিগণের নিকট এই আবেদন করেন যে, তাঁহারা

যেন ইহাকে নয়ী তালীমের কার্যক্রম স্বরূপ গ্রহণ করেন এবং ইহার দ্বারা ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন শুদ্ধ করেন এবং এরূপে নব-সমাজ রচনার কাজে সক্রিয়ভাবে যোগদান করেন।”

সংঘ আরও স্থির করেন যে ‘জাতীয় শিক্ষার এই কার্যক্রমের জন্য শিক্ষাক্রম রচনা করা, উহার জন্য কর্মী সংগ্রহ করা, তাঁহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং গ্রামে গ্রামে গ্রামবাসীদিগের সম্মতি ও সহযোগের ভিত্তিতে গ্রাম-শিক্ষার কাজ পরিচালনা করা হইবে তাঁহাদের ভাবী কার্যক্রম।’ এই সময় হইতে বহু নয়ী তালীমের শিক্ষক ও ছাত্র ভূদান-যজ্ঞ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগদান করেন এবং অনেকে গ্রামদানী গ্রামে গ্রাম-স্বরাজ্য গঠনের কাজে লাগিয়া যান। বহু নয়ী তালীমের কর্মী ও শিক্ষক শান্তি-সৈনিক হন। শান্তি-সৈনিকের শিক্ষাদানের কাজও নয়ী তালীম গ্রহণ করেন। এরূপে নয়ী তালীমের নব পর্ব আরম্ভ হইয়া যায়।

তালীমী সংঘের বিলয়ন

মহাত্মা গান্ধীর তিরোধানের অব্যবহিত পরে ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে সারা ভারতের গঠনকর্মিগণ সেবাগ্রামে মিলিত হন। কিরূপ সংগঠন করিলে গান্ধী প্রদর্শিত পথে যে রচনাত্মক কাজ চলিতেছে তাহা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হইবে তাহা গভীরভাবে বিচার বিবেচনা করিয়া সম্মেলন সর্বসেবা সংঘ গঠন করেন। উক্ত সম্মেলনের অভিপ্রায় ছিল যে মহাত্মা গান্ধী প্রতিষ্ঠিত সমস্ত রচনাত্মক সংস্থা সর্বসেবা সংঘে বিলীন হউক এবং সর্বসেবা সংঘ সারা ভারতের রচনাত্মক কাজের একমাত্র মুখপাত্র এবং পথ-প্রদর্শক সংস্থা স্বরূপ গড়িয়া উঠুক। তদনুসারে নিখিল ভারত কাটুনী সংঘ, নিখিল ভারত গ্রামোদ্যোগ সংঘ, গো সেবা সংঘ এবং হিন্দুস্তানী প্রচার সভা সর্বসেবা সংঘে বিলীন হয়।

একমাত্র তালিমী সংঘের সর্বসেবা সংঘে অন্তর্ভুক্তি বাকি ছিল। ১৯৫৯ সালের মে মাসে পাঞ্জাব রাজ্যের রাজপুরাতে নিখিল ভারত বুনিয়াদী শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনে বিনোবাজী হিন্দুস্তানী তালীমী সংঘ

যাহাতে অবিলম্বে সর্বসেবা সংঘে বিলীন হয় তজ্জন্য বিশেষভাবে আগ্রহ প্রকাশ করেন। ইহাতে সেইস্থানে হিন্দুস্তানী তালীমী সংঘ দীর্ঘ আলোচনা ও বিবেচনার পর 'সর্বসেবা সংঘে মিলিয়া যাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন! অতঃপর ১৯৫৯ সালের জুন মাসে কাশ্মীরে পদযাত্রার সময় জম্মুতে বিনোবাজীর সমক্ষে হিন্দুস্তানী তালীমী সংঘ ও সর্বসেবা সংঘের প্রবন্ধ সমিতির এক যুক্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং ঐ সভায় সর্বসেবা সংঘে বিলীন হওয়া সম্পর্কিত খুঁটিনাটি বিষয়সমূহ আলোচিত হইবার পর তালীমী সংঘের সর্বসেবা সংঘে বিলীন হইবার সিদ্ধান্ত চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়। অখিল ভারত সর্বসেবা সংঘে তালীমী সংঘের এই বিলীনীকরণ মহাত্মা গান্ধীর রচনাত্মক কার্যের সংগঠনের ইতিহাসে এক মহান ঘটনা বলিয়া বিবেচিত হইবে।

মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসকে এই উপদেশ দিয়া যান—

'দেশের স্বাধীনতা লাভ কংগ্রেসের লক্ষ্য ছিল। স্বাধীনতা লাভ হইয়া গিয়াছে। এখন কংগ্রেসের জন-সমাজের সেবার কাজেই আত্মনিয়োগ করা উচিত ও তজ্জন্য উহার লোকসেবক সংঘে পরিণত হওয়া উচিত।'

বিনোবাজী বলেন যে উহা কংগ্রেসের পক্ষে মহাত্মা গান্ধীর সর্বশেষ উইল স্বরূপ ছিল। মহাত্মা গান্ধী চাহিয়াছিলেন যে এক লোকসেবক সংঘ গঠিত হউক এবং তাহাতে কংগ্রেস পরিপূর্ণভাবে বিলীন হউক। উপরন্তু খাদি, পল্লীশিল্প, নয়ী তালীম, স্ত্রীজাতির উন্নয়ন, হরিজন-সেবা, হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য, শান্তি-সেনা প্রতিষ্ঠা, আর্থিক সাম্যপ্রতিষ্ঠা ইত্যাদি তাঁহার যে সব রচনাত্মক কার্যক্রম ছিল তাহা যে সকল সংস্থার দ্বারা পরিচালিত হয় সেই সব সংস্থা এবং তাহাদের কর্মিগণ সকলে উক্ত লোকসেবক সংঘের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবে।

কংগ্রেস ও গঠনমূলক সংস্থা ও উহার কর্মিগণ সকলে যদি এরূপে মিলিতভাবে লোকসেবক সংঘ গড়িয়া তুলিতেন তাহা হইলে সমগ্র দেশে উহার প্রভূত প্রভাব পড়িত এবং উহা দেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সেবা সংস্থায় পরিণত হইত। তাহার ফলে দেশের মধ্যে এক বিরাট নৈতিক শক্তির উদ্ভব হইত এবং তাহার দ্বারা জনগণকে ঠিকপথে পরিচালিত করিতে পারা যাইত, নিষ্কাম ও নিষ্পক্ষভাবে জনগণের সেবা করিবার সু-ব্যবস্থা

হইত, তাহাদের সম্মুখে নৈতিক বিচার উপস্থিত করা সম্ভব হইত এবং সরকারের কোন ভুল হইলে নিরপেক্ষভাবে তাহা জনগণের সম্মুখে তুলিয়া ধরা সম্ভব হইত। কংগ্রেস যদি তাহা করিতে পারিতেন তবে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে কংগ্রেসের যে পুণ্যলাভ হইয়াছিল তাহার প্রকৃত সদ্ব্যবহার করা হইত এবং ঐ পুণ্যের ফলও বহুগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইত।

কিন্তু কংগ্রেসের নেতৃবর্গ ভাবিয়াছিলেন যে দেশকে বিশৃঙ্খলার হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য কংগ্রেসের পক্ষে রাজকার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করা নিতান্ত আবশ্যক। এজন্য কংগ্রেস গান্ধীজীর নির্দেশ পালন করিতে পারেন নাই। উহার পরিণাম আজ যেরূপ দাঁড়াইয়াছে বিনোবাজী তাহার নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। তিনি বলেন,—

"এই কারণে আজ এই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে এক নৈতিক ধ্বনি উঠান হইবে এবং দেশের সব লোক তদনুসারে কাজ করিবে—এরূপ কোন সংস্থা বা ব্যক্তি আজ দেশে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। এককালে কংগ্রেসের নেতা দেশের নেতা ছিলেন। এখন তিনি দল বিশেষের নেতা হইয়া পড়িয়াছেন। নূতন নূতন দল সৃষ্টি হইতেছে এবং উহাদের নেতৃবৃন্দ জনসমাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পরস্পর পরস্পরের কথা খণ্ডন করিতেছেন। ইহাতে নিষ্ক্রিয় জনগণের মধ্যে কোনপ্রকার ক্রিয়াশীলতা আসিতেছে না। একে অপরের কথার প্রভাব নষ্ট করিতেছেন। যাহাকে আমরা নৈতিক নেতৃত্ব বলিয়া থাকি তাহার সম্পূর্ণ অভাব ঘটিয়াছে। এরূপ বৃহৎ সংস্থা বা সমাজ আজ নাই যাহা নিজ শক্তিতে সমগ্র দেশের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে এবং দেশকে ভুল রাস্তা হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে। ইহার ফলে দেশে একপ্রকার নিষ্ক্রিয়তা, শূন্যতা ও রিক্ততা আসিয়া গিয়াছে। জনসাধারণ বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। কোন্ দিকে চলিবে আর কোন্ দিকে চলিবে না তাহা লোকে বুঝিতে পারিতেছে না। এক নেতা বলিতেছেন—'এইদিকে চল'। তো অন্য নেতা আসিয়া বলিতেছেন—'ঐদিকে চল'।

"এইরূপ অবস্থায় জনগণের মধ্যে স্বতন্ত্র শক্তি সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এতটা শক্তি জনগণের মধ্যে আসে নাই যাহাতে তাহারা ঠিকভাবে চিন্তা করিতে পারে ও নিজেরা নিজেদের সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া লইতে

পারে। এক নেতা অন্য নেতাকে গালি দিয়া থাকেন ও তাঁহার কথা খণ্ডন করেন। তখন সেই অন্য নেতা প্রথম নেতাকে উল্টা গালি দেন এবং লোকে উভয়ের গালি শুনিয়া থাকে। এই সংকট হইতে উদ্ধার করিবার তারক শক্তির অভাব স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। যদি গান্ধীজীর উপদেশ অনুসরণ করা হইত তবে এরূপ অবস্থা আজ ঘটিত না।"

সর্বসেবা সংঘ গঠনের পশ্চাতে যে কি বিচার ছিল তাহা ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতে পারে। তাহা হইতেছে এই—কংগ্রেস তো গান্ধীজীর উপদেশ পালন করিতে পারিলেন না; এই অবস্থায় গঠনমূলক সংস্থাসমূহ তথা দেশের গঠনমূলক কর্মিগণ গান্ধীজীর উপদেশ পালন করিয়া একই সংস্থার মধ্যে মিলিত হইয়া যতটা সম্ভব গান্ধীজীর অভিপ্রেত নৈতিক শক্তি গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিবে। তাই এ সম্পর্কে বিনোবাজী বলেন,—

"এরূপ চিন্তা করা হয় যে গান্ধীজীর পরে সেইরূপ শক্তি সৃষ্টি নাও হইতে পারে। কিন্তু অন্তত লোকের পথ দেখাইবার জন্য এবং তাঁহাদিগকে পরামর্শ দিবার জন্য একটি সংস্থা থাকা আবশ্যক। এরূপ চিন্তা করিয়া সর্বসেবা সংঘ গঠন করা হয়।"

যে যে কারণে তালীমী সংঘের সর্বসেবা সংঘে বিলীন হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন ছিল তাহা প্রধানত এই—

(১) নয়ী তালীমকে ভূদানযজ্ঞের এক কার্যক্রম স্বরূপ উহার সহিত যুক্ত করার প্রয়োজন হইয়াছে।

(২) এখন সরকারের দ্বারা নয়ী তালীমের প্রকৃত কাজ হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু উহার অনুকূলে ব্যাপক জনমত সৃষ্টি না হইলে তাহা হইবার সম্ভাবনা কম। এজন্য সকলে মিলিতভাবে চেষ্টা করিয়া এই জনমত সৃষ্টি করিতে হইবে।

(৩) সরকার বুনিয়াদী শিক্ষাকে দুইভাগে বিভক্ত করিতে চাহিতেছেন। প্রথম ভাগে পাঁচ বৎসর ও দ্বিতীয় ভাগে তিন বৎসর। কোন্ শ্রেণী হইতে ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ করা যায় এই সমস্যারও উদ্ভব হইয়াছে। উপরন্তু ভবিষ্যতে সমস্ত শিক্ষাই নয়ী তালীমে পরিণত করিবার কল্পনা সরকারের সম্মুখে রহিয়াছে। সরকারের দ্বারা ব্যাপকভাবে নয়ী

তালীমের কাজ করাইতে হইলে কোন কোন বিষয়ে বেশী কড়াকড়ি করা চলিবে না। এইসব ব্যাপারে সকলে একমত হইয়া দৃঢ়ভাবে সরকারের সহিত বুঝাপড়া করিয়া লওয়া প্রয়োজন।

(৪) ভূদানযজ্ঞ আন্দোলন গ্রামদান ও গ্রাম-স্বরাজ্য আন্দোলনে রূপান্তরিত হওয়ায় নয়ী তালীমের ক্ষেত্র ব্যাপক হওয়ার ও উহার রূপ বদলাইবার সুযোগ আসিয়াছে।

সর্বসেবা সংঘের সহিত তালীমী সংঘের এই মিলন বিরাট সম্ভাবনা-পূর্ণ। কারণ বিনোবাজী চাহেন যে খাদি, গ্রামোদ্যোগ ইত্যাদি অন্য যে সব রচনাত্মক কাজ চলিতেছে সে সমস্তই নয়ী তালীমের অঙ্গ স্বরূপ করিয়া চালাইতে হইবে। বাস্তবিক পক্ষে সমাজ-গঠনের সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টা বয়স্ক শিক্ষার কার্যক্রম বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত। আর প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ সব রচনাত্মক কাজ নূতন সমাজ-গঠনের শিক্ষাক্রম বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত। এই দৃষ্টিতে দেখিলে বুঝা যায় মহাত্মা গান্ধী কেন বলিয়াছিলেন যে নয়ী তালীম তাঁহার সর্বশেষ ও সর্বোত্তম দান। নয়ী তালীমের মধ্যে তাঁহার অন্য সব গঠনকর্মের মিলন সাধিত হইয়াছে। এইজন্য তিনি ঐরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন। বিনোবাজী এ সম্পর্কে বলেন,—

"আমাদের লক্ষ লক্ষ কাটুনী রহিয়াছে। সারা দেশে আমাদের দুই-তিনশত ছোট-বড় আশ্রম রহিয়াছে যাহার মাধ্যমে খাদি, পল্লীশিল্প প্রভৃতির কাজ চলিতেছে। কিন্তু এই সব কাজের মধ্যে নয়ী তালীম বিশেষভাবে প্রবেশ করিতে পারে নাই। ...এজন্য সর্বসেবা সংঘের এখন এই কাজ গ্রহণ করিতে হইবে এবং উহার সমস্ত কাজে নয়ী তালীমের রং লাগাইতে হইবে। যদি তাহা করা হয় তবে ব্যাপক কাজ কিভাবে করিতে হয় আমরা তখন তাহা অনুভব করিতে পারিব। সরকার ব্যাপক কাজ করেন। আমরাও ব্যাপক হইতে পারি। আমাদের সর্বপ্রকার কাজের মধ্য দিয়া বোধহয় ২০-২৫ লক্ষ লোকের সহিত আমাদের সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে। কিভাবে এরূপ ব্যাপক-রূপে কাজ করা যায় আমাদিগকে তাহার নমুনা সৃষ্টি করিয়া দেখাইতে হইবে। দেশের কাছে ইহার প্রয়োজন আছে। আমাদের সমস্ত কাজে নয়ী তালীমের রং দিতে হইবে এরূপ আমি মনে করি। ঐ

রং করার দ্রব্য হইবে নয়ী তালীম। যদি উহা জলে গলিয়া যায় তবে জলেও ঐ রং লাগিবে।"

সুতরাং যাঁহারা রচনাত্মক কাজের সহিত যুক্ত আছেন তাঁহাদের সকলের মধ্যে নয়ী তালীমকে প্রবেশ করাইতে হইবে। দেশের সমস্ত গঠনমূলক কর্মপ্রচেষ্টাকে নয়ীতালীমের অঙ্গ স্বরূপ গড়িয়া তুলিতে হইবে। তাহা হইলে নয়ী তালীমকে ব্যাপকভাবে চালাইবার নমুনা জনগণের সমক্ষে উপস্থাপিত করা যাইতে পারিবে। সরকারও তখন নয়ী তালীম ব্যাপক-ভাবে চালাইবার প্রেরণা লাভ করিবেন। এরূপে নয়ী তালীমের বিশ্বরূপ ধারণ করিবার পথ প্রশস্ত হইবে।

তালীমী সংঘ বিলয়নের পর

হিন্দুস্তানী তালীমী সংঘ সর্বসেবা সংঘে মিলিত হওয়ায় নয়ী তালীমের বিকাশের দায়িত্বভার সর্বসেবা সংঘের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। এই দায়িত্বের স্বরূপ কি তাহা বুঝিয়া লওয়া প্রয়োজন। তালীমী সংঘ যখন নিজের বিলীনীকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন তালীমী সংঘ উহার আভাস দিয়াছেন। ঐ সময়ে তালীমী সংঘ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে নিম্নলিখিত সপ্তবিধ উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া নয়ী তালীমের ভাবী কার্যক্রম রচিত হওয়া আবশ্যক। ঐ সপ্তবিধ উদ্দেশ্য হইতেছে এই :—

(১) নয়ীতালীমকে রাষ্ট্রব্যাপী করিতে হইবে।

(২) গ্রামদান ও গ্রাম-স্বরাজ্যের পৃষ্ঠভূমিকায় নয়ী তালীমের নব বিকাশের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৩) কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার নয়ী তালীমের যে কাজ হাতে লইয়াছেন সে সম্পর্কে তাঁহাদের পথ-প্রদর্শন করিতে হইবে।

(৪) নয়ী তালীমের শিক্ষা-পদ্ধতি ও শিক্ষা-বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক উন্নতি সাধন করিতে হইবে।

(৫) যে সব সংস্থা সর্বোদয়ের কাজ করিতেছেন তাঁহাদের সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টাকে নয়ী তালীমের রং-এ রাঙাইতে হইবে।

(৬) বিপ্লব প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ও শান্তি সু-প্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য দেশের সমস্ত জনগণকে প্রস্তুত করিতে হইবে।

(৭) জীবনে মূলভূত আধ্যাত্মিক শ্রদ্ধার বিকাশ সাধন করিতে হইবে।

গঠনকর্মে নয়ী তালীমের রং

বিনোবাজী চাহেন যে নয়ী তালীমের ব্যাপক রূপ প্রদর্শনের জন্য রচনাত্মক কাজকে নয়ী তালীমের রং-এ রঞ্জিত করিতে হইবে। ইহা লইয়া গঠনকর্মীদের মধ্যে আলোচনা চলিতেছে। নয়ী তালীমের কর্মিগণও বিনোবাজীর এই কল্পনাকে রূপ দিবার প্রযত্ন করিতেছেন। কিন্তু রচনাত্মক কাজকে নয়ী তালীমের রং-এ রঞ্জিত করিবার প্রকৃত অর্থ কি? উহার জন্য কি করিতে হইবে? অর্থাৎ উহা করিতে হইলে বর্তমানে রচনাত্মক কাজ যে ভাবে চলিতেছে তাহার কিরূপ পরিবর্তন বা সংশোধন সাধন করার প্রয়োজন হইবে তাহা বুঝিয়া লওয়া প্রয়োজন।

গঠনমূলক কাজ সংস্থা বা আশ্রমের মাধ্যমে চালিত হইয়া থাকে। গঠন-কর্মীগণ সংস্থায় থাকেন। ইহা ছাড়া সংস্থায় বিভিন্ন কাজের শিল্পীরা থাকেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কোন এক খাদি সংস্থার কথা ধরুন। উহাতে গঠনকর্মীরা থাকেন, তাঁহারা ঐ কাজ চালাইয়া থাকেন। তাঁহারা কাটুনীদের দ্বারা সূতা কাটান, বয়নশিল্পীদের দ্বারা কাপড় বুনাইয়া লন, ধোলাইকরের দ্বারা কাপড় ধোলাই করান, রং-এর কারিগরের দ্বারা উহা রং করান এবং অবশেষে ভাণ্ডারের মারফৎ উহা বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করেন। এইরূপে এই কাজের সঙ্গে যাঁহারা সংশ্লিষ্ট আছেন তাঁহাদিগকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ (১) সংস্থা, (২) গঠনকর্মী, ও (৩) শিল্পী।

সংস্থার কর্তৃপক্ষ, সংস্থার কর্মী ও শিল্পী ইহাদের সকলের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য নয়ী তালীমের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সাধারণ স্কুল-কলেজের শিক্ষা নহে। উপরন্তু শিল্পী বা তাঁহাদের পরিবারবর্গের মধ্যে যাঁহাদের বয়স্ক-শিক্ষা লওয়া প্রয়োজন তাঁহাদিগকে নয়ী তালীম পদ্ধতিতে বয়স্ক-শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। নয়ী তালীমের রং-এ রঞ্জিত করার অর্থ কি মাত্র এইটুকু? না, তাহা নহে। তাঁহাদের সন্তানদিগের জন্য নয়ী

তালীমের ব্যবস্থা করিতে হইবে। অর্থাৎ তাঁহাদের শিক্ষার রং যে পরিবর্তন করিতে হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এইমাত্র হইলে চলিবে না। ঐ গঠনকর্মেরই রং বদলাইতে হইবে এবং উহাতে নয়ী তালীমের রং লাগা চাই। নিম্নলিখিত ভাবে অগ্রসর হইলে তাহা করা যাইবে :—

(১) খাদির সামাজিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য (সোশিও ইকনমিক পারপশ্) কি এবং অহিংস বিপ্লবে উহার স্থান কোথায় সে সম্বন্ধে সংস্থার পরিচালকবর্গ, কর্মীবৃন্দ ও শিল্পীবৃন্দ সকলেরই সুস্পষ্ট জ্ঞান হওয়া চাই। মহাত্মা গান্ধী বলিতেন, 'সূতা বুঝিয়া-সুঝিয়া কাট,' অর্থাৎ কেন সূতাকাটা হইতেছে তাহা ঠিকমত বুঝিয়া সূতা কাটা প্রয়োজন। চরকা অহিংসার প্রতীক। উপরন্তু অহিংস সমাজ গঠনে খাদির স্থান কোথায় তাহা সকলের ঠিকমত বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। তবেই ঠিকমত বুঝিয়া সূতা কাটা হইবে। খাদি অহিংসার প্রতীক, যে নব-সমাজ গঠন করা আমাদের লক্ষ্য তাহা পল্লীশিল্পপ্রধান হইবে এবং পল্লীশিল্পসমূহের সৌরজগতে খাদি সূর্যস্বরূপ হইবে। এই সব বিষয় সম্যকভাবে বুঝিতে ও উপলব্ধি করিতে হইবে।

(২) সূতাকাটা, বয়ন প্রভৃতি কাজ বৈজ্ঞানিক—বুদ্ধি সহকারে উহাদের অর্থ করিতে হইবে। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রক্রিয়ার (প্রোশেস্) 'কি ও কেন' বুঝিয়া লইতে হইবে। আর উহা বুঝিতে হইলে তৎসম্বন্ধীয় যে যে জ্ঞানের প্রয়োজন তাহাও শিখিয়া লইতে হইবে।

এইভাবে গৃহশিল্পের কাজ চলিতে থাকিলে তবে গৃহশিল্পগুলির মধ্যে প্রাণ সঞ্চারিত হইবে। সূতাকাটা, বয়ন, তৈল-নিষ্কাষণ ইত্যাদি সমস্ত গৃহ-শিল্পের কাজ আজ সংশ্লিষ্ট শিল্পীগণ জড়বৎ চালাইতেছেন। তাহার ফলে শিল্পগুলি নির্জীব হইয়া রহিয়াছে। এজন্য মহাত্মা গান্ধী চাহিয়াছিলেন যে নয়ী তালীমের দ্বারা আমাদের গৃহশিল্পগুলিতে এইভাবে প্রাণের সঞ্চার করা হউক।

১৯৪৫ সালে যখন নয়ী তালীমের বয়স্ক-শিক্ষা প্রবর্তন করিবার আয়োজন চলিতেছিল, সেই সময়ে পুণায় বয়স্ক-শিক্ষা সমিতির বৈঠক হইয়াছিল। ঐ বৈঠকে মহাত্মা গান্ধী প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বয়স্ক-শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছিলেন। উহা হইতে কতকটা বুঝা যায় যে কিরূপে গৃহশিল্পের

কাজে নয়ী তালীমের রং লাগানো যায়। কমিটির সিদ্ধান্তে ইহা বলা হইয়াছিল যে গঠনমূলক সংস্থাসমূহ কোন না কোন প্রকারে প্রৌঢ় শিক্ষার কাজ করিতেছেন ও উহার সহায়তা করিতেছেন। ইহার উপর মন্তব্য করিয়া মহাত্মা গান্ধী বলেন :—

"সকল সংস্থা এই কাজে সাহায্য করিতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা কেবলমাত্র শিল্প শিক্ষা দিতেছেন। আমার মত মানুষ উহাকে শিক্ষা বলিবে না। আমি তো বলিব যে এই সকল সংস্থা বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে যে সব শিল্প শিখাইতেছেন সেই সব শিল্পই শিক্ষার বাহন স্বরূপ। প্রৌঢ় শিক্ষার কাজ হইবে ঐ সব শিল্পের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করা। আজ যদি আমরা মনে করি যে আমরা এই সব কাজের দ্বারা প্রৌঢ় শিক্ষার কাজ করিতেছি তবে প্রৌঢ় শিক্ষাকে হত্যা করা হইবে ইহা বুঝিয়া রাখুন। তালীমী সংঘ ও চরকা সংঘ উভয় স্থানে খাদির কাজ চলিতেছে। কিন্তু তালীমী সংঘের কাজকে এরূপ আকর্ষনীয় করিতে হইবে যাহাতে চরকা সংঘ বলিতে থাকে—তালীমী সংঘের দ্বারা আমাদের কাজ পুষ্ট হইতেছে। এইভাবে শিল্প ও ঘানি শিক্ষার বাহন হইতেছে। উহা শিক্ষার বাহনরূপেই তালীমী সংঘের কাছে আসিয়া থাকে। যদি অন্যান্য সংস্থা প্রৌঢ় শিক্ষার কাজ করিতে থাকে তবে তালীমী সংঘের কাজ বন্ধ করিয়া দিবার প্রয়োজন হইবে। ইহা প্রৌঢ় শিক্ষার বৈচিত্র্য। উহার ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ নহে—উহা ব্যাপক।"

বিনোবাজী এক্ষণে মহাত্মা গান্ধীর এই স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করিবার প্রযত্ন করিতেছেন এবং নয়ী তালীমের দৃষ্টিতে গৃহশিল্প চালাইয়া উহার মধ্যে প্রাণসঞ্চার করিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

(৩) গঠনকর্মীদের যাঁহারা যে পল্লীশিল্পের কাজ করেন তাঁহাদিগকেও সেই শিল্পের প্রত্যেক খুঁটিনাটি প্রক্রিয়া উপর্যুক্ত রূপ বুদ্ধিপূর্বক ও বৈজ্ঞানিকভাবে শিক্ষা করিতে হইবে। উপরন্তু নব-সমাজ গঠনে খাদি প্রভৃতি গৃহশিল্পের স্থান কোথায় এবং উহাদের প্রয়োজন কি তাহা ভালভাবে বুঝা ও উপলব্ধি করা উচিত। তবেই তাঁহারা কাটুনী, তাঁতী প্রভৃতিকে উহা শিখাইতে পারিবেন।

(৪) ক্রান্তির অভিমুখে সংস্থার মোড় ফেরা চাই। শোষণহীন, শাসনমুক্ত, স্বাবলম্বী ও অহিংস সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য সম্মুখে রাখিতে হইবে। সংস্থার কর্মনীতিতে ও উহার প্রত্যেক খুঁটিনাটি কাজে ঐ আদর্শ প্রতিভাত হওয়া চাই। তবেই নয়ী তালীমের রং লাগিবে। এজন্য সংস্থার ব্যবসায়ী (কমার্শিয়াল) খাদি প্রস্তুত করা চলিবে না। গ্রাম-স্বাবলম্বনের ভিত্তিতে ঐ কাজ চলা উচিত। সংস্থার নিজেরই ব্যক্তিগত মালিকানা বিসর্জনের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। উহার নিজস্ব ভূমি থাকিলে তাহা গ্রামকে সমর্পণ করা উচিত। উহার আয় সীমিত হওয়া উচিত ও আয়ের অধিকাংশ ক্রান্তির কাজে ব্যয়িত হওয়া উচিত। এইভাবে সংস্থারও অপরিগ্রহের দিকে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।

(৫) সংস্থার কর্মীদের ব্যক্তিগত আয়ের সমতা থাকা চাই। অন্তত তাঁহাদের আয়ের মধ্যে যেন অধিক বৈষম্য না থাকে। উপরন্ত তাঁহাদের অপরিগ্রহের দৃষ্টি সম্মুখে রাখিয়া চলিতে হইবে।

গঠনমূলক কাজ নয়ী তালীমের রং-এ রঞ্জিত হওয়ার আরও কি কি অর্থ হইতে পারে তাহা কাজ করিতে করিতে বুঝা যাইবে।

নয়ী তালীম সম্মেলনের ইতিহাস

প্রায় প্রতি বৎসর একবার সমগ্র দেশের নয়ী তালীমের কর্মীগণ ও নয়ী তালীম অনুরাগীগণ দেশের কোন এক স্থানে দুই-তিন দিনের জন্য অখিল ভারত নয়ী তালীম সম্মেলনে মিলিত হইয়া থাকেন। হিন্দুস্তানী তালীমী সংঘের আহ্বানে ও পরিচালনায় এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উহাতে বিগত বৎসরে কাজের যে প্রগতি হইয়াছে তাহার পর্যালোচনা করা হয়। দেশের বিভিন্ন অংশের কাজে যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে তাহার বিবরণ পঠিত ও আলোচিত হয়। কাজে যে সব অসুবিধা ও যে সব সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে তাহার সমাধান করিবার জন্য বিচার-বিবেচনা করা হয়। নয়ী তালীমের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য আলোচনা করা হয়। উহাতে অধ্যয়ন মণ্ডলীরও বৈঠক হয়। তাহাতে নয়ী তালীমের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে গভীরভাবে বিচার করা হয়।

উপরন্তু সম্মেলন নয়ী তালীমের কর্মীগণের পক্ষে এক 'স্নেহ সম্মেলন' স্বরূপ হইয়া থাকে। বৎসর অন্তে তাঁহাদের এরূপভাবে মিলিত হইবার সুযোগ হওয়ায় তাঁহাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বভাবের বিকাশ হইতেছে। তাঁহারা পরস্পরকে এক পরিবারভুক্ত বলিয়া মনে করিতে শিখিতেছেন। ইহার ফলে একতাসূত্রে এক মহান লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। সম্মেলনের সঙ্গে নয়ী তালীমের প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। আশা দেবী উহাকে প্রদর্শনীর পরিবর্তে 'নয়ী তালীমের পরিচয়' আখ্যা দিবার পক্ষপাতী। অর্থাৎ নয়ী তালীম কি ও তাহার কিরূপ প্রগতি হইতেছে তাহার পরিচয় উহা হইতে পাওয়া যায়। এরূপে নয়ী তালীমের বিকাশসাধনে অখিল ভারত নয়ী তালীম সম্মেলনসমূহের যে মহান ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রহিয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এজন্য উহার ইতিহাস জানিয়া রাখা প্রয়োজন। 'উদ্গম ও বিকাশ' অধ্যায়ে উক্ত নয়ী তালীম সম্মেলন সম্পর্কে কিছু কিছু উল্লেখ করা হইয়াছে।

এক্ষণে অধিবেশনগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইল :

১ম : বোম্বাই প্রদেশের কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলের নিমন্ত্রণক্রমে ১৯৩৯ সালের নভেম্বর মাসে পুণা নগরে প্রথম নয়ী তালীম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তখন সেবাগ্রামে ও কতিপয় রাজ্যে নয়ী তালীমের শিক্ষক শিক্ষণের কাজ চলিতেছিল এবং ঐ সব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংলগ্ন অভ্যাস বিদ্যালয়গুলিতে নয়ী তালীম প্রণালীতে কিছু কিছু শিক্ষণ কার্যও চলিতেছিল। উহাদের যেটুকু প্রগতি হইয়াছিল তাহার বিবরণ সম্মেলনে উপস্থিত করা হয়। তাহাতে কর্মীদের উৎসাহ বর্ধিত হয়। সম্মেলনের অধিকাংশ আলোচনা নয়ী তালামের তাত্ত্বিক বিষয় সম্পর্কেই হইয়াছিল। সম্মেলনের কিছু পূর্বে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। সম্মেলনের অধিবেশনের মধ্যেই সংবাদ আসে যে যুদ্ধের পরিস্থিতির কারণে কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলগুলি পদত্যাগ করিয়াছেন। উহার ফলে যে সব প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডল নয়ী তালীমের কাজ হাতে লইয়াছিলেন সেই সব প্রদেশে নয়ী তালীমের কাজ বিঘ্নিত হইবে এরূপ আশঙ্কা সম্মেলনে উপস্থিত সকলের মনে জাগিয়াছিল। তথাপি সম্মেলন শেষে সকলে আত্মবিশ্বাস ও উৎসাহ লইয়া প্রত্যাবর্তন করেন।

২য় ঃ দ্বিতীয় সম্মেলন ১৯৪১ সালের মে মাসে দিল্লীতে ডঃ জাকির হোসেন সাহেবের 'জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া'তে অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেসী মন্ত্রী-মণ্ডলগুলি পদত্যাগ করায় যে সব প্রদেশে সরকারের পক্ষ হইতে বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ চালানো হইতেছিল তাহাদের অধিকাংশ স্থানে ঐ কাজ আর তেমন ভালভাবে চলিতেছিল না। দুই একটি প্রদেশে উহা বন্ধ করিয়াই দেওয়া হইয়াছিল। সুতরাং বিভিন্ন প্রদেশের এরূপ অসুবিধার কথা এই সম্মেলনে উপস্থিত করা হয়। দুই বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলাফল বিবেচনা করিয়া শিক্ষাক্রমের আবশ্যকীয় সংশোধনের কথাও বিবেচনা করা হয়।

৩য় ঃ ১৯৪৫ সালের জানুয়ারী মাসে সেবাগ্রামে ডঃ জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে তৃতীয় সম্মেলনের অধিবেশন হয়। এই সম্মেলন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মধ্যে কয় বৎসর ভারতে গণ-আন্দোলন চলিতেছিল। মহাত্মা গান্ধী জেল হইতে বাহির হইয়াই নয়ী তালীম সম্প্রসারণ করিবার জন্য যে প্রস্তাব করেন তাহা এই সম্মেলনে উপস্থাপিত করা হয়। সম্মেলনে পূর্ব-বুনিয়াদী, উত্তর বুনিয়াদী ও বয়স্ক-শিক্ষাকে নয়ী তালীমের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য সুপারিশ করা হয়। যে সব ছাত্র বুনিয়াদী শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছিল তাহাদের ৮ বৎসরের শিক্ষাকাল সমাপ্ত হইয়া আসিতেছিল। এজন্য উত্তর বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বিচার বিবেচনা করা হয়।

৪র্থ ঃ সকল প্রদেশের মধ্যে একমাত্র বিহারে (সরকারের পক্ষ হইতে) ১৯৩৯ সাল হইতে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ৮ বৎসরকাল নিরবিচ্ছিন্নভাবে বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ চলিয়াছিল। এজন্য এরূপ মনে করা হইয়াছিল যে যদি অখিল ভারত নয়ী তালীম সম্মেলনের অনুষ্ঠান বিহারে করা হয় তবে অন্যান্য প্রদেশের সকলে বুনিয়াদী শিক্ষার স্বরূপ প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়া প্রেরণালাভ করিতে পারিবেন। তদনুসারে চতুর্থ নয়ী তালীম সম্মেলন ১৯৪৮ সালে বিহারের অন্তর্গত পাটনা জেলার বিক্রম বুনিয়াদী ট্রেনিং বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। তৎপূর্বে তো দেশের স্বাধীনতা লাভ হইয়া গিয়াছিল। কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারসমূহের প্রতিনিধিগণ এবং গঠনকর্মীগণ ঐ সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন। উক্ত সম্মেলনে বিনোবাজী ও ডঃ জাকির হোসেন সাহেব তাঁহাদের বক্তৃতায় নয়ী তালীমের বিচার প্রাঞ্জলভাবে সকলের সম্মুখে উপস্থিত করেন। ঐ সম্মেলনের আলোচনাসমূহ পর্যালোচনা

করিলে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে নয়ী তালীমের সরকারী এবং বে-সরকারী সঞ্চালকগণ নয়ী তালীমকে একই অর্থে গ্রহণ করেন নাই।

৫ম ঃ পঞ্চম সম্মেলন ১৯৪৯ সালে মাদ্রাজ রাজ্যের কোয়েম্বাটুর সার্কেলের পেরিয়নায়কম-পালয়ম নামক গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। মাদ্রাজ সরকারের ভূতপূর্ব শিক্ষামন্ত্রী শ্রীঅবিনাশলিঙ্গম য়েহিয়র নয়ী তালীমের একজন উৎসাহী সমর্থক ছিলেন এবং তিনি ঐ সময়ে হিন্দুস্তানী তালীমী সংঘের সদস্যও ছিলেন। পেরিয়নায়কম-পালয়ম গ্রামে এক উত্তম বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্র চলিতেছিল। তিনি উক্ত কেন্দ্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। নয়ী তালীমে অভিজ্ঞ ও অধ্যাপক অরুণাচলম্ ঐ শিক্ষণকেন্দ্র পরিচালনা করিতেছিলেন। ঐ সময়ে মাদ্রাজ রাজ্যে ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণদের ঝগড়া চলিতেছিল। মাদ্রাজের গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসী হইল অ-ব্রাহ্মণ। অ-ব্রাহ্মণদের মধ্যে এরূপ অপপ্রচার করা হইতেছিল যে নয়ী তালীম শিক্ষা-ব্যবস্থা ভাল নহে এবং সেজন্য উহা অ-ব্রাহ্মণদের মধ্যেই চালাইবার চেষ্টা করা হইতেছে। এজন্য নয়ী তালীম সম্পর্কে গ্রামের লোকের মনোভাব প্রতিকূল ছিল।

যদিও নয়ী তালীমের পক্ষে খুবই উপযোগী স্থানে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইতেছিল তথাপি এই পরিস্থিতিতে কাহারও কাহারও মনে সম্মেলনের সফলতা সম্পর্কে সন্দেহ ছিল। অপপ্রচারের ফলে লোকের মনে যে সব শংকার সৃষ্টি হইয়াছিল বিনোবাজী ও ডঃ জাকির হোসেন সাহেব তাহা অনেকাংশে দূর করেন এবং সম্মেলনে তাঁহাদের উভয়ের বক্তৃতা খুব প্রেরণাদায়ক হইয়াছিল। সম্মেলন আশাতীতভাবে সফল হইয়াছিল।

৬ষ্ঠ ঃ অতঃপর ১৯৫০ সালে উড়িষ্যার আঙ্গুল নামক স্থানে ষষ্ঠ সম্মেলনের অধিবেশন হয়। আঙ্গুল উড়িষ্যার পুণ্যস্মৃতি 'গোপবাবুর' (শ্রীগোপবন্ধু চৌধুরী) বিশিষ্ট কর্মক্ষেত্র ছিল। সেখানে তদীয় ভ্রাতা নবকৃষ্ণ চৌধুরী (উড়িষ্যার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী যিনি সর্বোদয়ের তথা ভূদানযজ্ঞের কাজে একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করিবার জন্য মুখ্যমন্ত্রীত্ব তথা রাজনৈতিকদলের সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়াছেন) এবং তাঁহার পত্নী মালতী চৌধুরী নয়ী তালীম তথা সর্বোদয়ের পথে গ্রাম সংগঠনের অন্যান্য কাজ চালাইতেছিলেন। আঙ্গুলে সেই সময় সর্বোদয় সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হইল।

সর্বোদয় সম্মেলনের সঙ্গে নয়ী তালীম সম্মেলনের অনুষ্ঠান হওয়া এই প্রথম। ইহার এক অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল। নয়ী তালীম অনুসারে 'নব মানব' গঠন না করিলে সর্বোদয়-সমাজ প্রতিষ্ঠার দিকে অধিকদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব নহে। নয়ী তালীম যদি পারিপার্শ্বিক জনগণের জীবনের সহিত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা না করিয়া বিদ্যালয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিয়া যায় তবে বিদ্যালয় এবং উহার ছাত্র বা শিক্ষক সকলের মধ্যে তেজস্বিতার অভাব থাকিয়া যাইবে। আঙ্গুলের সম্মেলন সর্বোদয়ের সহিত নয়ী তালীমের এই ওতঃপ্রোত সম্পর্ক সম্বন্ধে সকলকে সজাগ করিয়াছিল।

৭ম ও ৮মঃ অতঃপর সপ্তম (১৯৫১) ও অষ্টম (১৯৫২) উভয় সম্মেলন সেবাগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। সেবাগ্রামে এই কয় বৎসরের মধ্যে নয়ী তালীমের প্রায় সকল স্তরের ও সকল অবস্থার শিক্ষার (যথা—বুনিয়াদী, পূর্ব-বুনিয়াদী, উত্তর বুনিয়াদী ও সামাজিক) বিকাশ সাধিত হইয়াছিল। সেখানে সঙ্গীত, কলা ও অন্যান্য মনোরঞ্জনমূলক কার্যক্রমের শিক্ষণ ও অনুশীলনের সহিত সমন্বয় সাধন করিয়া নয়ী তালীমের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা চলিতেছিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে নয়ী তালীমের কল্পিত নব সমাজের সংগঠন কাজও অগ্রসর হইতেছিল। সেখানে হিন্দুস্তানী তালীমী সংঘের নিজস্ব কৃষিক্ষেত্র ও দুগ্ধালয় স্বতন্ত্রভাবে মিতব্যয়িতা ও যোগ্যতার সহিত চলিতেছিল।

উপরন্ত সেবাগ্রাম, ওয়ার্ধা ও পওনারের গঠন সংস্থা ও আশ্রমগুলি মহাত্মা গান্ধী, বিনোবাজী, কুমারাপ্পাজী প্রভৃতির নেতৃত্বে সুচারুভাবে পরিচালিত হইয়াছিল। নয়ী তালীম সম্মেলনের পক্ষে এমন অনুকূল পরিবেশ আর হইতে পারে না। এইজন্যই সেখানে পর পর দুইটি অধিবেশনের আয়োজন করা হইয়াছিল।

ঐ উভয় সম্মেলনেই কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির প্রতিনিধিগণ, বিভিন্ন গঠনমূলক সংস্থার বিশিষ্ট পরিচালকগণ এবং সরকারী ও বে-সরকারী নয়ী তালীম শিক্ষাকেন্দ্রসমূহের কর্মীগণ যোগদান করিয়াছিলেন। ঐ সম্মেলন দুইটির কার্যক্রম পূর্ব-পূর্ব সম্মেলন হইতে স্বতন্ত্রভাবে চলিয়াছিল। উহা ঐ দুই সম্মেলনের বৈশিষ্ট্য ছিল। ছয়দিন ধরিয়া অধিবেশন হয়। প্রথম তিনদিন নয়ী তালীমের শিক্ষক, পরিদর্শক এবং নয়ী তালীমের

কর্মীগণের কার্যক্রম চলিয়াছিল। বুনিয়াদী শিক্ষা, উত্তর বুনিয়াদী শিক্ষা, উত্তম বুনিয়াদী শিক্ষা, সামাজিক শিক্ষা, আর্থিক সমস্যা ইত্যাদি বিষয়ের পৃথক পৃথক অধ্যয়ন-মণ্ডলী গঠন করা হয় এবং যাঁহার যে বিষয় সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বা বিশেষ রুচি আছে, তিনি সেই বিষয়ের মণ্ডলীতে বসিয়া আলোচনা করেন। এইভাবে কর্মীরা বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে চিন্তা করিবার ও নিজেদের অভিজ্ঞতার অনুভূতি পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান করিয়া নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার সুযোগ-সুবিধা লাভ করেন। অতঃপর অধ্যয়ন-মণ্ডলীগুলির আলোচনার সারাংশ মূল অধিবেশনে উপস্থাপিত ও আলোচনা করা হয়।

শেষের তিন দিন নিখিল ভারত বুনিয়াদী শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তাহাতে কর্মীগণ ছাড়া সরকারী শিক্ষা বিভাগীয় অফিসারগণ, বুনিয়াদী সংস্থাসমূহের ব্যবস্থাপক, সঞ্চালক ও পরিদর্শকগণ এবং নয়ী তালীমে আগ্রহশীল বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যোগদান করেন। এই সম্মেলনও কয়েকটি অধ্যয়ন-মণ্ডলাতে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা করেন। সেবাগ্রামের এই দুই সম্মেলনে নয়ী:তালীমের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাসমূহ খুবই প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যাত হয় ও সকলের সমক্ষে উপস্থিত করা হয়। যে সব সরকারী কর্মচারী সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহারা বিশেষ অনু-প্রেরণা লাভ করেন।

৯ম ঃ নবম সম্মেলন ১৯৫৩ সালে আসাম প্রদেশের টীটাবর নামক স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন আসাম সরকারের পক্ষ হইতে আহ্বান করা হয় ও সম্মেলনে আসামের রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী নয়ী তালীমের প্রতি তাঁহাদের নিজ নিজ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সম্মেলনের সভাপতি কাকা সাহেব কালেলকর তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে সরকারের নিজের হিতের জন্যই নয়ী তালীমের প্রতি তাঁহাদের কর্তব্য পালন করা উচিত এবং নয়ী তালীমে উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে মান্যতা দান করা উচিত।

১০ম ঃ নবম সম্মেলন ভারতের সুদূর পূর্বপ্রান্তে হইবার পর বৎসর (১৯৫৪) পরবর্তী দশম সম্মেলন দেশের বিপরীত প্রান্ত সৌরাষ্ট্রের সনোসরা নামক স্থানে কাকা সাহেব কালেলকরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে অধ্যয়ন-মণ্ডলীর যে বৈঠক হয় তাহাতে ভূদানযজ্ঞ সম্পর্কে নয়ী তালীমের

কর্তব্য, লোক শিক্ষণ, উত্তর বুনিয়াদীতে জনসম্পর্ক, শিক্ষক-প্রশিক্ষণ, নয়ী তালীম বিষয়ক সাহিত্য রচনা প্রভৃতি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়।

১১শ : অতঃপর ১৯৫৫ সালের মে মাসের শেষভাগে মাদ্রাজ রাজ্যে কাঞ্চিপুরম সর্বোদয় সম্মেলনের সময় বিনোবাজীর উপস্থিতিতে ও কাকা সাহেব কালেলকরের সভাপতিত্বে একাদশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে বিনোবাজী উদ্বোধনী বক্তৃতা দান করেন। তিনি সম্মেলনেও বক্তৃতা করেন। উভয় বক্তৃতায় তিনি নয়ী তালীমের তত্ত্ব ও বিচারধারা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন। সেবাগ্রামের উত্তম বুনিয়াদী স্নাতক-ছাত্রগণকে উপাধি-পত্র বিতরণ করা হয়। উপরন্তু সম্মেলনের দিন বিনোবাজী প্রার্থনা প্রবচনে তাঁহার প্রস্তাবিত 'এক ঘণ্টার পাঠশালা'র শিক্ষাক্রম বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করেন। তাহাতে এক ঘণ্টার পাঠশালা সম্বন্ধে অনেকের মনে যে সব সন্দেহ ছিল তাহা দূরীভূত হয়।

১২শ : ১৯৫৭ সালের নভেম্বর মাসে বিহারের তুর্কী নামক স্থানে (জেলা মজঃফরপুর) আর্যনায়কমজীর সভাপতিত্বে দ্বাদশ নয়ী তালীম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ডঃ জাকির হোসেন উহার উদ্বোধন করেন। এই সম্মেলনে আর্যনায়কমজী মাদ্রাজে এগার মাস যাবৎ বিনোবাজীর পদযাত্রার সঙ্গে থাকিয়া নয়ী তালীম সম্বন্ধে যে নূতন দৃষ্টি লাভ করেন তাহার উল্লেখ করেন। পূর্বে বলা হইয়াছে যে সেই দৃষ্টি হইতেছে গ্রামদানী গ্রামে নয়ী তালীমের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ। তদনুসারে নয়ী তালীমের কর্মীগণকে গ্রামদানী গ্রামে গ্রাম-নির্মাণের কাজে যোগদান করার জন্য আহ্বান করা হয়। এই সম্মেলনে আর্যনায়কমজী নয়ী তালীমের শিক্ষক সংগ্রহের জন্য এক ক্রান্তিকারী প্রস্তাব করেন। ঐ প্রস্তাবের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি সুপারিশ করেন যে যাঁহারা শরীর-শ্রমের দ্বারা জীবিকা অর্জন করেন তাঁহাদের মধ্য হইতে নয়ী তালীমের শিক্ষক সংগ্রহ করিতে হইবে। তবেই নয়ী তালীমের দ্বারা শ্রম-আধারিত সমাজ নির্মাণের নমুনা তৈয়ারীর কাজ সফল হইতে পারিবে। মধ্যবিত্ত শ্রেণী হইতে যে সব শিক্ষক আসিয়াছেন তাঁহারা আদর্শ দৃষ্টিসম্পন্ন হইলেও শরীরের দিক হইতে শ্রমের কাজে খুব বেশী সমর্থ নহেন। তাঁহাদের অন্তরে ক্রান্তির বিচার আছে কিন্তু তাহাকে কার্যে পরিণত করার মত শারীরিক সামর্থ্য নাই।

১৩শ : ত্রয়োদশ সম্মেলন (১৯৫৯) পাঞ্জাবের রাজপুরা নামক স্থানে 'কস্তুরবা সেবা মন্দিরে' অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সময়ে রাজপুরায় সর্বসেবা সংঘের বৈঠকও হয়। তখন পাঞ্জাবে বিনোবাজীর পদযাত্রা চলিতেছিল। বিনোবাজী সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। এই সম্মেলনে আর্যনায়কমজী তাঁহার বক্তৃতায় মন্তব্য করেন যে,—

"সরকারী অফিসারদের নয়ী তালীমের প্রতি বিশ্বাস না থাকায় ইহা অসফল বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে এবং উহা পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িতেছে।"

এই সম্মেলনে বিনোবাজী হিন্দুস্তানী তালীমী সংঘের অবিলম্বে সর্বসেবা সংঘে বিলীন হইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং তদনুসারে হিন্দুস্তানী তালীমী সংঘ ঐ স্থানেই দীর্ঘ আলোচনার পর সর্বসেবা সংঘে আত্মবিলীন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই কারণে নয়ী তালীমের প্রগতির ইতিহাসে এই সম্মেলন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং ইহা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

সরকার নিরপেক্ষ শিক্ষা-ব্যবস্থা

পুরাকালে ভারতে শিক্ষা কম ছিল না। শিক্ষা সর্বপ্রথম ভারতেই আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু রাজারা কখনও শিক্ষা-ব্যবস্থার উপর হস্তক্ষেপ করিতেন না। গুরুই স্থির করিতেন—কি শিক্ষা দেওয়া হইবে এবং কিভাবে শিক্ষা দেওয়া হইবে। রাজশক্তি শিক্ষার জন্য সাহায্য দান করিতেন। রাজপুত্রগণও গুরুগৃহে বিদ্যার্জন করিতে যাইতেন। কিন্তু তাঁহাদের জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা থাকিত না। তাঁহারা সাধারণ ছাত্রদের সহিত একসঙ্গে ও একভাবে থাকিতেন। রাজা গুরুকে শিক্ষার বাবদ সাহায্য দান করিতেন বটে, কিন্তু রাজপুত্রদের শিক্ষার জন্য বিশেষভাবে কিছু দিতেন না। এরূপে শিক্ষা ও শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিপূর্ণ স্বাধীনতা তখন ছিল। শিক্ষার এতটা স্বাধীনতা ছিল বলিয়াই ভারতবর্ষে প্রকৃত চিন্তন-স্বাতন্ত্র্য ও বিচার-স্বাতন্ত্র্য ছিল। বিনোবাজী বলেন,—

"যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন তাঁহারা জানেন যে হিন্দুধর্মে কিরূপ বিচার-স্বাতন্ত্র্য আছে। এরূপ অন্য কোন ধর্মের কথা আমার জানা

নাই, যাহাতে পরস্পর বিরোধী বিচারসমূহ স্থান পাইয়াছে। অন্য সব ধর্মে মাত্র একটি করিয়া বিচার আছে। হিন্দুধর্মে কপিল, কনাদ, জৈমিনী প্রভৃতির বিচার পরস্পর বিরুদ্ধ ছিল। কিন্তু কেহ এ কথা বলে না যে উহারা হিন্দুধর্মের বিরোধী।"

আজকাল জগতের সকল দেশেই রাজশক্তি সর্বগ্রাসী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতেও তাহাই। জীবনের এমন কোন ক্ষেত্র নাই যেখানে রাষ্ট্রশক্তি তাহার নিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত না করিতেছে। সর্বত্র শাসন ব্যবস্থা এমনভাবে পরিচালিত হইতেছে যাহাতে জনগণ ক্রমশ সরকারের উপর অধিক নির্ভরশীল হইয়া পড়িতেছে। সরকার লোককে স্বাবলম্বী করিয়া গড়িয়া তুলিবার পরিবর্তে সরকারাবলম্বী করিয়া গড়িয়া তুলিতেছেন। সরকার পিতামাতার স্থান গ্রহণ করিয়াছেন।

আজ সারা জগৎ ভীত হইয়া রহিয়াছে। যে সব দেশের হাতে প্রচুর আণবিক অস্ত্রশস্ত্রাদি আসিয়াছে তাহারাও পরস্পরের ভয়ে ভীত হইয়া রহিয়াছে। যাহাদের হাতে তাহা নাই, মামুলী অস্ত্রশস্ত্রেরও প্রাচুর্য নাই তাহারাও ভীত। সকল সরকারই নিজ নিজ দেশের জনগণের মনে এই ধারণা সৃষ্টি করিতেছে যে অস্ত্রবল যত বৃদ্ধি করা হইবে তত ভয় কমিয়া যাইবে। কিন্তু আণবিক অস্ত্রশস্ত্র বৃদ্ধি করিয়াও ভয় কমিতেছে না। অথচ জনগণকে শিখানো হইতেছে যে অস্ত্র আছে বলিয়াই শান্তি রহিয়াছে।

জনগণের মনে এই ধারণা সৃষ্টি করা সম্ভব হইতেছে; কারণ শিক্ষা সরকারের নিয়ন্ত্রণে আসিয়া গিয়াছে। আজকাল পৃথিবীর সকল দেশেই শিক্ষা সরকারের হাতে আসিয়া গিয়াছে। ছেলেমেয়েদিগকে যাহা শিখানো হইতেছে তাহাই শিখিতেছে। এই কারণে স্বতন্ত্র লোকমত সৃষ্টি হইতেছে না। ভোট দিবার অধিকার সকলের আছে বটে, কিন্তু রাষ্ট্রশক্তি প্রকৃতপক্ষে কয়েকজনের হাতে থাকিয়া যাইতেছে। গণতন্ত্র প্রায় নামমাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে। ঐ শাসক গোষ্ঠী যাহা করিবেন তাহাই ঠিক—এই ধারণা জনগণের মধ্যে গড়িয়া উঠিতেছে। এইজন্য বিনোবাজী বার বার বলিতেছেন,—

"শিক্ষা-ব্যবস্থার অধিকার সরকারের হাতে থাকা উচিত নহে। উহা তো জ্ঞানীদের হাতেই থাকা উচিত। কারণ এই কাজ সেবা-পরায়ণতার দ্বারাই সিদ্ধ হইতে পারে।"

এই সবের ফল ক্রমশ এই দাঁড়াইয়াছে যে দেশের জনগণ একেবারেই সরকার মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছে। মানুষের যেটুকু অভিক্রম (ইনি-শিয়েটিভ্) ছিল তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। লোকের মধ্যে এক নূতন ধরণের জড়তা আসিয়া গিয়াছে। তাহা হইতেছে এই: জনগণের কাজ হইতেছে দলের মনোনীত পছন্দমত লোককে ভোট দেওয়া। ভোট দেওয়া হইয়া গেলে লোকের কর্তব্য শেষ হইয়া গেল। আর যেন তাহাদের কিছু করিবার নাই। তখন যাহা কিছু করিবার সরকারই করিবে। এজন্য প্রতি ব্যাপারে সরকারের নাম উচ্চারণ ছাড়া গতি থাকে না।

এই অবস্থা হইতে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হইতেছে চিন্তা ও বিচারে স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু শিক্ষা-স্বাতন্ত্র্য না থাকিলে চিন্তা ও বিচার স্বাতন্ত্র্য সহজভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে না। এই অবস্থায় শিক্ষা সরকারের করতলগত থাকিলেও বিদ্যার্থীদিগকে তাহাদের চিন্তনের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে।

এইজন্য বিনোবাজী বলেন,—

"সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের অধিকার যদি কাহারও থাকা দরকার হয় তবে তাহা ছাত্রদের।"...

"এইজন্য ছাত্রগণ যেন কখনও তাহাদের চিন্তার স্বাধীনতা হারাইয়া না ফেলেন।"...

"আমাদের নিজেদের চিন্তা-স্বাধীনতার উপর আঘাত হানিতে দেওয়া ঠিক হইবে না। নিজেদের স্বতন্ত্রতার অধিকার সুরক্ষিত রাখা চাই। সর্বত্র ছাত্রদের এই অধিকার কাড়িয়া লওয়া হইতেছে। এজন্য আমি ছাত্রদিগকে সতর্ক করিয়া দিতে চাহিতেছি। আজকাল ডিসিপ্লিন্ বা নিয়মানুবর্তিতার নামে ছাত্রগণের মস্তিষ্ককে যন্ত্রের মধ্যে ঢালিবার চেষ্টা করা হইতেছে।"

শিক্ষা সরকারের নিয়ন্ত্রণে চলিয়া যাওয়ায় অবস্থা আরও ভয়ঙ্কর হইয়া দাঁড়াইতেছে। এমন শিক্ষা দেওয়া হইতেছে যাহাতে ছাত্রেরা সরকারই সব এই শিক্ষা লাভ করিয়া বাহির হয়। উপরন্তু সরকার যে-দলের সেই দলেরই আদর্শ ও নীতি অনুযায়ী শিক্ষা প্রবর্তিত হইতেছে। তাহাতে ছাত্রের মনো-বৃত্তি সেই দলের আদর্শের ছাঁচে গড়িয়া উঠিতেছে। বর্তমানে সমগ্র জগতে

এইভাবে ছাত্রদিগকে একই ছাঁচে ঢালিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে। বিনোবাজী বলেন,—

"এইজন্যই শিক্ষার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা নিজেদের আয়ত্তে রাখাই বর্তমান পৃথিবীর সকল দেশের সরকারের বিশেষ প্রচেষ্টা। এই অবস্থা খুবই বিপজ্জনক। ইহার দ্বারা বুদ্ধির উপরও নিয়ন্ত্রণ 'রেজিমেণ্টেশন' আসিয়া যায়।"

এইজন্যই বিনোবাজী বার বার এই কথা বলিয়া আসিতেছেন যে আজ সম্ভব হউক বা না হউক, যদি কোন বিষয় সরকারের হাত হইতে মুক্ত করিতে হয় তবে শিক্ষাকে সর্বপ্রথম সরকারের কবল হইতে মুক্ত করা প্রয়োজন। কমিউনিস্ট সরকারকে উচ্ছেদ করিবার জন্য কেরলে যখন গণ-আন্দোলন চলিতেছিল তখন বিনোবাজী শিক্ষাকে সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলিবার সময় মন্তব্য করেন যে,—

"ইহার প্রয়োজনীয়তা যে সর্বাধিক তাহা কেরলে আজ যাহা চলিতেছে তাহা হইতে বিশেষভাবে বুঝা যাইতেছে। কিন্তু আমি ইহা মনে করি না যে আজ কেরলে যাহা চলিতেছে তাহা অন্যান্য প্রদেশের অবস্থা হইতে ভিন্ন। অন্যান্য প্রদেশেও শিক্ষার উপর সরকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রহিয়াছে। কাহাকেও উহার বিরুদ্ধে কিছু করিতে দেওয়া হয় না।"

আজকালকার সরকারের ক্ষমতা সর্ব-ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং সরকারী কার্য পরিচালনার জন্য সরকারকে সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক কর্মচারী নিযুক্ত করিতে হয়। অর্থাৎ সরকারই আজকাল সর্বাপেক্ষা বৃহৎ নিয়োগকর্তা। এই অবস্থায় প্রশ্ন উঠিতে পারে যে যদি সরকারের হাতে শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ না থাকে তবে তাঁহাদের কাজের জন্য যেরূপ যোগ্যতা-সম্পন্ন লোক আবশ্যক তদ্রূপ লোক নিয়োগের ব্যাপারে সরকার বিশেষ অসুবিধায় পড়িবেন। কিন্তু এরূপ আশঙ্কার কারণ নাই। কর্মচারী নিয়োগের সময় সরকার যদি পদপ্রার্থীদিগকে বিশদভাবে পরীক্ষা করিয়া লইবার ব্যবস্থা রাখেন তবে কোনই অসুবিধা হইবে না। আর সরকার পরিচালিত ঐ পরীক্ষায় উপস্থিত হইবার জন্য এরূপ কোন বাধানিষেধ থাকিবে না যে অমুক পর্যন্ত পাশ না হইলে অমুক পদের জন্য যে পরীক্ষা হইবে তাহাতে পরীক্ষা দিতে দেওয়া হইবে না। এরূপ শিক্ষা-স্বাতন্ত্র্য থাকিলে তবে

শিক্ষার প্রকৃত বিকাশ হইতে পারিবে। কোন বিশেষ শিক্ষাধারা বা শিক্ষা প্রণালীর প্রতি সরকারের কোন পক্ষপাতিত্ব থাকা উচিত নহে। পক্ষপাতিত্ব না থাকিলে শিক্ষাপ্রণালী ও শিক্ষাধারার গুণাগুণ সম্বন্ধে অবাধ গবেষণা চলিতে পারিবে। সরকার সকলকেই আর্থিক সহায়তা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দান করিতে থাকিবেন। এদেশে পুরাকালে এইরূপই ছিল। এরূপ স্বাতন্ত্র্য থাকিলে তবে নয়ী তালীমের প্রসারের পক্ষে অনুকূল ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতে পারিবে।

সরকারী বা বে-সরকারী কাজে নিয়োগের জন্য স্কুল-কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষা পাশের সর্ত আরোপ না করিয়া নিয়োগের পূর্বে সরকার কর্তৃক বা বে-সরকারী নিয়োগকর্তা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অভীষ্ট পদের যোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা উচিত। এই প্রস্তাব সম্পর্কে এরূপ আপত্তি করা হইয়াছে যে তাহাতে কর্মপ্রার্থী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা এত বেশী হইবে যে ঐ পরীক্ষা গ্রহণ করার ব্যবস্থা করা কঠিন হইবে। ইহার উত্তরে বিনোবাজী বলেন যে পরীক্ষার ফি বেশী করিয়া রাখিলে ঐরূপ কোন অসুবিধার উদ্ভব হইতে পারিবে না। তাহাতে যাঁহাদের প্রয়োজনানুরূপ যোগ্যতা প্রমাণের সম্ভাবনা নাই তাঁহারা আসিবেন না। উপরন্তু ফি বেশী রাখিলে পরীক্ষার ব্যবস্থা করার পক্ষেও কোন অসুবিধা হইবে না। বিনোবাজী এই বিষয় সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর সহিত আলোচনা করিয়াছিলেন এবং তাহাতে তিনি কতকটা অনুকূল মত দেন। অতঃপর ঐ বিষয় সম্পর্কে বিচার-বিবেচনার জন্য সরকারের অভ্যন্তরে এক কমিটি নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু উক্ত কমিটি এরূপ রায় দেন যাহাতে বুঝা যায় যে বিষয়টির গুরুত্ব ও অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া উহাকে কার্যত অগ্রাহ্যই করা হইয়াছে।

জাতীয় শিক্ষায় অহিংসা ও বিজ্ঞান

এখন আমাদিগকে পশ্চাৎদিকে চাহিয়া দেখিতে হইবে। সমস্ত সূত্র গুটাইয়া একত্রিত করিতে হইবে এবং সমগ্র দৃষ্টি হইতে উহার নিরীক্ষণ ও

বিচার করিতে হইবে। আমাদের জাতীয় শিক্ষার নামে আজ যাহা গড়িয়া তুলিবার প্রযত্ন করা হইতেছে তাহা কি কোন নূতন কল্পনা অথবা প্রাচীনকালে যাহা ছিল তাহার পুনরুদ্ধার? শিক্ষার প্রকৃত অর্থ হইতেছে যাহা অন্তর্নিহিত থাকে তাহার বহিঃপ্রকাশ সম্পাদন। যাহা ভিতরে নাই তাহা বাহির হইতে লাভ করা সম্ভব নহে। সুতরাং জাতীয় শিক্ষার প্রকৃত অর্থ হইতেছে জাতির প্রকৃতির মধ্যে যাহা অন্তর্নিহিত থাকে তাহা বাহিরে প্রকাশ করা। ভারতের এই অন্তর্নিহিত প্রকৃতি কি তাহা প্রাচীন ভারতের শিক্ষার আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে।

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের অনুপম ভাষায়—'ভারত পুরাকালে যে সম্পদের অধিকারী ছিল তাহা হইতেছে জ্ঞানে অদ্বৈততত্ত্ব, ভাবে বিশ্বমৈত্রী, কর্মে যোগ-সাধনা আর তাহার প্রকৃতির মধ্যে অন্তর্নিহিত রহিয়াছে বিশ্ব-জাগতিকতা।'

প্রাচীন ভারত তাহার শিক্ষার বলে এই সত্যকে উপলব্ধি করিয়াছিল 'নিজের প্রাণের দ্বারা, চেতনার দ্বারা, হৃদয়ের দ্বারা, বোধের দ্বারা, নিজের আত্মার সঙ্গে আত্মীয়রূপে।' প্রাচীন ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা ও শিক্ষা-প্রণালীও ছিল আদর্শ প্রণালী। পরে ভারতের বুকের উপর দিয়া অনেক প্রতিকূল প্রবাহ বহিয়া যায়। তাহার ফলে ভারত আত্মসম্বিৎ হারাইয়া ফেলিয়াছিল। তাঁহার জ্ঞান লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, উহা তাহার অন্তঃপ্রকৃতিতে সুপ্ত অবস্থায় ছিল। তাহার শিক্ষা-ব্যবস্থা, শিক্ষা-পদ্ধতিও নষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী ও সন্ত বিনোবার তপশ্চর্যার ফলে সেই সুপ্ত জ্ঞান জাগ্রত হইতেছে ও সেই হৃত ঐশ্বর্যের পুনরুদ্ধার হইতেছে। সুতরাং যে জাতীয় শিক্ষার সংগঠন করা হইতেছে তাহা নূতন নহে, তাহা পুরাতন। তাহা পুরাতনের পুনরুদ্ধার। আর শুধু তাহা নহে। পুরাতনের পুনরুদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে নবীন প্রাণশক্তির স্পর্শে তাঁহার মধ্যে অধিকতর শক্তি সঞ্চার করা হইতেছে। সেই প্রাণশক্তি হইতেছে বিজ্ঞান। প্রাচীনকালের শিক্ষায়ও বিজ্ঞানের যোগ ছিল। পরে ভারতে বিজ্ঞানের অবনতি ঘটে। আজ বিজ্ঞান বিশ্বজয়ী হইতে চলিয়াছে। ভারতের জাতীয় শিক্ষা কেবলমাত্র সুপ্ত পুরাতনকে জাগ্রত করিয়া সন্তুষ্ট থাকিবে না। তাহা হইলে তাহার

জ্ঞান পঙ্গু হইয়া থাকিবে, সে বিশ্বজগতে একঘরে হইয়া থাকিবে। বিজ্ঞানের শক্তিতে শক্তিমান হইয়া ভারতের জ্ঞান আর পঙ্গু হইয়া থাকিবে না, উহা পর্বত লঙ্ঘন করিবে। তাহার জ্ঞান বিজ্ঞানসাধনার সহিত যুক্ত হইয়া অণু হইতে অণুতম এবং বৃহৎ হইতে বৃহত্তম সকলের সঙ্গেই যোগ স্থাপনা করিবে। এই প্রসঙ্গে বিনোবাজী বলিয়াছেন,—

"নয়ী তালীমের দর্শন যাহাতে সঙ্কুচিত না হইয়া যায় সেদিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। আমরা 'মহাভারত' রচনা করিতে যাইতেছি। এজন্য ব্যাসদেবের ন্যায় আমাদের বুদ্ধি বিশাল হওয়া প্রয়োজন। আমরা গ্রামের মধ্যে জীবনযাপন করিলেও আমাদের মধ্যে বিশ্ব নাগরিকত্বের বোধ জাগ্রত হওয়া চাই। অহিংসা ও বিজ্ঞান এই উভয়ের যোগে ইহা হইতে পারে। যদি আমরা বিজ্ঞানের বিকাশ চাই তবে অহিংসার শক্তিবৃদ্ধি করিতে হইবে। আর যদি আমরা অহিংসা বৃদ্ধি করিতে না চাই তবে বিজ্ঞানের প্রগতি রোধ করিতে হইবে। নয়ী তালীমের অর্থ হইতেছে অহিংসা ও বিজ্ঞানের যোগ। এই যোগের দ্বারা আমরা পৃথিবীতে স্বর্গ আনয়ন করিতে পারি।"

ভাবী কার্যক্রম

অল্পাধিক ন্যূনতা থাকিলেও নয়ী তালীমের সর্বস্তরের শিক্ষার নমুনা আজ দেশের সম্মুখে আসিয়াছে। সর্বদিক হইতে সুগভীরভাবে উহাদের তত্ত্ব ও বিচারধারা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সরকার বুনিয়াদী স্তরের নয়ী তালীমকে (অপূর্ণ আকারে হইলেও) রাষ্ট্রীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা স্বরূপ মানিয়া লইয়াছেন ও কয়েক বৎসরের মধ্যে সর্বত্র প্রাথমিক শিক্ষাকে নয়ী তালীমের বুনিয়াদী শিক্ষার ধাঁচে পরিণত করিবার কল্পনা করিয়াছেন। দেশের বিভিন্ন অংশে সরকারী ও বে-সরকারী বহু বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং বহু পুরাতন ধরণের প্রাথমিক বিদ্যালয়কে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পরিণত করা হইয়াছে। ভারত সরকারের শিক্ষা-মন্ত্রণালয়ের সহকারী শিক্ষা-উপদেষ্টা ডঃ পি. ডি. শুক্ল বলিয়াছিলেন যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালের মধ্যে প্রায় ৮০ হাজার বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ৯০ লক্ষ ছাত্র-

ছাত্রী অধ্যয়ন করিতে থাকিবে। বিভিন্ন প্রদেশে সরকারী ও বে-সরকারী-ভাবে শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থাও অল্পাধিক হইয়াছে।

বিনোবাজী প্রবর্তিত ভূদানযজ্ঞ-'আরোহণ' গ্রামদান ও গ্রাম-স্বরাজ্য পর্যন্ত পৌঁছিয়া যাওয়ায় নয়ী তালীমের প্রগতির এক নূতন পথ খুলিয়া গিয়াছে। এখন প্রত্যেক সমগ্র গ্রামদানী গ্রামকে নয়ী তালীমের বিদ্যালয়ে পরিণত করা যাইতে পারে। বিনোবাজী সমস্ত রচনাত্মক কাজকেই নয়ী তালীমের রং-এ রঞ্জিত করিবার পরামর্শ দিয়াছেন।

এক্ষণে দেশের সর্বত্র সর্বস্তরের সমস্ত শিক্ষা-ব্যবস্থা নয়ী তালীমের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠা উচিত। অর্থাৎ নয়ী তালীম এক্ষণে রাষ্ট্রব্যাপী হওয়া উচিত। উপরন্ত সমস্ত রচনাত্মক কর্ম-প্রচেষ্টা শিক্ষার (নয়ী তালীম) কার্যক্রম স্বরূপ চলা উচিত। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমাদের সম্মুখের কার্যক্রম কিরূপ হওয়া প্রয়োজন এবং উহা সফল করিবার পথে কি কি সমস্যা ও অসুবিধার উদ্ভব হইতে পারে তাহা বিবেচনা করা প্রয়োজন।

(১) নয়ী তালীম তথা সর্বোদয়-নীতির ভিত্তিতে রচিত সর্বস্তরের জাতীয় শিক্ষার কার্যক্রম যাহাতে জনগণ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হন সেজন্য সুব্যবস্থিত আন্দোলন চালাইতে হইবে। এই আন্দোলনের স্বরূপ কি হইবে তাহা বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। শিক্ষাদানের পদ্ধতি হিসাবে নয়ী তালীমকে শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি স্বরূপ গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু কেবল শিক্ষা-দানের পদ্ধতি স্বরূপ ইহাকে গ্রহণ করিলে চলিবে না। কেবল পদ্ধতিরূপে নয়ী তালীম সার্থক হইবে না। নব-সমাজের আদর্শ অর্থাৎ সমাজ-ক্রান্তির ভাবনা জনগণের মধ্যে জাগ্রত হওয়া চাই এবং বাস্তব সমাজ-জীবনে তাহাকে রূপদান করিবার আগ্রহ আসা চাই। সমাজের বুনিয়াদ পরিবর্তন করিতে প্রস্তুত হইলে ও পরিবর্তনের জন্য প্রচেষ্টা করিতে থাকিলে তবেই বুনিয়াদী শিক্ষা তথা নয়ী তালীমের সার্থকতা সম্পাদিত হইবে। সুতরাং গুরুত্ব সেই দিকেই দিতে হইবে। সমাজের বুনিয়াদ পরিবর্তিত না হইলে বুনিয়াদী শিক্ষার বিশেষ কোন অর্থ নাই।

(২) যতদিন না সরকার নয়ী তালীমের নীতির ভিত্তিতে রচিত সর্ব-স্তরের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে মান্যতা দান করিতেছেন এবং ঐ শিক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে সরকারী ও বে-সরকারী সমস্ত কাজে যোগ্যতাসম্পন্ন বলিয়া

মানিয়া লওয়া না হইতেছে ততদিন জনসাধারণ নয়ী তালীম ভিত্তিক শিক্ষার উৎকর্ষতা উপলব্ধি করিলেও নিজেদের সন্তানদিগকে ঐ শিক্ষার উপর নির্ভর করাইতে সহজে সম্মত হইবেন বলিয়া মনে হয় না। আর্থিক দিক হইতে অনগ্রসর (আণ্ডারডেভেলপ্‌ড্ ইকনমী) দেশে চাকরির জন্য সকলের আগ্রহ থাকিবেই। যে সব শ্রেণী চাকরিজীবী নহেন তাঁহাদের মধ্যেও এরূপ আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। নয়ী তালীমের পক্ষে উহা অবজ্ঞা করা চলিবে না। ইহাকে মানিয়া লইয়া চলিতে হইবে।

এজন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য উভয় সরকারের সমক্ষে নয়ী তালীম ভিত্তিক সর্বস্তরের ও সর্বপ্রকারের জাতীয় শিক্ষার পরিকল্পনা উপস্থাপিত করিয়া তাহা গ্রহণ করাইবার জন্য প্রচেষ্টা করিতে হইবে। অর্থাৎ আন্দোলন জনগণ ও সরকার উভয়ের মধ্যেই চালাইতে হইবে। কিন্তু সরকারকে তখনই রাজী করানো সহজ হইবে যখন সরকার দেখিবেন ও বুঝিবেন যে জনগণ নয়ী তালীম ভিত্তিক শিক্ষা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক। এজন্য উভয় দিকে যুগবৎ প্রচেষ্টা হওয়া প্রয়োজন।

সরকারের সর্বস্তরের ও সর্বপ্রকারের শিক্ষাকে নয়ী তালীম ভিত্তিক রূপে মানিয়া লইয়া তাহা চালাইবার ব্যবস্থা করা বর্তমান অবস্থায় অনেক দূরের কথা। এখন প্রয়োজন হইতেছে বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে সমুচিত ব্যবস্থা করা।

পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে সরকার বুনিয়াদী শিক্ষাকে দুই পর্যায়ে বিভক্ত করিতে চাহিতেছেন। প্রথম পর্যায়ে ৫ বৎসর বা ৫টি শ্রেণী এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ৩ বৎসর বা ৩টি শ্রেণী। সরকার প্রথম পর্যায়কে দেশ-ব্যাপী করিবার ব্যবস্থা করিতে প্রস্তুত, কিন্তু তাঁহারা দ্বিতীয় পর্যায়কে দেশে সর্বব্যাপক করিতে চাহেন না। যদি অষ্টম শ্রেণীবিশিষ্ট বুনিয়াদী শিক্ষাকে সার্বজনীন ও আবশ্যিক করা না হয় তবে উহার মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে।

নয়ী তালীম ব্যবস্থায় আট বৎসরের বুনিয়াদী শিক্ষাকে শিক্ষার ন্যূনতম প্রয়োজন বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। কিন্তু সরকারের প্রস্তাব কার্যে পরিণত হইলে দেশের বহুতর ছেলেমেয়ের ৫ বৎসর শিক্ষাপ্রাপ্তির পর শিক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটিবে অথবা তাহাদিগকে ৫ম শ্রেণীর শিক্ষা শেষ করিয়া প্রচলিত সাধারণ বিদ্যালয়ে পড়িতে যাইতে হইবে। উভয় ক্ষেত্রেই ঐ ৫ বৎসরের শিক্ষা কার্যত ব্যর্থ হইবে। এইজন্য প্রথম জরুরী প্রয়োজন সরকারের দ্বারা

অবিভাজ্য ৮ বৎসরের বুনিয়াদী শিক্ষা কল্পনাকে গ্রহণ করানো, সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পরিণত করা এবং ৬ হইতে ১৪ বৎসর পর্যন্ত সমস্ত বালক-বালিকার জন্য বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যবস্থা করানো।

আর একটি জরুরী বিষয় হইতেছে উত্তর বুনিয়াদী শিক্ষাকে সরকার কর্তৃক মান্যতা দান (যাহার সম্বন্ধে পূর্বে কিছু আলোচনা করা হইয়াছে)। সরকারী মহলে এইরূপ ভুল ধারণা আছে যে বহুমুখী (মাল্‌টি-পারপাশ্‌) উচ্চ বিদ্যালয়গুলির দ্বারা উত্তর বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ হইবে। কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ডঃ কালুলাল শ্রীমালী ১৯৫৬ সালে সেবাগ্রামে অনুষ্ঠিত অখিল ভারত বুনিয়াদী সম্মেলনে বলেন,—

> "এই প্রকারে আমরা মানিয়া লইতে পারি যে বহুমুখী বিদ্যালয়গুলি মাধ্যমিক স্তরে বাস্তবিক পক্ষে বুনিয়াদী শিক্ষার সিদ্ধান্তসমূহ পালন করিয়া চলিবেন।"

ইহা ভ্রান্ত ধারণা। বহুমুখী বা বহু উদ্যোগী বিদ্যালয়গুলিতে আর্ট, বিজ্ঞান, বাণিজ্যনীতি ও বিভিন্ন শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা হইবে সত্য, কিন্তু তাহাতে ঐ সব বিভিন্ন হস্তশিল্পের কাজ ও জ্ঞানের মধ্যে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক থাকিবে না। 'নয়ী তালীমে সর্বোত্তম পদ্ধতি—সমবায়' (পৃঃ ১৬৬) শীর্ষক অধ্যায়ে যে 'সমুচ্চয়-পদ্ধতি'র কথা বলা হইয়াছে এই সব বহুমুখী বিদ্যালয়গুলিতে সেই 'সমুচ্চয়-পদ্ধতি'ই অনুসৃত হইতে পারে অর্থাৎ উহাতে সাধারণ শিক্ষা ও হস্তশিল্প শিক্ষার জন্য সমান সময় দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু একটির দ্বারা অন্যটির শিক্ষায় কোন সহায়তা হইবে না। হস্তশিল্প শিক্ষা একটি পৃথক ব্যাপার হইয়া থাকিবে এবং পুস্তকের বিদ্যাশিক্ষাও এক পৃথক ব্যাপার হইয়া থাকিবে। নয়ী তালীমের 'সমবায়-পদ্ধতি'র সহিত ইহার আকাশ-পাতাল পার্থক্য।

সুতরাং (১) সরকারকে ইহা বুঝিতে হইবে যে বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের দ্বারা কোনও রকমে নয়ী তালীমের উত্তর বুনিয়াদী স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে না, (২) সরকার যখন বুনিয়াদী শিক্ষাকে রাষ্ট্রীয় প্রাথমিক শিক্ষার স্বরূপ বলিয়া মানিয়া লইয়া উহাকে কার্যে পরিণত করিতে অগ্রসর হইয়াছেন তখন পরবর্তী স্তরে ভিন্ন নীতি অবলম্বন করার কোন অর্থ নাই। মাধ্যমিক শিক্ষাকে উত্তর বুনিয়াদীতে

পরিবর্তিত করাই উহার স্বাভাবিক পরিণতি হওয়া উচিত। কিন্তু তৎপূর্বে অবিলম্বে বে-সরকারী উত্তর বুনিয়াদী বিদ্যালয় হইতে যে সব ছাত্র উত্তীর্ণ হইতেছে তাহাদের মান্যতা দান করা প্রয়োজন। নচেৎ বে-সরকারীভাবে উত্তর বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসার বেশীদূর অগ্রসর হইবে বলিয়া মনে হয় না। উত্তর বুনিয়াদী উত্তীর্ণ ছাত্রগণ সাধারণ শিক্ষায়তনে তাহাদের পরবর্তী শিক্ষা লাভ করিতে চাহিলে তাহার সুযোগ পাওয়া চাই। উপরন্তু সরকারী বা অন্যান্য কাজের জন্য তাহাদের যোগ্যতা স্বীকৃত হওয়া উচিত।

বিহারে উত্তর বুনিয়াদী উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণের সমান বলিয়া মান্যতা দেওয়া হইয়াছে। অন্যান্য রাজ্য সরকার এ সম্বন্ধে কিছুই করেন নাই। অবিলম্বে যাহাতে অন্যান্য রাজ্য সরকার উত্তর বুনিয়াদী উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে স্বীকৃতি দান করেন তজ্জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করা প্রয়োজন। কিন্তু উত্তর বুনিয়াদী উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে ম্যাট্রিক পাশের সমান বলিলে অবিচার করা হয়। কারণ উত্তর বুনিয়াদীর শিক্ষার মান অন্তত ইণ্টারমিডিয়েটের সমান।

সরকারের পক্ষে নয়ী তালীমের সর্বস্তরের শিক্ষাকে মানিয়া লইয়া উহাকে রাষ্ট্রীয় শিক্ষা স্বরূপে গ্রহণ করার পথে একটি বড় সমস্যা হইবে ইংরেজী শিক্ষা। ইংরেজী শিক্ষা সম্পর্কে নয়ী তালীমের পরিচালকবর্গ (সর্বসেবা সংঘ) ও সরকারের মধ্যে এখনই বুঝাপড়া হওয়া প্রয়োজন। উভয়ের একই নীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। যদি এ সম্পর্কে উভয়ের একই নীতি অবলম্বন করার প্রয়োজনে নয়ী তালীমের ইংরেজী শিক্ষাসম্বন্ধীয় নীতিকে কিছু শিথিল করিতে হয় তবে তাহা করা উচিত। নচেৎ এই পার্থক্য উত্তর ও উত্তম বুনিয়াদী শিক্ষার সরকারী মান্যতা লাভের পক্ষে এবং উহাদের জনপ্রিয় হওয়ার পক্ষে এক বড় প্রতিবন্ধক হইয়া থাকিবে।

(৩) উন্নততর প্রয়োগ ও পরীক্ষার দ্বারা নয়ী তালীম পদ্ধতির উন্নতি সাধনের জন্য ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন।

(৪) নয়ী তালীমের অন্তিম লক্ষ্য হইতেছে নব-সমাজের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ শ্রম-আধারিত অহিংস সমাজের প্রতিষ্ঠা। নয়ী তালীম পদ্ধতিতে শিক্ষালাভের ফলে শরীর-শ্রমের প্রতি অনাদরের ভাব দূরীভূত হইতে থাকে এবং উহার প্রতি আকর্ষণ আসিতে থাকে। উহাতে সহযোগী, স্বাবলম্বী ও

সামূহিক জীবনযাত্রার শিক্ষা লাভ হয় এবং ঐরূপ জীবনযাত্রার মধ্য দিয়া যে আত্মবিশ্বাসের সৃষ্টি হয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ইহা মনে হইতে পারে যে যদি সরকার নয়ী তালীম ভিত্তিক রাষ্ট্রীয় শিক্ষার উচ্চতম স্তর পর্যন্ত মানিয়া লইয়া উহা ব্যাপকভাবে চালাইতে থাকেন, তবে এ দেশের সমাজ শ্রম-আধারিত হইয়া যাইবে। কিন্তু এই বিষয়ে একটু ধীরভাবে ভাবিয়া দেখা উচিত। আজ পর্যন্ত বুনিয়াদী, উত্তর বুনিয়াদী ও উত্তম বুনিয়াদী উত্তীর্ণ হইয়া যাহারা বাহিরে আসিয়াছে তাহাদের জীবনযাত্রার প্রণালী লক্ষ্য করিলে এই বিষয়ে কিছু আভাস পাওয়া যাইতে পারে। উত্তর বুনিয়াদী উত্তীর্ণদের একাংশ বিভিন্ন গঠনমূলক সংস্থাদিতে কাজ লইয়াছে। কেহ কেহ গ্রামদানী গ্রামে কাজ করিতেছে। তাহাদের কেহ কেহ উচ্চ বা উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য প্রচলিত স্কুল-কলেজে প্রবেশ করিয়া থাকিবে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কত জন অন্য দিকে আকর্ষণ থাকা সত্বেও সন্তুষ্টচিত্তে শ্রম-আধারিত জীবন স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়া স্বতন্ত্রভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছে তাহা সঠিক জানা নাই। তবে আমাদের যতটুকু জানা আছে তাহাতে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে যাহারা বুনিয়াদী বা উত্তর বুনিয়াদী শিক্ষোত্তীর্ণ হইয়া বাহির হইয়াছে তাহাদের সরকারী বা বে-সরকারী রচনাত্মক সংস্থায় হউক বা অন্যত্র হউক কোন একটি কাজ পাওয়ার দিকে ঝোঁক বেশী থাকে। অবশ্য যে সব কাজ তাহারা করিতেছে সে সকল যে সমাজ গঠনের কাজ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে কায়িক শ্রমমূলক স্বাধীন ও স্বাশ্রিত জীবনযাত্রার পথ গ্রহণ করিতে তাহাদের মধ্যে যে খুব বেশী আগ্রহ দেখা যায় তাহা মনে হয় না।

ইহার কারণ কি তাহা ভালভাবে চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। আজকাল প্রচলিত স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা হাজার হাজার হইতে লক্ষে লক্ষে পৌঁছিতেছে। ইহা দেখিয়া কেহ কেহ মনে করেন যে জ্ঞানপ্রাপ্তির আগ্রহ বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির অভিমত এই যে শরীর-শ্রম এড়াইবার উদ্দেশ্যেই এত লোক লেখাপড়া শিখিতে চাহিতেছে। বিনোবাজীও এরূপ কথা বলেন। এ কথার মধ্যে সার আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু কেবল কি শরীর-শ্রমের প্রতি অনাদর বা ঘৃণাই ইহার কারণ?

য়দি উহা একমাত্র কারণ হইত তবে যাহারা নয়ী তালীম উত্তীর্ণ হইয়াছে বা হইতেছে তাহাদিগকে স্বতন্ত্রভাবে শ্রমাশ্রিত জীবনযাপনের জন্য অধিক আগ্রহশীল দেখা যাইত। এমন হইতে পারে যে তাহাদের অন্তর হইতে শরীর-শ্রমের প্রতি অনাদরের ভাব চলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু স্বাবলম্বী জীবন যাপনের পক্ষে তাহাদের যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস জন্মে নাই। এজন্য কোন আশ্রমে বা রচনাত্মক প্রতিষ্ঠানে তাহারা স্বাবলম্বী জীবন নির্বাহ করিতে পারে, কিন্তু উহার বাহিরে স্বতন্ত্রভাবে শ্রম-আধারিত স্বাবলম্বী গৃহীর জীবন গ্রহণ করিতে তাহাদের খুব বেশী উৎসাহ দেখা যায় না। এই কারণও কোন কোন ক্ষেত্রে থাকিতে পারে।

আমাদের মনে হয় ইহার পশ্চাতে আর একটি প্রধান কারণ আছে, যে জন্য সরকার নয়ী তালীমকে রাষ্ট্রীয় শিক্ষার সর্বস্তরে গ্রহণ করিলেও সমাজের পক্ষ হইতে শ্রম-আধারিত হইবার দিকে খুব বেশী অগ্রগতি না হইতে পারে। তাহা হইতেছে কায়িক শ্রম ও বৌদ্ধিক শ্রমের কাজের মধ্যে আর্থিক মূল্য বা পারিশ্রমিকের পার্থক্য। যতদিন সমাজ কায়িক শ্রম অপেক্ষা বৌদ্ধিক শ্রমের পারিশ্রমিক বেশী দিতে থাকিবে অথবা (অন্যভাবে বলিতে গেলে) আজ বৌদ্ধিক কাজের দ্বারা সাধারণভাবে জীবনযাত্রার যে মান উপভোগ করা যায় শরীর-শ্রমের কাজ করিয়া তদ্রূপ জীবন মানে পৌঁছানো যতদিন সম্ভব না হইতেছে, ততদিন শ্রম-আধারিত জীবনের প্রতি আশানুরূপ আকর্ষণ সৃষ্টি করা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না।

ইহার উত্তরে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে বৌদ্ধিক ও কায়িক শ্রমের কাজের মধ্যে সামাজিক মর্যাদার পার্থক্য ঘুচিলে উহাদের ভৌতিক মূল্যের সমতা আপনা-আপনি আসিয়া যাইবে। নয়ী তালীমের শিক্ষার্থীদের অন্তরে শরীর-শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ জাগ্রত হয়। সুতরাং নয়ী তালীমের ব্যাপক প্রসার হইতে থাকিলে শ্রমমূলক কাজের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং তাহার পরিণাম স্বরূপ বৌদ্ধিক ও শ্রমমূলক কাজের মধ্যে মূল্যের যে পার্থক্য রহিয়াছে তাহা আর থাকিবে না।

কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে উভয়ের মধ্যে সামাজিক মর্যাদার পার্থক্য ঘুচিয়া যাইলেও মূল্যের পার্থক্য থাকিয়া যাইতে পারে। বর্তমানে সারাদিন তাঁত চালাইয়া (পরিবারের অন্য লোকের

সাহায্য লইয়াও) মাসিক চল্লিশ টাকার বেশী উপার্জন করা সম্ভব হয় না। সৎপথে থাকিয়া পাঁচ জনের এক পরিবারের কৃষিকার্যের দ্বারা বার্ষিক এক হাজার টাকার অতিরিক্ত উপার্জন করার কথা আজ এদেশে কল্পনা করা যায় না। এই অবস্থায় কেবলমাত্র শরীর-শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না। পয়সার উপর নির্ভরশীল অর্থব্যবস্থা যতদিন চলিতে থাকিবে ততদিন কায়িক ও বৌদ্ধিক উভয় কাজের পারিশ্রমিকের সমতাবিধানের প্রচেষ্টা স্বতন্ত্রভাবে করিতে হইবে।।

পয়সার উপর নির্ভরশীল অর্থব্যবস্থার কথা ছাড়িয়া দিয়াও যদ্যপি শরীর-শ্রমের দ্বারা জীবনধারণের পক্ষে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির উৎপাদনের দ্বারা স্বাবলম্বী জীবনযাপন করিবার কথা ধরা যায় তথাপি অবস্থার কোন ইতর-বিশেষ হইবে বলিয়া মনে হয় না। এক ব্যক্তি বা একটি পরিবার আজ কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা জীবনধারণের পক্ষে আবশ্যকীয় ও জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় যে প্রকার বা যে পরিমাণ দ্রব্যাদির সংস্থান করিতে পারে তাহার দ্বারা কোনও রকমে উহার জীবনযাত্রা নির্বাহ হইতে পারে মাত্র। কিন্তু উহাকে স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন বলা যায় না। নয়ী তালীম ভিত্তিক শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে জীবনমানকে যদৃচ্ছা বৃদ্ধি করার যে প্রলোভন রহিয়াছে তাহা দমিত হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু জীবনমান অতিবৃদ্ধি করার প্রলোভন দূরীভূত হইলেও আজ শরীর-শ্রমের দ্বারা যে জীবনমান লাভ হইয়া থাকে তাহাকে আরও বহুদূর উন্নীত করার সুযোগ না পাইলে শ্রম-আধারিত জীবনের দিকে স্বতঃস্ফূর্ত আকর্ষণ আসিবে না। কৃষি ও হস্ত-শিল্পের বৈজ্ঞানিক উন্নতির দ্বারা নয়ী তালীমকে দেখাইতে হইবে যে শ্রম-আধারিত জীবনই যথার্থ প্রাচুর্যময় জীবন।

জীবন অসংগ্রহী হওয়া উচিত। ইহা ঠিক কথা। কিন্তু প্রাচুর্য না থাকিলে সেদিকে সমাজ আকৃষ্ট হইবে না। পক্ষান্তরে কায়িক ও বৌদ্ধিক কাজের মধ্যে পারিশ্রমিকের পার্থক্য থাকিলেও চলিবে না। এই অবস্থায় শ্রম-আধারিত জীবনের দ্বারা অসংগ্রহী কিন্তু লক্ষ্মীমান জীবনের উপযোগী সংস্থান যে করা সম্ভব তাহার নমুনা সৃষ্টি করিয়া দেখাইতে হইবে। অপরিগ্রহী অথচ স্বচ্ছল জীবন কিরূপ তাহার আভাস বিনোবাজী দিয়াছেন। উহাতে এত খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইবে যাহাতে গ্রামে দুই বৎসরের খাদ্যশস্য

মজুত থাকিবে। আজ মাথাপিছু আড়াই ছটাক দুধ উৎপন্ন হয়। কিন্তু সেখানে মাথাপিছু একসের দুধ উৎপাদিত হইবে। খাঁটি ঘি প্রচুর পরিমাণে, পাওয়া যাইবে। কিন্তু দালদা পাওয়া যাইবে না। ফল, শাক-সব্‌জি মধু ইত্যাদি সচ্ছল জীবনের যাবতীয় উপকরণ প্রচুর পরিমাণে থাকিবে। অকেজো জিনিস (সিগারেট প্রভৃতি) থাকিবে না।

কিন্তু ভাল জিনিস হইলেও উহাদের উৎপাদনের ক্রম থাকিবে। যেমন স্বচ্ছল জীবনে বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োজন আছে। কিন্তু আগে চাই প্রচুর খাদ্য ও বস্ত্র, তারপর হারমোনিয়াম। খাদ্য, বস্ত্র, উত্তম বাসগৃহ, উত্তম যন্ত্রপাতি, জ্ঞান-লাভের উত্তম গ্রন্থাদি, মনোরঞ্জনের উপকরণাদি—এরূপ ক্রমানুসারে উৎপাদন এবং সংগ্রহ করিতে হইবে। ঘরে টুথব্রাশ, পেষ্ট, লিপষ্টিক আছে অথচ পর্যাপ্ত দুধ, ঘি নাই—এরূপ চলিবে না। উপরন্ত গ্রামদানী ও গ্রামসংকল্পকারী গ্রামের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকায় নয়ী তালীমের নূতন প্রয়োগক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে। সেখানে এইরূপ উন্নতিসাধন করিয়া দেশ তথা জগৎকে দেখাইতে হইবে যে সহযোগী গ্রামসমাজে অদ্রোহী শ্রম-আধারিত কৃষি ও পল্লীশিল্পের সংযুক্ত অর্থব্যবস্থার দ্বারা মানুষের জীবনস্তর বহুদূর পর্যন্ত উন্নীত করা সম্ভব। গ্রামদানী গ্রামে নয়ী তালীমের এই লক্ষ্য হওয়া উচিত যে সামূহিক জীবনে সকলেরই জীবনের ভৌতিক মান পূর্বাপেক্ষা উন্নীত হইতে পারে। অন্তত উহা যে সর্বোদয় পরিকল্পনার নির্ধারিত ন্যূনতম জীবনমান পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিতে পারে ইহা নয়ী তালীমকে দেখাইতে হইবে।

সর্বসেবা সংঘের পক্ষ হইতে একটি সর্বোদয় পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে যে সর্বোদয়ের আর্থিক ব্যবস্থায় এই নিশ্চয়তা দান করা চাই যে মানুষের জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য প্রয়োজন সমূহ উহাতে মিটিবে। এজন্য উৎপাদন যন্ত্রাদির উন্নতিসাধন করিতে হইবে এবং উৎপাদন পদ্ধতিরও সংস্কার সাধন করিতে হইবে। উক্ত সর্বোদয় যোজনায় হিসাব করিয়া দেখানো হইয়াছে যে খাদ্য, বস্ত্র, গৃহ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও মনোরঞ্জনের জন্য প্রত্যেক পরিবারের বর্তমান মূল্যমান অনুসারে বাৎসরিক তিন হাজার টাকা আয় হওয়া প্রয়োজন। অতএব শ্রম-আধারিত জীবনের দ্বারা প্রত্যেক পরিবার যে কমপক্ষে তিন হাজার টাকা আয় করিতে পারে ইহা প্রমাণ করিতে হইবে।

এদেশে আজ একটি পরিবারের গড় বার্ষিক আয় ১৩২০৲ টাকা মাত্র। মোট আয় ৩৬০০৲ টাকা বা তদূর্ধ্ব এরূপ পরিবারের সংখ্যা ৫৯.২ লক্ষ অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭.২ ভাগ। সুতরাং শতকরা ৯২.৮টি পরিবারের আয় ন্যূনতম প্রয়োজনের পক্ষে পর্যাপ্ত নহে। নয়ী তালীমকে দেখাইতে হইবে যে শ্রম-আধারিত জীবন গ্রহণ করিয়া একটি পরিবার বার্ষিক অন্তত ৩০০০৲ টাকা আয় করিতে পারে। ইহা এক বড় চ্যালেঞ্জ।

(৫) উপরের ৪টি দফায় যাহা আলোচনা করা হইল তাহা নয়ী তালীমকে রাষ্ট্রব্যাপী করিবার কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। উহা ব্যতীত নিম্ন-লিখিত কার্যক্রমগুলিও স্বতন্ত্রভাবে ও উপরের ৪ দফায় বর্ণিত কার্যক্রমসমূহের অঙ্গ স্বরূপ বা পরিপূরক স্বরূপ অবলম্বন করা আবশ্যক :—

(ক) কোন কোন স্থানে দেখা যাইতেছে যে আজকাল দরিদ্র ও অনুন্নত গ্রামের অভিভাবকগণও তাঁহাদের ছেলেমেয়েদের নয়ী তালীম বিদ্যালয়ে পড়াইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতেছেন না। ঐ সব বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ক্রমশ কমিয়া আসিতেছে। নয়ী তালীমের শিক্ষা অন্তরের সহিত গ্রহণ করাইতে হইলে সঙ্গে সঙ্গে লোকসম্মতি লাভের কার্যক্রম গ্রহণ করা উচিত। অর্থাৎ নয়ী তালীম বিদ্যালয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সব গ্রামগুলিতে অভিভাবকবর্গ ও অন্যান্যদের জন্য লোকশিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। তাহাতে নব-সমাজে নয়ী তালীমের স্থান কোথায় সে সম্বন্ধে স্থানীয় লোকদের একটা ধারণা জন্মিবে এবং তাহার দ্বারা নয়ী তালীমের প্রতি জনগণের অন্তরে আকর্ষণ সৃষ্টি হইবে। এরূপে জনগণের অন্তরের সম্মতি (বিনোবাজীর ভাষায় লোকসম্মতি) লাভ হইবে এবং ফলে বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলি সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(খ) শিক্ষাবিদ, শিক্ষিত ব্যক্তিগণ, অভিভাবকবৃন্দ প্রভৃতিকে লইয়া সভা-সমিতি, বৈঠক, পাঠচক্র ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রচারকার্যের পক্ষে ইহা খুবই উপযোগী হইবে।

(গ) অনেকের মনে এই ধারণা আছে যে অন্য বহুদিকে নয়ী তালীমের উৎকর্ষতা থাকিলেও সাধারণ শিক্ষার বিষয়ে নয়ী তালীমের ছাত্রগণ পিছাইয়া থাকে। সকল বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে একথা সত্য না হইলেও কিছু কিছু বিদ্যালয়ের অবস্থা ঐরূপ হইতে পারে। যাহা হউক, নয়ী

তালীমের বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার মান যাহাতে উচ্চ থাকে সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। দেশের স্থানে স্থানে উচ্চ আদর্শের নয়ী তালীম বিদ্যালয় চালাইয়া নয়ী তালীমের উচ্চ নমুনা প্রদর্শন করাইবার ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক।

(ঘ) গ্রামে গ্রামে প্রথমে বালওয়াড়ি (নয়ী তালীম পদ্ধতিতে শিশু-শিক্ষা) চালু করিলে পিতামাতা প্রভৃতি অভিভাবকগণ তাঁহাদের সন্তানদের বিকাশ স্বচক্ষে দেখিয়া নয়ী তালীমের বুনিয়াদী শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষার দিকে আকৃষ্ট হইতে থাকিবেন। নয়ী তালীমের দিকে জনমন আকৃষ্ট করিবার পক্ষে ইহা এক উত্তম প্রদর্শন হইবে।

(ঙ) গঠনকর্মীগণ ও অন্যান্য যাঁহারা নয়ী তালীমের কথা প্রচার করেন তাঁহাদের নিজেদের পুত্রকন্যাদিগকে একমাত্র নয়ী তালীম শিক্ষার উপর নির্ভর করিতে দেখিলে নয়ী তালীমের জনপ্রিয় হওয়ার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়। বর্তমানে খাদিকর্মীর সংখ্যা অল্পাধিক ২৫ হাজার। খাদিকর্মী সমেত গঠনকর্মীর সংখ্যা ৩৬ হাজার পর্যন্ত হইতে পারে। বিবিধ গঠনকর্মের মধ্য দিয়া অন্তত ২০।২৫ লক্ষ লোকের সহিত সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে। সহস্র সহস্র গঠনকর্মী নিজেরা যদি নয়ী তালীমকে অন্তরের সহিত গ্রহণ করেন এবং উহা তাঁহাদের সম্পর্কিত লোকের মধ্যে প্রবেশ করাইবার চেষ্টা করেন তবে তাহার ফলে নয়ী তালীমকে রাষ্ট্রব্যাপী করিবার পথ প্রশস্ত হইবে। এইদিকে দৃষ্টি রাখিয়া সর্বসেবা সংঘের প্রবন্ধ সমিতি পুসা রোডের বৈঠকে (২৫-২৮শে আগষ্ট, ১৯৫৯) খাদি-গ্রামোদ্যোগ উপসমিতির অভিপ্রায় অনুসারে প্রত্যেকটি গঠনকর্মী ও গঠনমূলক সংস্থা যাহাতে নয়ী তালীম মুখীন হইতে পারেন সেজন্য নিম্নলিখিত কার্যক্রম সুপারিশ করেন :—

(১) প্রত্যেক গঠনকর্মী এক ঘণ্টা শরীর-শ্রম করিবেন এবং এক ঘণ্টা কাহাকেও (নয়ী তালীম পদ্ধতিতে) পড়াইবেন।

(২) গঠনমূলক সংস্থায় যেন কোথাও মেথর বা ঝাড়ুদার না রাখা হয় এবং সকল কর্মী নিজেরা যেন সাফাই-এর কাজ করেন।

(৩) প্রত্যেক সংস্থায় বিভিন্ন ধরণের শ্রমিক কাজ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে যে কয় ঘণ্টা কাজ করিতে হয় তাহার মধ্য হইতে একঘণ্টা

লেখাপড়া শিখিবার জন্য সংরক্ষিত রাখিয়া ঐ সময়ে তাঁহাদিগকে নয়ী তালীম পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৪) যে সংস্থায় কয়েকটি পরিবার একত্র বাস করেন সেখানে সংস্থার পক্ষ হইতে তাঁহাদের ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য নয়ী তালীম পদ্ধতিতে বালওয়াড়ি (শিশু মহল) চালাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৫) গঠনমূলক সংস্থার কর্মীদের কতিপয় পরিবার যেখানে একসঙ্গে বা আশ্রম-পদ্ধতিতে বাস করেন সেখানে অভিভাবক-মণ্ডল প্রতিষ্ঠা করা উচিত এবং উহার মাধ্যমে অভিভাবকগণের মিলিতভাবে নিজেদের এবং তাঁহাদের সন্তানদের উন্নতির জন্য নয়ী তালীমের দৃষ্টিতে চিন্তা করা উচিত।

(৬) গঠনমূলক সংস্থাসমূহে স্বাধ্যায়ের ব্যবস্থা থাকা উচিত। দৈনিক সংবাদপত্র পড়া বা শুনা উচিত।

(চ) সারা দেশে ছয় হাজার লোকসেবক (সর্বসময়ের সর্বোদয় কর্মী) হইয়াছেন। তাঁহারা প্রত্যেকে আশপাশের অন্তত একশত লোকের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করিবেন এরূপ প্রত্যাশা করা হয়। তাঁহারা নিজেদের সন্তান ও পোষ্যবর্গের জন্য নয়ী তালীম গ্রহণ করিয়া যদি প্রত্যেকে একশত লোকের মধ্যে উহা প্রচার করেন তবে নয়ী তালীমের ব্যাপক হইবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইবে।

(ছ) নয়ী তালীমকে ব্যাপক করিবার কার্যক্রম সম্পর্কে একটি বিষয় স্মরণ রাখা উচিত। প্রচলিত পদ্ধতির বিদ্যালয়গুলি পরিপূর্ণভাবে নয়ী তালীমের বিদ্যালয়ে পরিণত হইতে চাহিলে তবেই তাহাতে নয়ী তালীম প্রবর্তন করা হইবে এরূপ আগ্রহ রাখা ঠিক হইবে না। তাঁহারা নয়ী তালীমের যতটা গ্রহণ করিতে পারেন অথবা যতটা গ্রহণ করিতে সম্মত হন ততটাই তাঁহাদিগকে গ্রহণ ও প্রবর্তন করিতে দিতে হইবে। কিন্তু কেবলমাত্র তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিলে চলিবে না। স্থানে স্থানে নয়ী তালীমের আদর্শ বিদ্যালয় চালাইয়া উত্তম নমুনা প্রদর্শন করিতে হইবে—যাহাতে উহা দেখিয়া ঐ সব বিদ্যালয় নয়ী তালীমের পথে ক্রমশ অধিকাধিক অগ্রসর হইবার প্রেরণা লাভ করিতে পারেন।

(৬) নয়ী তালীমের সম্মুখে আর একটি সমস্যা হইতেছে অশান্তির প্রতিকার। দেশের তিনটি সমস্যা আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে যাহার দায়িত্ব আমাদের (সর্বোদয় আদর্শে বিশ্বাসীদের) গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা হইতেছে—(১) গ্রাম-স্বরাজ্য, (২) শান্তি-সেনা, ও (৩) নয়ী তালীম।

গ্রাম-স্বরাজ্যের প্রতিষ্ঠা তাড়াতাড়ির কাজ নহে। গ্রাম-স্বরাজ্য অভিমুখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইবে। উহাতে আমাদের অগ্রগতি ধীরে ধীরে হইবে। কিন্তু শান্তি-সেনা ও নয়ী তালীমের কাজ এরূপ যে উহা তাড়াতাড়ি করিতে হইবে। শান্তি-প্রতিষ্ঠা না হইলে নয়ী তালীমের অগ্রগতি হইতে পারিবে না। অনেকে মনে করেন যে আর্থিক বৈষম্য আভ্যন্তরীণ অশান্তির মূল কারণ। আর্থিক বৈষম্য দূর হইলে সর্ব-প্রকারের অশান্তি আপনা-আপনি চলিয়া যাইবে। কিন্তু একটু গভীরভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিলে দেখা যাইবে যে আর্থিক বৈষম্য বা আর্থিক সমস্যার সমাধান হইলেই যে দেশে ঐক্য-ভাবনা আসিবে তাহা নহে। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে ধর্ম, ভাষা, ছাত্র সমস্যা, রাজনৈতিক দলাদলি ইত্যাদিও দেশে অশান্তির প্রধান কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ দেশের মধ্যে যে সব অশান্তি সংঘটিত হইতেছে তাহার মূলে এইসবও রহিয়াছে। এইসব অশান্তি দূর না হইলে দেশে ঐক্যানুভূতি আসিবে না এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত না হইলে আর্থিক ক্ষেত্রের কাজও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারিবে না। এজন্য শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজ সর্বাপেক্ষা জরুরী। বিনোবাজী বলেন যে এই অশান্তি প্রতিকারের অর্থাৎ শান্তি-সেনার দায়িত্ব গ্রহণ করা একমাত্র নয়ী তালীমের পক্ষে সম্ভব। শান্তি-প্রতিষ্ঠা তথা শান্তি-সেনার দায়িত্ব কেন নয়ী তালীমকে গ্রহণ করিতে হইবে তাহা বিনোবাজী বুঝাইয়াছেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন,—

"শান্তি-সেনার দায়িত্ব নয়ী তালীমের গ্রহণ করা উচিত। আমার অনুভূতির সারাংশ এই যে অন্য কোনও উপায়ে শান্তি-প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থাই হইতে পারে না। যদি নয়ী তালীমের দ্বারা শান্তি রক্ষার উপায় না হয় তবে উহা নয়ী তালীম না হইয়া অকেজো শিক্ষাই হইবে। কোথাও দাঙ্গা বাধিয়া দশ-বারজন লোক মারা গেল, তাহার পর সেখানে পুলিশ আসিয়া আইনের নামে গুলি করিয়া আরও দশ-বারজন লোককে মারিয়া

ফেলিল। এরূপে কিছু লোককে বে-আইনীভাবে মারা হইল এবং কিছু লোককে আইনসঙ্গতভাবে মারা হইল। এরূপ অবস্থা যে ঘটিতেছে তাহার কারণ এই যে, সকল স্থান অজ্ঞানে ভরপূর হইয়া রহিয়াছে। এই অজ্ঞানতা দূর করার কাজ নয়ী তালীমের। সুতরাং নয়ী তালীমের কাজ স্কুলের দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকিবে না। উহা তো সমগ্র সমাজের কাজ। এইজন্য আমি বলিয়াছি যে শান্তি-সেনার দায়িত্ব পালন করিবার যোগ্যতা যদি কাহারও থাকে তবে তাহা নয়ী তালীমেরই আছে।"

সুতরাং বর্তমান অবস্থায় আমাদের সংগঠনের কাজকে এক ব্যাপক বয়স্ক-শিক্ষা রূপে গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

(৭) নয়ী তালীমের সম্মুখে আর একটি বৃহৎ সমস্যা হইতেছে শিক্ষক-প্রশিক্ষণ সমস্যা। গত লোক-গণনার সময় ভারতের লোকসংখ্যা ছিল ৩৬ কোটি। কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থা (সেণ্ট্রাল ষ্ট্যাটিস্‌টিক্যাল অরগ্যানাইজেশন) বর্তমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি যত্নপূর্বক অধ্যয়ন করিয়া নির্ণয় করিয়াছেন (আগষ্ট, ১৯৫৯) যে ভারতের লোকসংখ্যা ৪১½ কোটি দাঁড়াইয়াছে। এই সংখ্যাকে নির্ভরযোগ্য গণ্য করিয়া উহার ভিত্তিতে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বিভিন্ন বিষয়ের পরিসংখ্যান রচিত হইয়াছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান প্রবণতা অনুসারে ভারতের জনসংখ্যা প্রত্যহ প্রায় ২০ হাজার করিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। উক্ত নবাগতদের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্যও দৈনিক অন্তত ৬৫০টি করিয়া নূতন বিদ্যালয় ও প্রায় ২ হাজার করিয়া নূতন শিক্ষক সৃষ্টি করা প্রয়োজন। ইহা অনুধাবন করিলে বুঝা যায় নয়ী তালীমের স্কন্ধে কত গুরুভার ন্যস্ত রহিয়াছে!

পরিশিষ্ট

[খান্দোয়া (মধ্যপ্রদেশ) এস. এন কলেজের হিন্দী সাহিত্য বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীকান্ত জোশী ১৯৬১ সালের ২৩শে মে ইন্দোর আকাশবাণী হইতে ‘আমাদের জাতীয় শিক্ষা’র হিন্দী সংস্করণ সম্বন্ধে যে আলোচনা করেন ইন্দোর আকাশবাণী কেন্দ্রের সৌজন্যে তাহার বাংলা অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হইল।—প্রঃ]

‘হমারা রাষ্ট্রীয় শিক্ষণ’ শ্রীচারুচন্দ্র ভাণ্ডারী লিখিত ‘আমাদের জাতীয় শিক্ষা’ নামক পুস্তকের হিন্দী অনুবাদ। অনুবাদক শ্রীবিদ্যাভূষণ ‘শ্রীরশ্মি’। প্রথমেই উল্লেখ করিয়া রাখা উচিত বলিয়া মনে করি যে কাশীর অখিল ভারত সর্বসেবা সংঘ প্রকাশন ‘হমারা রাষ্ট্রীয় শিক্ষণ’ প্রকাশ করিয়া ‘নয়ী তালীম’ নামে খ্যাত জাতীয় শিক্ষা-প্রণালীর পাঠকদের জন্য, কেবল সাধারণ পাঠকদের জন্য নহে বিশিষ্ট পাঠকদের জন্যও এক মহত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করিয়াছেন। পুস্তকের উৎকর্ষতা সন্তবর বিনোবাজীর আশীর্বচনে প্রমাণিত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন, “‘ভূদানযজ্ঞ কি ও কেন’ পুস্তকের সুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীচারুবাবুর শিক্ষা বিষয়ক এই পুস্তক অণুতন সামগ্রীতে পরিপূর্ণ। সর্বাঙ্গীন অভ্যাস ও সমগ্র দর্শন চারুবাবুর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। উহার দর্শন এই পুস্তকেও পাওয়া যায়।”

মোট ৫৩টি অধ্যায়ে পুস্তকটি বিভক্ত। এই পুস্তকে যে কেবল নয়ী তালীম কি, নয়ী তালীমের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ কি প্রকারে হইল ইত্যাদি পরিচয়াত্মক ও ইতিবৃত্তমূলক বিষয়সমূহের বিবরণ আছে তাহাই নহে, ইহাতে বর্তমান শিক্ষা-প্রণালীর সহিত নয়ী তালীমের বিচারধারার তুলনামূলক, বিচার-উদ্দীপক এবং মননশীল বিশ্লেষণও আছে।

লেখক মহাত্মা গান্ধী, কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ, আচার্য বিনোবা ভাবে প্রভৃতি মনীষীগণের উক্ত বিষয় সম্পর্কীয় ভাবধারা ও পরিকল্পনার তলস্পর্শী অধ্যয়ন করিয়া উহাদের সমন্বয়াত্মক স্বরূপ এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এইজন্য ইহাতে পরিভাষাসমূহ স্পষ্ট ও সিদ্ধান্তসমূহ নিশ্চয়াত্মক হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ

বুনিয়াদী শিক্ষায় 'বুনিয়াদী' শব্দের অর্থ কি এই প্রশ্নের আলোচনা প্রসঙ্গে লেখক বলিয়াছেন—"মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত নয়ী তালীমকে বেসিক বা বুনিয়াদী শিক্ষা বলা হয়। অনেকে মনে করেন যে উহা ছেলেমেয়েদের প্রারম্ভিক শিক্ষা বলিয়া উহার নাম 'বুনিয়াদী' শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই অর্থের কোন সার্থকতা নাই। ইহার প্রকৃত অর্থ এই যে দেশের সর্বত্র নীচু হইতে উপর পর্যন্ত যে শিক্ষা পাওয়া যাইতেছে কিংবা দেওয়া হইবে তৎসমুদয় এই নব-বিচারধারার বুনিয়াদের উপর আধারিত হওয়া চাই। শিক্ষা ও নব-বিচারধারা হইতেছে বিনোবাজীর কথায় 'সচ্চিদানন্দ'। 'সৎ' হইতেছে কর্মযোগ, 'চিৎ' হইতেছে জ্ঞানযোগ আর 'আনন্দ' বিনা জীবনে কোন রসই থাকে না। সুতরাং এই শিক্ষায় সৎ, চিৎ ও আনন্দ—এই তিনের যোগ হইলে তবে উহা প্রকৃত শিক্ষা হইবে।"

লেখক নয়ী তালীমের ত্রিবিধ দর্শনের খুবই প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং উহার আর্থিক, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক দিকের উপর আলোক সম্পাত করিয়াছেন। লেখকের ভাষায়—"নয়ী তালীমের আর্থিক দৃষ্টি হইতেছে এই যে ইহাতে কায়িক ও মানসিক শ্রমের মধ্যে কোন শ্রেণী-ভেদ করা হয় না।…নয়ী তালীমের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি এই যে ইহাতে জ্ঞান ও কর্মকে দুই পৃথক বস্তু বলিয়া গণ্য করা হয় না। ঐরূপ, মনুষ্যমাত্রই সমাজ—ইহা হইতেছে নয়ী তালীমের সামাজিক স্বরূপ।"

'হমারা রাষ্ট্রীয় শিক্ষণ' নয়ী তালীম বিষয়ে প্রামাণিক গ্রন্থ। উহা লেখকের ব্যাপক সমাহার শক্তি, তত্ত্বদৃষ্টি, বিশ্লেষণ-সামর্থ্য এবং বিবিধ পর্যায়ে চিন্তন-ক্ষমতার সম্যক পরিচয় প্রদান করিতেছে। পুস্তকের হিন্দী অনুবাদ সাধারণভাবে ভালই হইয়াছে।